পুরাভারতী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৬৩

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীসুধীর মৈত্র

ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানী

মুদ্রাকর :
শ্রীমন্মথনাথ পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৮

আমাদের চিরনবীন বন্ধু
শ্রীশ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে

'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।'

এই লেখকের লেখা কয়েকখানি নূতন বই
বেরিয়েছে বা বেরোচ্ছে

বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কল্কিপুবাণ,
শ্রীমদ্‌ভাগবত, দেবীভাগবত

গল্প শুধু গল্প

কুম্ভীপাক বীক্ষ্য

অন্য এক দেশ

বিনিময়

তিনজন নায়িকা

শ্যাবাশ্ব, বেদের একটি কাহিনী

আশ্চর্য আরাবল্লী

মানস সরোবরের পথে

রম্যাণি বীক্ষ্য

শাশ্বত ভারত

আমাদের দেশ
(ছোটদের জন্য)

মুখবন্ধ

সহৃদয় পাঠকের নিকটে আমার সবিনয় নিবেদন, এই গ্রন্থ-পাঠ আরম্ভের পূর্বে তাঁরা যেন এই মুখবন্ধটি পড়ে গ্রন্থকারকে বাধিত করেন।

'পুরাভারতী' কোন ধর্ম গ্রন্থ নয়। এটি পুরাণের কাহিনীগুলি সাজিয়েই প্রাচীন ভারতের একখানি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস রচনার প্রয়াস। এতে যদি কারও ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত লাগে, তবে সেই অনিচ্ছাকৃত দোষের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ধর্ম মানুষকে মহৎ করে। কিন্তু ধর্ম ও সংস্কার এক নয়। সংস্কার মানুষকে অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমগ্ন রাখে। সংস্কারমুক্ত হয়েই ধর্ম সত্য পথ নির্দেশ করে।

এই গ্রন্থে কল্পের আরম্ভ থেকে কৃত বা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের পৌরাণিক কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পুরাণের তথ্য অবলম্বন করে ধর্ম যুগের ও সমস্ত ঘটনার কাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে ইতিহাসে লব্ধ তথ্যেরও সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। যে সময় থেকে ভারতের ইতিহাস লিখিত হয়েছে, সে সময়ের কথাও পুরাণে পাওয়া যায় এবং দুয়ের মিল দেখে বিস্মিত হতে হয়। পুরাণে বহু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ আছে, অতিরঞ্জনও অনেক। ঐতিহাসিক সত্য নিরূপণের জন্য সে সব বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতে হয়েছে। এই জন্যই দেবতা বলে স্বীকৃত অনেকেই সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছেন। মানুষকে দেবতা ভাবলে দোষের হয় না, কিন্তু দেবতাকে মানুষ বলে চিহ্নিত করলে তা পাপ বলে গণ্য হতে পারে। পাপ পুণ্য মানুষেরই ধারণা। সত্য উদ্ধারের প্রয়াস পাপ বলে গণ্য হতে পারে না।

প্রাচীন ভারতের কোন ইতিহাস নেই। আর্য জাতির ভারতে উপনিবেশ স্থাপন থেকেই ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ। সিন্ধু সভ্যতার সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের ইতিহাসে নেই। ঋগ্বেদ থেকে সেকালের সমাজ সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানা যায়। এই ঋগ্বেদ রচনার কাল ২০০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ বলে মনে করা হয়। কিন্তু পুরাণ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ৫৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আমাদের কল্পের আরম্ভ, দেবাসুরের যুদ্ধের কাল তার প্রায় দু হাজার বৎসর পরে, রামের রাজত্ব কাল ২১২৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে এবং কৃষ্ণের জন্ম ১৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বছরের ধারাবাহিক

ইতিহাস এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি ঘটনা ও তথ্য পুরাণ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে এবং পাঠকের সুবিধার জন্য বহু তথ্যের প্রমাণ দর্শানো হয়েছে।

এ কালে পুরাণকে ধর্ম গ্রন্থ বলে মনে করা হয়। পুরাণগুলি যাতে এ দেশের মানুষ দীর্ঘকাল রক্ষা করে, তার জন্যই পুরাণ রচয়িতারা মানুষের উপরে দেবত্ব আরোপ করে বা জ্যোতিষ্ক লোকে উন্নীত করে অলৌকিক কাহিনীর বিন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনাকেই ধর্মীয় রূপ দিয়েছিলেন। তার পর সেই সব দেবতার পূজা পদ্ধতি ও ব্রতাদির মাহাত্ম্য বর্ণনা করে পুরাণকে ধর্ম গ্রন্থে পরিণত করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে ইতিহাসকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলেই তা রক্ষা পাবে। এই কথা মনে রেখে পাঠক যদি এই গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহলেই গ্রন্থকারের এই মুখবন্ধ রচনার প্রয়োজন উপলব্ধি করবেন।

এই প্রসঙ্গে আমি স্বর্গত গিরীন্দ্রশেখর বসুর অবদানের কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। বৈজ্ঞানিকের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে পুরাণগুলি অধ্যয়ন করে তিনি তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ 'পুরাণ প্রবেশে' ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয়ের সার্থক প্রয়াস করেছিলেন এবং পৌরাণিক কাল নির্ণয় ও ঘটনাকে অতিরঞ্জন মুক্ত করবার সূত্র নির্দেশ করেছিলেন। তাঁরই প্রদর্শিত পথ আমি সমাদরে গ্রহণ করেছি এবং কাল নির্দেশে তাঁরই গণনা মেনে নিয়েছি। মতান্তরও আছে, কিন্তু তা গৌণ। ঋণ আকণ্ঠ।

গত বৎসরাধিক কাল সময়ে আমি বিষ্ণু, মার্কণ্ডেয়, শ্রীমদ্‌ভাগবত, দেবীভাগবত ও কল্কি পুরাণের সারানুবাদ করেছি এবং প্রয়োজন মতো স্বকৃত অনুবাদই এই গ্রন্থে ব্যবহার করেছি। এ ছাড়া বায়ু পুরাণ, মৎস্য পুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য পুরাণ থেকেও কিছু শ্লোকের অনুবাদ বা মর্মার্থ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়েছে। এই কাজে যে সব দেশী বা বিদেশী পণ্ডিতের মতামত আছে, তা গ্রহণ বা বর্জন করার প্রয়োজন হয় নি। এই সব মতামত আলোচনা করে নিজের বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করতেও চাই নি পাঠকেরই সুবিধার জন্য। আশা করি সুধী পাঠক এই গ্রন্থ উপন্যাসের মতো সাবলীল ভাবে পড়ে আনন্দ পাবেন এবং বিশ্বাস করবেন যে পুরাণ ধর্ম গ্রন্থ বলে বর্জনীয় নয়। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

রম্যাণি
বি. এফ ৭৭, সল্টলেক সিটি,
কলিকাতা-৭০০০৬৪

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

সম্পূর্ণ

উত্তর কুরু
হিরন্ময় বর্ষ
কুরুবর্ষ
বৈকুণ্ঠ
ইলাবৃত বর্ষ
ভদ্রাশ্ব বর্ষ
মেরু পর্বত
কেতুমাল বর্ষ
কিম্পুরুষ বর্ষ
কৈলাস
হিম বর্ষ
(ভারত বর্ষ)
অন্তরিক্ষ
মানস সরোবর
ম র্ত্য
পা তা ল
দ্বীপ

উপক্রমণিকা

রাজসভায় ঐতিহাসিক নিয়োগ

অনেক কাল আগের কথা। দেশের রাজা তখন বেণ। ঋষি ও ব্রাহ্মণেরা ষড়যন্ত্র করে রাজাকে হত্যা করলেন।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে রাজা বেণের জন্ম। মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত তাঁর পুত্রদের সপ্ত দ্বীপ ভাগ করে দিয়েছিলেন। জম্বু দ্বীপের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্নীধ্রকে। অগ্নীধ্রর নয়টি পুত্র। তাঁদের নাম নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্য, হিরণ্য, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। অগ্নীধ্র তাঁর রাজ্য নয় ভাগ করে এক এক জনকে এক এক বর্ষে অভিষিক্ত করেন। এদের নামেই এক একটি বর্ষ হয়। নাভির পুত্র ঋষভ ও ঋষভের পুত্র ভরত। ভরত তাঁর পিতামহের নিকটে হিম নামে যে দক্ষিণের বর্ষ পেয়েছিলেন, তা ভারত বর্ষ নামে অভিহিত হয়। মনুর বংশধর রাজারাই সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ভোগ করেছিলেন।

প্রিয়ব্রতের বংশে একত্রিশ জন রাজত্ব করবার পর উত্তানপাদ রাজা হন। এঁরও জন্ম মনুর বংশে। ধ্রুব উত্তানপাদের পুত্র। বেণের জন্ম একাদশ পুরুষে। এই পবিত্র রাজবংশের রাজা বেণকে ব্রাহ্মণেরা কেন হত্যা করলেন, তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

বিষ্ণু পুরাণের প্রথমাংশের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই পুরাণের সংগ্রহ-কর্তা পরাশর মৈত্রেয়র নিকটে এই ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। বেণের পিতা রাজা অঙ্গ মৃত্যুর কন্যা সুনীথাকে বিবাহ করেছিলেন। বেণ সুনীথার পুত্র বলে মাতামহ মৃত্যুর দোষে স্বভাবত দুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি যখন ঋষিদের দ্বারা রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তখন রাজা হয়েই ঘোষণা করেন যে কেউ যজ্ঞ করতে পারবে না, হোম করতে পারবে না এবং কেউ কদাচ দান করবে না। আমিই যজ্ঞপতি প্রভু, অন্য আর কেউ যজ্ঞের ভোক্তা নেই।

এর পর ঋষিরা রাজার নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রথমে তাঁকে সসম্মানে সাম-মধুর বাক্যে বললেন, প্রভু রাজা, রাজ্য-দেহের উপকারের জন্য এবং প্রজাদের হিতের জন্য যা বলছি শোন। আমরা দেবেশ সর্বযজ্ঞেশ্বর হরিকে দীর্ঘ সূত্রে পূজা করব, তাতে তোমার অংশ থাকবে। তোমার মঙ্গল হোক। যজ্ঞপুরুষ হরি আমাদের যজ্ঞে সম্প্রীত হয়ে তোমাকে সমস্ত কামনা প্রদান করবেন। যাঁদের রাষ্ট্রে যজ্ঞেশ্বর হরি যজ্ঞে সম্পূজিত হন, সেই রাজাদের তিনি সমস্ত ইপ্সিত দান করেন।

কিন্তু বেণ বললেন, আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে দ্বিতীয় আরাধ্য আছে! এই হরি কে যে তাকে যজ্ঞেশ্বর বলা হচ্ছে! ব্রহ্মাদি যে সব দেবতা শাপানুগ্রহকারী, তাঁরা সকলেই রাজার শরীরস্থ, রাজাই সর্ব দেবময়। আপনারা এই কথা বিবেচনা করে আমার আজ্ঞা পালন করুন। আপনাদের দাতব্য, হোতব্য ও যষ্টব্য কিছুই নেই। স্বামীর শুশ্রূষা যেমন স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম, তেমনি আমার আজ্ঞা পালনই আপনাদের ধর্ম।

ঋষিরা বললেন, হে মহারাজ, ধর্মক্ষয় যাতে না হয়, সেই আজ্ঞা কর। কারণ হরির পরিণামই এই অখিল জগৎ।

পরাশর বললেন, পরমর্ষিদের দ্বারা এই ভাবে বিজ্ঞাপিত ও বার বার অনুরুদ্ধ হয়েও রাজা যখন অনুজ্ঞা দিলেন না, তখন সেই মুনিরা কোপামর্ষ সমন্বিত হয়ে পরস্পরকে বললেন, বধ কর, বধ কর এই পাপকে। যে অধর্মাচার করে ও অনাদি অনন্ত দেব যজ্ঞপুরুষ প্রভুর নিন্দা করে, সে রাজা হবার যোগ্য নয়। এই বলে মুনিরা মন্ত্রপূত কুশ দিয়ে বেণকে বধ করলেন।

আসল ব্যাপারটা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। সেকালে যজ্ঞ একটা সামাজিক উৎসব ছিল। তাতে রাজাকে নিমন্ত্রণ করা হত যজ্ঞপুরুষ রূপে। বেণের রাজ্যের ব্রাহ্মণেরা চেয়েছিলেন পূর্বের মতো বিষ্ণুকেই যজ্ঞপুরুষ রূপে আমন্ত্রণ করতে। কিন্তু বেণ

রাজি হন নি। তিনি বলেছিলেন যে দেশের রাজাই সর্বেসর্বা, তাঁর ওপরে আর কেউ নেই। বিষ্ণু বা আর কাউকে যজ্ঞপুরুষ রূপে আমন্ত্রণ করা চলবে না। যজ্ঞের ভাগ বা কর যদি দিতে হয়, তবে তা রাজারই প্রাপ্য হবে। এ কথা না মানলে যজ্ঞ করাই চলবে না। ভারতবর্ষে বেণই প্রথম রাজা যিনি পুরাতন ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। মনে হয় না যে তিনি যজ্ঞ হোম ও দান নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাহলে বলতেন না, আমিই যজ্ঞপতি প্রভু, অন্য আর কেউ যজ্ঞের ভোক্তা নেই।

কিন্তু ঋষিরা এই আদেশ মানতে চাইলেন না কেন? এ প্রশ্নেরও সদুত্তর আছে। এই ঋষিরা যেখান থেকে এসেছেন, সেখানে হরি বা বিষ্ণুই যজ্ঞপুরুষ। যজ্ঞে তিনি উপস্থিত থাকলে তাঁরা নিজেদেব সম্মানিত ভাবতেন। প্রবাসে এসেও তাঁরা বিষ্ণুকেই তাঁদের প্রভু ভাবতেন, বিষ্ণুব জায়গায় আর কাউকে বসাতে তাঁদের সংস্কারে বেধেছিল। তাই রাজা বেণের নূতন আদেশে তাঁদের ধর্মবোধ উৎপীড়িত হয়েছিল। তাই তাঁরা সম্মিলিত ভাবে এসে রাজাকে প্রথমে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বেণ অবুঝ, তিনি তাঁর সঙ্কল্পে দৃঢ়। তাঁর পূর্বপুরুষেরা বিষ্ণুর আধিপত্য স্বীকার করে এসেছেন বলেই যে তাঁকেও তা মেনে নিতে হবে, এমন কোন যুক্তি নেই, তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজা বলে প্রচার করেছেন। রাজ্যের সবাইকে এই আজ্ঞা মেনে চলতে হবে, এর ব্যতিক্রম তিনি সহ্য করবেন না। কাজেই ঋষিরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে রাজার এই আচরণ তাঁরা সহ্য করবেন না। যাঁরা তাঁকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন, তাঁরাই তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন। যুদ্ধ করে নয়, মন্ত্রপূত কুশ দিয়ে তাঁকে বধ করলেন। মন্ত্র পড়ে বা মন্ত্রপূত কুশ দিয়ে মানুষ মারা যায় না। কোন গোপন উপায়ে তাঁর রাজার প্রাণনাশ করলেন।*

পুরাণকাররা ঋষিদের এই কাজ সমর্থন করেছিলেন। তাই

বলেছেন যে বেণ তাঁর মাতামহ দোষে দুষ্ট স্বভাবের হয়েছিলেন। মাতামহর নাম দিয়েছেন মৃত্যু। মৃত্যুর কোন পরিচয় নেই। বেণের মাতা সুনীথা মৃত্যুর প্রথমা কন্যা। পিতা অঙ্গের জন্ম মনুর বংশে। সাধারণ ভাবে বলা হয় যে স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ কনিষ্ঠ। কিন্তু বংশলতা বিচার করে দেখা যায় যে প্রিয়ব্রতর বংশধররাই একজনের পর আর একজন রাজত্ব করেছেন। তারপর উত্তানপাদ ও তাঁর বংশধররা। উত্তানপাদ প্রিয়ব্রতর ভ্রাতা হতে পারেন না। বরং তিনি প্রিয়ব্রতর কনিষ্ঠ ভ্রাতার বংশে জন্মেছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। উত্তানপাদ প্রিয়ব্রতর ভ্রাতা হলে তিনি রাজত্ব করবার সুযোগ নিশ্চয়ই পান নি। বেণের অধর্মাচরণের কোন নজির পুরাণে নেই। তাঁর কোন দোষের কথাও পুরাণে পাওয়া যায় না। তাই পুরাণকারকে কতকটা বাধ্য হয়েই বলতে হয়েছিল, রাজা হয়ে বেণ ঘোষণা করেন যে তাঁর রাজ্যে কেউ যজ্ঞ করতে পারবে না, হোম করতে পারবে না এবং কেউ কদাচ দান করবে না। আমিই যজ্ঞপতি প্রভু, অন্য আর কেউ যজ্ঞের ভোক্তা নেই। এই শেষের উক্তিই প্রমাণ করছে যে তিনি যজ্ঞ বন্ধ করেন নি, তিনি তাঁকে ছাড়া অন্যকে যজ্ঞপতি করার অধিকার হরণ করেছিলেন। এই অপরাধেই ব্রাহ্মণ ঋষিরা দেশের রাজাকে হত্যা করেছিলেন।

বেণের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীও ছিলেন না কেউ। তাই তাঁর রাজ্য অরাজক হল। কত দিন এই অরাজক অবস্থা চলেছিল তা জানা যায় না। ঋষিরা এক সময় বুঝতে পারলেন যে রাজাকে হত্যা করে তাঁরা ভুল করেছেন। চারিদিকে রেণু দেখতে পেয়ে তাঁরা নিকটস্থ ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করলেন, এ কী? তারা বলল, অরাজক রাজ্যে চোরদের পরস্ব অপহরণ আরম্ভ হয়েছে। সেই পরবিত্ত অপহরণকারী উদ্ধতগতি চোরদেরই পদরেণু দেখা যাচ্ছে। এই কথা শুনে ঋষিরা আবার মন্ত্রণা করে নিঃসন্তান

রাজার উরু সযত্নে মন্থন করলেন। তা থেকে একটি দগ্ধ স্থূলা খুঁটির মতো খর্ব-মুখ হ্রস্বকায় পুরুষ উত্থিত হয়ে বলল, আমি কী করব? তাঁরা বললেন, নিষীদ যা উপবেশন কর। এই কথার জন্য সে নিষাদ হল। তার সন্তানরা বিন্ধ্য শৈল নিবাসী পাপ কর্মোপলক্ষণ নিষাদ হল। নিষাদ রূপে রাজার পাপ নির্গত হয়েছিল বলে তারা বেণ পাপনাশন নামে খ্যাত।

তারপর ঋষিরা বেণের ডান হাত মন্থন করলে তাতে প্রতাপশালী দীপ্যমান বপু বৈণ্য পৃথু সাক্ষাৎ অগ্নির মতো দীপ্তি নিয়ে জন্মালেন। তখন আকাশ থেকে পতিত হল অজগর নামে আদ্য ধনু, দিব্য শর ও কবচ। তাঁর জন্ম দেখে সকলেই আনন্দিত হয়েছিল। আর এই সৎ পুত্রের জন্মে বেণও পুন্নাম নরক থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ত্রিদিবে গমন করলেন। সমুদ্র ও সমস্ত নদী সর্বপ্রকার রত্ন ও অভিষেকের জল নিয়ে তাঁর নিকটে উপস্থিত হলেন। আঙ্গিরস দেবতাদের সঙ্গে পিতামহ ভগবান ও স্থাবর জঙ্গমেরা সমাগত হয়ে নরাধিপ বৈণ্যকে স্নান করালেন। পৃথুর ডান হাতে চক্র চিহ্ন দেখে পিতামহ তাঁকে বিষ্ণুর অংশ বিবেচনা করে পরম পরিতোষ লাভ করলেন। চক্রবর্তীদের মধ্যে যাঁর প্রভাব দেবতারাও খর্ব করতে পারেন না, তাঁর হাতেই বিষ্ণুচিহ্ন চক্র থাকে। ধর্মজ্ঞরা সেই মহাতেজা প্রতাপশালী বৈণ্য পৃথুকে মহৎ রাজ্যে যথাবিধানে অভিষিক্ত করলেন। তিনি তাঁর পিতার প্রজাদের অনুরঞ্জিত করলেন বলে তাঁর নাম রাজা হল। ইনি সমুদ্রে গেলে জল স্তম্ভিত হত, রথ যাত্রার সময় পর্বতেরা পথ দিত, তাঁর পতাকা ভঙ্গ কখনও হয় নি। বিনা কর্ষণেই পৃথিবী শস্যশালিনী হল এবং চিন্তা মাত্রেই অন্ন লাভ হতে লাগল। গরু সর্বকামদুধা ও পত্রাদি গুচ্ছে মধু হল।

জন্মেই তিনি পৈতামহ যজ্ঞ করেছিলেন। তাতে সেই দিনই সূতিতে অর্থাৎ যজ্ঞের অন্তর্গত সোম যজ্ঞভূমিতে মহামতি সূত ও প্রাজ্ঞ মাগধ উৎপন্ন হলেন।—

সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ।
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে যজ্ঞে প্রাজ্ঞোঽথ মাগধঃ॥ বিষ্ণু ১।১৩।৫১

এই বিবরণও বিষ্ণু পুরাণের। নিঃসন্তান রাজা বেণের মৃত্যুর পরে রাজ্যের উত্তরাধিকারী পাবার জন্য রাজার মৃতদেহ মন্থন করা হয়েছিল। মন্থন বলতে আমরা আলোড়ন বুঝি। দধি মন্থন সমুদ্র মন্থন আমরা বুঝি। মন্থন শব্দে দলন ও বিনাশও বোঝায়। পুরাণে মন্থন শব্দটি যে অন্বেষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে কোন সংশয় নেই। বেণের মৃতদেহ নিয়ে নিশ্চয়ই কোন ক্রিয়া কর্ম হয় নি। তাঁর মৃত্যুর কত কাল পরে এই দেহ মন্থন করা হয়েছিল, তারও উল্লেখ নেই। তবে অনুমান করা যায় যে এই চেষ্টা হয়েছিল দীর্ঘ দিন পরে। অরাজক অবস্থায় দেশে যখন চোরের উপদ্রব খুবই বৃদ্ধি পায়, তখন ঋষিরা একজন রাজার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। প্রথমে বেণের উরু মন্থন করা হয়েছিল। এর অর্থ রাজ্যের প্রজা-বৃন্দের মধ্য থেকে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের চেষ্টা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে পুরাকালে রাজাকে একটি দেহ কল্পনা করা হত। প্রজারা তাঁর উরু, আত্মীয়রা উদর ; বাহু তাঁর সেনা-বাহিনী এবং চরেরা তাঁর চক্ষু। বেণের উরু মন্থন করে অর্থাৎ প্রজাদের মধ্য থেকে যাঁকে পাওয়া গেল, তিনি একজন পোড়া খুঁটির মতো হ্রস্বকায় পুরুষ। ঋষিরা তাঁকে পছন্দ করলেন না। বললেন, তুমি বসে পড। অর্থাৎ তোমাকে আমরা চাই না। এঁর নাম হল নিষাদ এবং তাঁর বংশধররা বিন্ধ্য পর্বতবাসী হল। এ কথায় স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বিন্ধ্য পর্বতবাসী নিষাদরাই বেণ রাজার আমলে প্রতিপত্তিশালী প্রজা ছিল। তারা খর্বকায়, গায়ের রঙ পোড়া খুঁটির মতো। বহিরাগত ঋষিরা কোন নিষাদকে রাজা হবার যোগ্য মনে করলেন না। তাই তাঁরা বেণের দক্ষিণ বাহু অর্থাৎ সেনাবাহিনী থেকে যাঁকে মনোনীত করলেন, তাঁর নাম পৃথু। মনে হয় যে পৃথু একজন সেনাপতি ছিলেন। এমনও হতে পারে যে দেশের অরাজক

অবস্থায় তিনি নিজেই নিষাদ জাতিকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করেন। নিষাদরা বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলে নির্বাসিত হল এবং ঋষিরা বললেন, নিষাদ রূপেই বেণের পাপ নির্গত হয়ে গেল এবং পৃথুর মনোনয়নেই মৃত রাজা নরক থেকে উদ্ধার পেলেন। পৃথু বিষ্ণুর প্রাধান্য মেনে নিয়েছিলেন বলেই বলা হয়েছে যে তাঁর ডান হাতে চক্রচিহ্ন দেখে পিতামহ তাঁকে বিষ্ণুর অংশ বিবেচনা করেছিলেন। তিনি যে বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ঋষিদের খুশী করবার জন্য তিনি জন্মেই অর্থাৎ রাজ্যাভিষেকের পরেই পৈতামহ যজ্ঞ করেন এবং সেই দিনই সেইখানে সূত ও মাগধ নিয়োগ করেন। সূত ও মাগধরাই প্রাচীন ভারতেব ঐতিহাসিক। মাগধবা রাজ্যের ইতবৃত্তকার বা State historian এবং যাঁরা বিভিন্ন রাজ্যের মাগধদের নিকটে বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ সংগ্রহ করতেন, তাঁরা হলেন সূত। পুরাণ রচয়িতারা এই সব বিবরণ পেতেন সূতের নিকটে। এই ভাবেই এ দেশের পুরাণগুলি রচিত হয়েছে। এই পুরাণই প্রাচীনতম রচনার নিদর্শন। বায়ু পুরাণের মতে ব্রহ্মা সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে সকলের আগে পুরাণ বলেছিলেন, তারপর তাঁর মুখ থেকে বেদ বিনিঃসৃত হয়েছিল।—

প্রথমং সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ॥ বায়ু।১।৬১॥

নিজের রাজ্যে মাগধ ও সূত নিয়োগ করে পৃথু তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে নিজের মাগধ ও সূত না থাকলে তাঁর কীর্তির সম্যক প্রচার হবে না।

এর পরের ঘটনাও বিষ্ণু পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে।—

সূত ও মাগধ উৎপন্ন হবার পর ঋষিরা উভয়কে বললেন, তোমরা এই প্রতাপশালী বৈণ্য পৃথু রাজার স্তব কর। ইনি তোমাদের স্তোত্রের পাত্র। এই কথা শুনে তারা কৃতাঞ্জলি হয়ে উত্তর দিল, অদ্য জাত এই রাজার গুণ বা কর্মের কথা জানা যাচ্ছে না এবং এঁর

যশও প্রথিত নেই। কাজেই কী আশ্রয় করে আমরা এঁর স্তব করব বলুন। ঋষিরা বললেন, এই মহাবল চক্রবর্তী রাজার যে সব গুণ হবে, যে সব কর্ম কববেন, তাই দিয়ে এঁর স্তব কর।

পরাশর বললেন, রাজা এই কথা শুনে পরম সন্তোষ লাভ করলেন। ভাবলেন, লোকে সদ্‌গুণের জন্যই শ্লাঘ্যতা লাভ করে এবং এঁরা আমার এই সব গুণের স্তব করবেন। আমি সমাহিত হয়ে তাই করব, আর যা বর্জনীয় বলবেন তা বর্জন করব। তারপর সেই সূত ও মাগধ বৈণ্য পৃথুর ভবিষ্যৎ কর্ম নিয়ে সুস্বরে স্তব করতে লাগলেন।

দেশের অরাজক অবস্থায় সমস্ত ওষধি প্রনষ্ট হলে প্রজারা ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে পৃথুর নিকটে উপস্থিত হয়ে বলল, মহারাজ, অরাজক অবস্থায় ধরিত্রী সমস্ত ওষধি গ্রাস করেছে, তার জন্য সমস্ত প্রজা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। বিধাতা আপনাকে আমাদের সমস্ত বৃত্তিপ্রদ প্রজাপালক নিরূপণ করেছেন। আমাদের মতো ক্ষুধার্ত প্রজাদের আপনি জীবনৌষধি দান করুন। রাজা এই কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুর্বাণ নিয়ে বসুধার অনুধাবন করলেন। বসুন্ধরা গো রূপ ধারণ করে পলায়ন করলেন এবং ত্রাসের জন্য ব্রহ্মালোকে গেলেন। কিন্তু সর্বত্র উদ্যতাস্ত্র বৈণ্যকে দেখে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, স্ত্রী বধে যে মহাপাপ তা কি তুমি জানো না? আমাকে বিনষ্ট করবার জন্য কেন তোমার এই উদ্যম? পৃথু বললেন, একজনের নিধন হলে যদি অনেকে রক্ষা পায় তো তাকে বধ করে পুণ্য হয়। পৃথিবী বললেন, রাজা, প্রজাদের উপকারের জন্য যদি আমাকে বধ কর, তবে তোমার প্রজাদের আধার হবে কে? পৃথু বললেন, তুমি আমার শাসনে পরাঙ্মুখ। তাই তোমাকে এই বাণ দিয়ে বধ করে আমি আত্মযোগ বলেই সমস্ত প্রজা ধারণ করব। এর পর ভীত বসুধা রাজাকে প্রণাম করে বললেন, উপায় অনুসারে কাজ করলে সমস্ত কাজই সিদ্ধ হয়। আমি তোমাকে সেই উপায় বলে দিচ্ছি, যদি ইচ্ছা হয় তো

কর। সমস্ত ওষধি আমি জীর্ণ করে ফেলেছি। তবে তোমাকে আমি ক্ষীরপরিণামিনী ওষধি দেব। প্রজার হিতের জন্য তুমি আমাকে বৎস প্রদান কর, তাতে আমি বৎসলা হয়ে ক্ষরণ করব। হে বীর, তুমি আমাকে সর্বত্র সমতল কর। তাতেই আমি বনৌষধির বীজভূত ক্ষীর সবত্র বিকীর্ণ করব।

এর পর বৈণ্য তাঁর ধনুস্কোটি দিয়ে শত সহস্র শৈল উৎসারিত করলেন। তাতে শৈলগুলি এক স্থানে উচ্চতর হয়েছে। পূর্বে বিষম পৃথিবীতে পুর বা গ্রামের প্রবিভাগ, শস্য, গোরক্ষা, কৃষি ও বণিকপথ ছিল না। বৈণ্যের সময়েই এই সব হয়েছে। যে সব স্থান সমতল ছিল, রাজা সেখানেই প্রজাদের নিবাস কল্পনা করলেন। সমস্ত ওষধি বিনষ্ট হবার পর শুধু ফলমূল প্রজাদের আহার হয়েছিল। তাও অতি কষ্টে জুটত। পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করে স্বহস্তে ধরিত্রী দোহন করেন। তাতেই তাঁর প্রজাদের জন্য শস্য উৎপন্ন হল। আজও প্রজারা সেই অন্নে জীবন ধারণ করছে। প্রাণ দান কবার জন্য পৃথু ভূমির পিতা হয়েছিলেন। এই জন্যই ভূমির নাম পৃথিবী হয়েছে।

পৃথুর রাজত্ব কালের এই বিবরণ দিয়েছেন তাঁরই নিযুক্ত মাগধ ও সূত। পুরাণকার এই বিবরণ মেনে নিয়ে পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় যে বেণের মৃত্যুর পরে তাঁর রাজ্য দীর্ঘকাল অরাজক অবস্থায় পড়ে ছিল। কোন কৃষি কাজ হয় নি, প্রজারা জীবন ধারণ করেছে শুধু ফলমূল খেয়ে। দেশে চোরের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছিল। এই দুরবস্থা দেখেই ঋষিরা একজন রাজার অন্বেষণ করেছিলেন। দেশের প্রজাদের মধ্যে পেয়েছিলেন একজন শক্তিশালী নিষাদ এবং পৃথুকে পেয়েছিলেন রাজ্যের সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে। সত্য অন্য রকমও হতে পারে। সেনাবাহিনীর একজন প্রধান পৃথু নিষাদদের বিতাড়িত করে ক্ষমতা অধিকার করেছিলেন এবং জনগণের সমর্থন লাভের জন্য ঋষিদের

ডেকে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি বিচক্ষণ ছিলেন। তাই সূত ও মাগধ নিয়োগ করেই ক্ষান্ত হন নি, জনগণের কথাও চিন্তা করেছিলেন। ভূমি সমতল করে কৃষির ব্যবস্থা করেছিলেন, সমতল ভূমিতে প্রজাদের গ্রাম নির্মাণ করে বসতি স্থাপন এবং গো রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাণিজ্যের জন্য বণিক পথও নির্মাণ করেছিলেন তিনি। রাজ্যের উন্নতির জন্য এই সব করেছিলেন বলেই তাঁর নিজের নামে রাজ্যের নাম হয়েছিল পৃথিবী। এই পৃথিবী মানে জগৎ নয়। পৃথু রাজার রাজ্য। রাজা ভরতের পর দক্ষিণের হিম বর্ষের নাম হয়েছিল ভারতবর্ষ, পৃথুর নামে নাম হল পৃথিবী। সমগ্র ভারতের নাম নিশ্চয়ই নয়, ভারতের যে অংশে জনবসতি স্থাপিত হয়েছিল শুধু সেই অংশেরই নাম হল পৃথিবী।

লক্ষ্য করার মতো আরও একটি বিষয় আছে—তা হল রূপকের সাহায্যে বর্ণনা। রাজ্য শস্যহীন হয়েছে শুনে পৃথু ধনুর্বাণ নিয়ে বসুধার অনুধাবন করলেন এবং বসুধা গোরূপ ধারণ করে পলায়ন করলেন। কিন্তু সর্বত্র উদ্যতাস্ত্র বৈণ্যকে দেখে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, স্ত্রীবধে যে মহাপাপ তা কি তুমি জানো না? কিন্তু পৃথুকে বদ্ধপরিকর দেখে ভূমি সমতল করে গোমাতা রূপী বসুন্ধরাকে বৎসের মতো হয়ে দোহন করার পরামর্শ দিলেন। এরই নাম কৃষিকার্য। পৃথু রাজা হবার পরেই কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করেছিলেন না বলে পুরাণকার একটি রূপকের আশ্রয় নিয়ে এই কথা বললেন। পুরাণের প্রায় সর্বত্র এই রকমের রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এটাই ছিল সে যুগে ঘটনার বিবরণ দেবার রীতি। এই রীতিকে মেনে নিয়ে ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করলেই বোঝা যাবে যে পুরাণ কল্পিত কাহিনী নয়, পুরাণ এই দেশের প্রাচীন ইতিহাস। এই ইতিহাস রচনার পদ্ধতি এ কালের মতো ছিল না বলেই পুরাণ তার যথার্থ মর্যাদা এ কালের মানুষের কাছে হারিয়েছে। সামান্য চেষ্টাতেই তার মর্যাদার পুনরুদ্ধার সম্ভব।

পুরাণে ইতিহাসের উপাদান

পুরাণে ইতিহাসের আরম্ভ স্বায়ম্ভুব মনু থেকে। ষষ্ঠ মন্বন্তর অর্থাৎ চাক্ষুষ মনুব কালে দক্ষেব জন্ম। প্রজা সৃষ্টি করেছেন বলে তিনি প্রজাপতি। ছয়টি মন্বন্তরের কথা পুরাণে খুব সংক্ষেপে পাওয়া যায়। তার কারণও আলোচনা করা হয়েছে। পৃথু তাঁর রাজত্বকালে ঐতিহাসিক নিয়োগ করেছেন। তাঁর পূর্বের ঘটনা লোক মুখে চলে এসেছে এবং তাঁব পরে দীর্ঘ কাল পৃথিবী জলমগ্ন ছিল।

বিষ্ণু পুরাণে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের পর উনত্রিশজন রাজার নাম পাওয়া যায় এবং উত্তানপাদ থেকে দক্ষ পর্যন্ত পাওয়া যায় উনিশজন রাজার নাম। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবের কাহিনী অমব হয়ে আছে। আমরা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদকে স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র বলে জানি। কিন্তু বিষ্ণু পুরাণেরই দ্বিতীয় অংশে প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোক তিনটি পড়লে বোঝা যায় যে বরাহ কল্পে স্বায়ম্ভুব মনু যখন প্রথম মন্বন্তরের অধিপতি ছিলেন, তখন প্রিয়ব্রতের বংশধররা রাজা হয়েছিলেন। স্বারোচিষ মন্বন্তর থেকেই উত্তানপাদের বংশধরদের আধিপত্য হয় এবং স্বায়ম্ভুব বংশের পুত্র পরম্পরায় পৃথিবী পুর্ণ হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণের সঙ্গে বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণ মিলিয়ে প্রিয়ব্রতের বংশে বত্রিশজন ও উত্তানপাদের বংশে একুশজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এ ছাড়া কণ্ডু মুনির কাহিনী দিয়ে প্রায় এক হাজার বৎসরের ছেদের কথাও বলা হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণের উপাদান নিয়ে এই সময়ের ইতিহাস রচনা অসম্ভব কাজ নয়।

পুরাণে কালের হিসাবে অতিশয়োক্তির কথা মনে রাখতে হবে। বিষ্ণু পুবাণে আছে যে প্লক্ষ দ্বীপের অধিবাসীরা পাঁচ হাজার বৎসর ও পুষ্কর দ্বীপের অধিবাসীরা দশ হাজার বৎসর বাঁচে। সহস্র কথাটি এখানে বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখনও আমরা বলি শতায়ু হও, বা সহস্র বৎসর পরমায়ু হোক। ন্যায় শাস্ত্রে একে উপলক্ষণ প্রয়োগ বলে। সহস্র শব্দটির আর এক রকমের ব্যবহার দেখা যায়। কেউ

দশ হাজার বৎসর তপস্যা করেছেন বা কোন রাজা পঞ্চাশ হাজার বৎসর রাজত্ব করেছেন। এই সব ক্ষেত্রে হাজার বা সহস্র শব্দটি বাদ দিয়ে বুঝতে হবে যে দশ বৎসর তপস্যা করেছেন বা রাজত্ব করেছেন পঞ্চাশ বৎসর। শুধু কালের ক্ষেত্রে নয়, সংখ্যার ক্ষেত্রেও এই রকমের অতিশয়োক্তি দেখা যায়। যেমন, দক্ষের প্রথম পাঁচ হাজার পুত্র বিবাগী হয়ে দেশত্যাগ করার পর তাঁর আরও হাজার হাজার পুত্র জন্মেছিল। পুরাণে এই হাজার বা সহস্র শব্দ দেখে ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

পুত্র শব্দটিও নানা অর্থে ব্যবহৃত হত। পুত্রের মতো যত্নে যাদের রক্ষা করতে হত, তারাও রাজার পুত্র। প্রজারা পুত্র, সেনাও পুত্র এবং কোন কাজে যাদের মজুর রূপে নিয়োগ করা হত, তারাও পুত্র বলে গণ্য হত। কপিলের শাপে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র দগ্ধ হয়। এর অর্থ রাজার ষাট হাজার প্রজার মৃত্যু হয়। দগ্ধ হওয়ার সঙ্গে উত্তাপের যোগ আছে। মনে হয় যে এই শাপের অর্থ জ্বর। কোন স্থান অস্বাস্থ্যকর ছিল বলে ম্যালেরিয়ার মতো কোন জ্বরে প্রজাদের মৃত্যু হয়েছে। এই জ্বরে দেহ পীত বা অগ্নিবর্ণ হবার জন্যই কপিল মুনির শাপের উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরই বোধহয় সগর রাজা সেই প্রদেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য খাল কেটে গঙ্গাকে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরই বংশধর ভগীরথ এই কাজ সম্পূর্ণ করেন। এই ভাবেই কুবলয়াশ্বের একুশ হাজার পুত্র ধুন্ধু অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়। এই পুত্ররা তাঁর সেনাবাহিনীর যোদ্ধা কিংবা উদ্ধার কার্যে নিযুক্ত মজুর। যথাস্থানে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সহস্র শব্দটির অন্য অর্থও আছে। দত্তাত্রেয়র বরে কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুনের সহস্র বাহু হয়েছিল। সেনা বাহিনীই রাজার বাহু। রাজা কার্তবীর্য অর্জুন দত্তাত্রেয়র শিষ্য ছিলেন। তিনিই রাজাকে অজেয় হবার জন্য সহস্র সেনার বাহুবল রাখবার উপদেশ দিয়েছিলেন।

যাঁর বাহুবল অপ্রতিহত, তিনি সহস্রবাহু। যাঁর সদা সতর্ক দৃষ্টি, তিনি সহস্র চক্ষু। দশানন শব্দটিও এই রকম অর্থবহ। হিন্দু মতে দিক দশটি এবং এই দশ দিকে যাঁর দৃষ্টি বা যাঁর মুখের আদেশ দশ দিকে প্রতিপালিত হয়, তিনিই দশানন। রাবণ দশানন ছিলেন অর্থ তাঁর দশ দিকে দৃষ্টি ছিল বা দশ দিকে তাঁর আদেশ প্রতিপালিত হত। তাঁর দশটি মুণ্ড ছিল, এ পববর্তী কালের কল্পনা।

পুরাণে রূপক, উপলক্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ রচনা রীতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে পৌরাণিক উপাদানে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস জানা কঠিন হবে না। অবশ্য কাল নির্ণয়ের চেষ্টাই প্রথমে করা আবশ্যক। খ্রীষ্টাব্দে স্বায়ম্ভুব মনুর কাল নির্ণয় করতে পারলেই এ কাজ সহজ হয়ে যাবে। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে পুরাণেই এর সূত্র আছে। পৌরাণিক কালকে খ্রীষ্টাব্দে উদ্ধার করা অবিসংবাদিত ভাবেই সম্ভব।

পৌরাণিক কাল নির্ণয় প্রসঙ্গ

অনেকেই মনে করেন যে পৌরাণিক ঘটনার কাল জানা সম্ভব নয়। সাধারণ ভাবে আমরা চার যুগের নাম জানি—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগ। এই সব যুগ কত বৎসরের, সে সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা অস্পষ্ট। পুরাণে এ সব কথা নেই, এমন নয়। স্বীকার করতে হয় যে আমরা এ সব কথা জানবার চেষ্টা করি নি।

পুরাণ থেকেই জানা যায় যে পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ আছে। সেগুলি হল সর্গ বা সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রতিসর্গ বা প্রলয় ও পুনর্সৃষ্টি, দেবতা ও পিতৃগণের বংশাবলী, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। মন্বন্তর প্রসঙ্গেই সেকালের কাল গণনার প্রণালী বলা হয়েছে।

সকলের আগে কালের বিভাগ জানা দরকার। চোখের পাতা ফেলতে যে সময় লাগে, তার নাম নিমেষ। ১ নিমেষের পরিমাণ এ কালের হিসাবে ·২১৩ সেকেণ্ড অর্থাৎ এক সেকেণ্ডের প্রায় এক

পঞ্চমাংশ। ১৫ নিমেষে এক কাষ্ঠা ও ৩০ কাষ্ঠায় এক কলা। এক কলার পরিমাণ ৯৬ সেকেণ্ড। ৩০ কলায় ১ মুহূর্ত অর্থাৎ ৪৮ মিনিট। ৩০ মুহূর্তে ১ অহোরাত্র অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা। ৩০ অহোরাত্রে তুই পক্ষ বা ১ মাস। ৬ মাসে ১ অয়ন এবং ২ অয়নে ১ বর্ষ। ৩০ অহোবাত্রে পিতৃগণের ১ অহোরাত্র, ৩০ মাসে পিতৃগণের এক মাস এবং ১২ মাসে দেবতাদের এক অহোরাত্র। উত্তরায়ণে দেবতাদের এক দিন ও দক্ষিণায়ণে এক রাত্রি। দেবতাদের ১ বর্ষে মানুষের ৩৬০ বৎসর।

মনে রাখতে হবে যে মানুষের ৩০ মাসে পিতৃগণের ১ মাস ও মানুষের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদের ১ বৎসর। মানুষ মানে জীবিত মানুষের কাল নির্দেশ সম্ভব হলেও পূর্বপুরুষের কালের হিসাব রাখা সহজ নয়। তাই একটি পিতৃ মানের প্রয়োজন হয়েছিল।

একটি দীর্ঘ কালের যুগও কল্পনা করা হয়। তার নাম কল্প। মানুষ মানের পাঁচ হাজার বৎসরে যে এক কল্প, তা আমরা পুরাণ থেকেই জানতে পারি। বিষ্ণু পুরাণের দ্বিতীয় অংশের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে যে জম্বু দ্বীপের বর্ষাচলের অধিবাসীদের চিরকাল অর্থাৎ কল্পকাল পরে মৃত্যু হয়। এর পরেই আছে যে সুস্থ দেহে তারা পাঁচ হাজার বৎসর বাঁচে। এই তুটি উক্তি মেলালেই জানা যায় যে মানুষের পাঁচ হাজার বছরে এক কল্পকাল। ৫০০০ বৎসরে ৬০,০০০ মাস। মানুষের ৩০ মাসে পিতৃ মানের ১ মাস বলে (৬০০০০ ÷ ৩০ =) ২০০০ মাসে ১ পিতৃযুগ ও ৩০ পিতৃযুগে ১ কল্প ধরা হল। এক পিতৃযুগের পরিমাণ হল ২০০০ মাস।

যুগ শব্দটি যুগ্ম থেকে এসেছে বলে মনে হয়। একটি বিশেষ সময় থেকে সেই সময়ের আবর্তনকেই যুগ বলা হত। যেমন এক সূর্যোদয় থেকে আর এক সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী কাল, কিংবা কোন একটি ঘটনার পুনরাবর্তন কালকেই যুগ বলা যেতে পারে। পুরাণে পাঁচ বৎসরে এক যুগ এবং এক হাজার যুগে এক কল্প। মৎস্য পুরাণেও বলা হয়েছে যে সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদ্‌বৎসর, অনুবৎসর ও

রুদ্র বৎসর পাঁচ বৎসরের যুগ—পঞ্চাব্দা যে যুগাত্মকাঃ॥ মৎস্য। ১৪৪।১৭-১৮॥ বিষ্ণু পুরাণে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে চার প্রকার মাস অনুসারে বিভক্ত সংবৎসরাদি পাঁচ বৎসর সকল কালের নির্ণায়ক ও যুগ নামে অভিহিত।—

সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্মাসবিকল্পিতাঃ।
নিশ্চয়ঃ সর্বকালস্য যুগমিত্যভি ধীয়তে॥
সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয় পরিবৎসরঃ।
ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ।
বৎসরঃ পঞ্চমশ্চাত্র কালোঽয়ং যুগসংজ্ঞিতঃ॥

—বিষ্ণু॥ ২।৮।৬৬-৬৭॥

বায়ু পুরাণে চার প্রকার মাসেরও উল্লেখ আছে। সৌর, সৌম্য, নাক্ষত্র এবং সাবন এই চার নামের মাস পুরাণে বর্ণিত আছে।—

সৌরং সৌম্যন্তু বিজ্ঞেয়ং নাক্ষত্রং সাবনং তথা।
নামান্যেতানি চত্বারি বৈঃ পুরাণং বিভাব্যতে॥

—বায়ু। ৫০।১৮৯॥

পাঁচ বৎসরে যুগ কল্পনার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। পুরাণকার সেকালে চার রকম মাসের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তিরিশ সূর্যোদয়ে সাবন মাস, যে সময়ে সূর্য এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে যায় তা সৌর মাস, শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা পর্যন্ত সময় সৌম্য বা চান্দ্র মাস এবং চন্দ্রের এক এক নক্ষত্র ভোগের কাল নাক্ষত্র মাস। এই হিসাবে ৫ সৌর বৎসরে ৬০ সৌর মাস, ৬১ সাবন মাস, ৬২ চান্দ্র মাস ও ৬৭ নাক্ষত্র মাস। একই দিনে এই সবের আরম্ভ ধরলে পাঁচ বৎসর পর প্রথম অবস্থার পুনরাবর্তন ঘটে। তাই পাঁচ বৎসরের কালকেই সব চেয়ে ছোট নৈসর্গিক জ্যোতিষিক যুগ বলে মনে করা হয়েছিল। মাসই এই যুগের একক বা unit। একে মানও বলা হয়েছে।

কিন্তু এত স্বল্প কালের যুগ দিয়ে দীর্ঘ কালের ঘটনার হিসাব

রাখা সম্ভব নয়। তাই ইতিহাস রচনার জন্য দীর্ঘতর যুগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে মানুষের এক মাসে পিতৃগণের এক দিন ও মানুষের এক বৎসরে দেবতাদের এক দিন। কাজেই এই হিসাবে পাঁচ বৎসরের যুগকে মানব যুগ বলে পিতৃযুগ ও দৈবযুগের কল্পনা করা হয়। বর্তমান কালের হিসাব মানবযুগ দিয়ে রাখা চলতে পারে, কিন্তু এই মান দণ্ড দিয়ে অতীতের রাজা ঋষি ও মৃত ব্যক্তির কাল নির্দেশ সম্ভব নয়। এর জন্য পিতৃ মান দণ্ডে কাল নির্ণয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কী ভাবে ২০০০ মাসে এক পিতৃযুগ ধরা হয়, তা আগেই বলা হয়েছে। কৃষ্ণ অষ্টাবিংশ যুগে জন্মেছিলেন বললেই বোঝা যায় যে তিনি কল্পের আদি থেকে ২৭ পিতৃযুগ গত হবার পরে অর্থাৎ (২৭×২০০০÷১২=)৪৫০০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই কল্প শেষ হতে আর মাত্র ৩ পিতৃযুগ অর্থাৎ (৩×২০০০÷১২=)৫০০ বৎসর বাকি আছে। এই ভাবে সৃষ্টি ও প্রলয়ের জন্য আরও বড় মান দণ্ডের দরকার আছে মনে করে পুরাণকার দৈবযুগ ব্যবহার করেছেন। মানুষের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদের এক বৎসর। দেবতাদের বারো হাজার বৎসরে এক যুগ এবং এক হাজার যুগে এক কল্প। এক কল্পই ব্রহ্মার এক দিন। প্রলয়ের কাল ব্রহ্মার এক রাত্রি।

পৌরাণিক কাল নির্ণয়ের জন্য মনু ও মন্বন্তর সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। মানব-যুগের মতো পিতৃ-যুগও আবর্তনশীল বলে একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। বায়ু পুরাণের ৩২ অধ্যায়ে আছে, ইলাবৃত বর্ষে দেবতারা ১০০০ পরিবৎসর কালবিন্দু স্থির না করেই যুগ গণনা করে আসছিলেন। যুগগুলি চক্রবৎ ভ্রমণ করতে থাকলে দেবতারা কালের বশ হয়ে তার হিসাবে অসমর্থ হয়ে পড়েন এবং মহাদেবের শরণ নেন। মহাদেব কল্পমুখ নির্দিষ্ট করে মনু গণনা আরম্ভ করলেন। স্বায়ম্ভুব মনু থেকে কল্পের ও কৃতযুগের আরম্ভ হল এবং এইটাই পুরাণের স্থির বিন্দু নির্দিষ্ট

হল। এই দিন থেকেই যে আমাদের ইতিহাসের আরম্ভ, তাতে কোন সংশয় নেই।

পুরাণে মনু চোদ্দজন। তাই ৫০০০ বৎসরের কল্পকালকে ১৪ ভাগ করলে ৩৫৫ বৎসর পাওয়া যায় এবং অবশিষ্ট থাকে ৩০ বৎসর। ১৪ মনুর সন্ধি ১৩। তাই প্রথম মনুর পূর্বে ও শেষ মনুর পরে আরও দুটি সন্ধি কল্পনা করলে মোট সন্ধির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫। অর্থাৎ এক সন্ধির কাল ২ বৎসর। এই মনুদের নাম স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম সাবর্ণি, রৌদ্র সাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য।

এক কল্পে ৫, ১০ বা ১৫ মনু কল্পনা না করে ১৪ মনু কেন ধরা হল, তারও একটা কৈফিয়ৎ আছে। এ কালের মতো দশ বা শত সংখ্যা ধরে গণনা করলে তা নৈসর্গিক বা জ্যোতিষিক হত না। পুরাণকার একটি বৃহত্তর যুগের সন্ধানে ৫-এর গুণিতক আবর্তন কালের সন্ধান পেলেন। ৩৫৫ দিনে এক চান্দ্র বৎসর ও ৩৬৬ দিনে এক সৌর বৎসর হয়। একই দিনে পূর্বোক্ত চার প্রকার মাস এবং চান্দ্র ও সৌর বৎসরের আরম্ভ ধরলে দেখা যায় যে ৫ বৎসর অন্তর চার প্রকার মাসেরই যুগ এবং ৩৫৫ বৎসর পর পর চান্দ্র ও সৌর বৎসরের যুগ হবে। এই যুগ ৫-এর গুণিতক এবং নৈসর্গিকও বটে। তাই তাঁরা দীর্ঘ যুগের জন্য ৩৫৫ বৎসরের যুগ কল্পনা করে ৫০০০ বৎসরকে ভাগ করে ১৪ সংখ্যাটি পেলেন এবং অবশিষ্ট ৩০ বৎসরকে ১৫টি সন্ধিতে ভাগ করে খাপ খাইয়ে দিলেন। এই ১৪ যুগের নাম দিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে। স্বায়ম্ভুব মনু থেকে আরম্ভ করে বৈবস্বত মনু পর্যন্ত এই গণনা চালিয়ে এসে মনু গণনা পরিত্যাগ করলেন। এর পর পিতৃযুগ প্রচলিত হয়েছিল এবং যুধিষ্ঠিরের পরবর্তী কালের পুরাণকার কাল গণনার জন্য প্রথমে সপ্তর্ষি যুগমান ও পরে যুধিষ্ঠিরাব্দের প্রচলন করে সাধারণ বর্ষমান প্রয়োগ করেন।

পুরাণে ধর্ম যুগও আছে। কৃত বা সত্য যুগ, ত্রেতা, দ্বাপর ও

কলিযুগের নাম আমরা জানি। কিন্তু এই সব যুগ কত কালের, সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। এই চতুর্যুগের চারিটি পাদ হল কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। কিন্তু এই পাদগুলি সমান নয়। কলির দ্বিগুণ দ্বাপর, ত্রেতা ত্রিগুণ ও কৃত চতুর্গুণ। বায়ু পুরাণের কথায় কলির কাল ১ জিহ্বা, দ্বাপর ২ জিহ্বা, ত্রেতা ৩ জিহ্বা ও কৃত ৪ জিহ্বা। চতুষ্পাদ চতুর্যুগের পরিমাণ ১০ জিহ্বা॥ বায়ু। ৩২।১৪॥ কৃত যুগে ধর্ম চতুষ্পাদ অর্থ পূর্ণ, ত্রেতায় এক পাদ কম বলে মানুষের মনে কিছু পাপ বুদ্ধি প্রবেশ করেছে, দ্বাপরে ধর্ম আরও এক পাদ কম এবং কলিতে ধর্মের শুধু একটি পাদ, বাকি সবটাই পাপ বুদ্ধি।

বিষ্ণু পুরাণে পাওয়া যায় যে যত সহস্র বৎসবে কৃতাদি যুগ হয়, তত শত বৎসরে যুগ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ হয়। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্তী কালকেই যুগ বলে॥বিষ্ণু।১।৩।১০-১৪॥ অন্য ভাবে পুরাণেই বলা হয়েছে যে যুগ যত বৎসর, তার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ তত মাস। এই হিসাবে কল্পের ধর্ম যুগ বিভাগ এই রকম—

কৃত যুগ	২০০০ বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ ২০০০ মাস।
ত্রেতা যুগ	১৫০০ বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ ১৫০০ মাস।
দ্বাপর যুগ	১০০০ বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ ১০০০ মাস, এবং
কলি যুগ	৫০০ বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ ৫০০ মাস।

যুগ আরম্ভ হবার পূর্বে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ যুগ শেষ হবার পবে।

পৌরাণিক কাল নির্ণয়ের জন্য সপ্তর্ষি যুগ মানের সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। সাতজন ঋষি সপ্তর্ষি নামে অভিহিত। আকাশে সপ্তর্ষি নামে সাতটি নক্ষত্র আছে। ইংরেজীতে এই নক্ষত্র-মণ্ডলের নাম Great Bear। মন্বন্তরের সঙ্গে সপ্তর্ষির একটা বিশেষ যোগসূত্র আছে। পুরাণে কল্পিত হয়েছে যে প্রত্যেক মন্বন্তরে এক একজন মনুর সঙ্গে সপ্তর্ষিরও আবির্ভাব হয়। এই কল্পনা থেকেই অনুমান করা যায় যে মনু গণনার সঙ্গে সপ্তর্ষি গণনার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

সপ্তর্ষি যুগের সম্বন্ধে পুরাণে যে সব উক্তি আছে, তার থেকে জানা যায় যে সপ্তর্ষিরা ১০০ বৎসর করে এক এক নক্ষত্র ভোগ করেন এবং ২৭০০ বৎসরে ২৭ নক্ষত্র ভোগ করেন। এই ভাবে এক সপ্তর্ষি মহা যুগ শেষ হয়ে আর এক সপ্তর্ষি মহা যুগ আরম্ভ হয়। নক্ষত্র ভোগ কথাটি বুঝতে হলে পুরাণেই তার অর্থ খুঁজতে হবে। বলা হয়েছে যে সপ্তর্ষির প্রথম দুই নক্ষত্রের মধ্য বিন্দু থেকে সমসূত্রে যে নক্ষত্রটি দেখা যাবে, সেই নক্ষত্রেই সপ্তর্ষির অধিষ্ঠান বলে মনে করতে হবে ॥ বিষ্ণু।৪।২৪।৫৩॥ সপ্তর্ষির এই নক্ষত্র ভোগের কাল ১০০ বৎসর এবং ২৭ নক্ষত্র ভোগের কাল ২৭০০ বৎসর। প্রকৃত পক্ষে কোন নক্ষত্র ভোগের কাল সমান নয় এবং তার পরিমাণও ১০০ বৎসর নয়। তাই সপ্তর্ষি যুগ নৈসর্গিক নয়, এটি কাল্পনিক। শতাব্দী নির্দেশের জন্য সাতাশটি নক্ষত্র দিয়ে একটি সাঙ্কেতিক উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছিল।

বিষ্ণু পুরাণের মতে সপ্তর্ষি ও মনু এক কালে প্রবর্তিত হয় এবং প্রতি মন্বন্তরে সাতজন ঋষি। এই রকমের কথা বায়ু পুরাণেও আছে। সুতরাং ৩৫৫ বৎসরের এক মনুকাল সাতজন ঋষির মধ্যে ভাগ করে দিলে এক ঋষির কাল দাঁড়ায় ৫০ বৎসরের কিছু বেশী, অর্থাৎ ৫০.৫ বৎসর। বায়ু পুরাণে যে ৩০৩০ বৎসরের সপ্তর্ষি কাল পাওয়া যায় তা এই সংখ্যার ৬০ গুণ অর্থাৎ এই কাল পিতৃ মানদণ্ডে ৩০ দিয়ে বিভক্ত হলে ১০১ বৎসরের যুগ পাওয়া যায়। মনে হয় যে সুবিধার জন্য ১০১-এর পরিবর্তে ১০০ বৎসরই সপ্তর্ষি যুগ বলে কল্পনা করা হয়। অনুমান করা যায় যে ২০০০ মাসের পিতৃযুগের মতো সপ্তর্ষি যুগও পুরাকালেই কল্পিত হয়েছিল, কিন্তু মনু-গণনা পরিত্যক্ত হবার পরেই এই গণনা প্রচলিত হয়।

এখন বিচার করে দেখতে হবে, কখন্ কোন্ নক্ষত্র থেকে এই সপ্তর্ষি গণনা আরম্ভ হয়েছিল। এখন অশ্বিনীকে প্রথম নক্ষত্র ধরা হলেও পুরাকালে যে জ্যেষ্ঠা প্রথম নক্ষত্র ছিল, তা তার নাম থেকেই

বোঝা যায়। জ্যেষ্ঠা থেকেই নক্ষত্র যুগের আরম্ভ, এই রকম মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এই সময় থেকে কল্পের আরম্ভ হয় নি। এ কথা মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। ৫০০০ বৎসরে এক কল্প এবং কল্পের শেষেই কলি যুগের শেষ। কল্প ও নক্ষত্র মহা যুগ যদি একই সঙ্গে আরম্ভ হয়ে থাকে তো এক নক্ষত্র মহা যুগে ২৭০০ বৎসর ও ২৩ নক্ষত্র যুগে ২৩০০ বৎসর শেষ হবার পর কল্প শেষ হবার কথা। কিন্তু মৎস্য পুরাণে আছে যে চতুর্বিংশ নক্ষত্রে ব্রহ্মার শতবর্ষ পূর্ণ হবে এবং তখন লোক বিপন্ন হবে।—'

ব্রহ্মণস্তু চতুর্বিংশা ভবিষ্যন্তি শতং সমাঃ।
ততঃ প্রভৃত্যয়ং সর্বো লোকো ব্যাপৎস্যতে ভৃশম্॥

—মৎস্য।২৭৩।৪৪॥

ব্রহ্মার শত বৎসরে এক মহাকল্প বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে নক্ষত্র মহা যুগের আরম্ভ এক সপ্তর্ষি যুগ অর্থাৎ ১০০ বৎসর পূর্বে। এ কথা মেনে নিলেই দেখা যাবে যে চতুর্বিংশ নক্ষত্রেই কল্প শেষ হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বায়ু পুরাণের আর একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তাতে বলা হয়েছে যে ইলাবৃত বর্ষের দেবতারা কালবিন্দু স্থির না করেই যুগ গণনা করে আসছিলেন। ১০০০ বৎসর অতীত হবার পর মহাদেব কল্পমুখ স্থির করে মনু গণনা আরম্ভ করেন। সংখ্যাটি ১০০০ না হয়ে ১০০ হলে নিশ্চিত ভাবে বলা যেত যে নক্ষত্র মহা যুগ আরম্ভ হবার ১০০ বৎসর পরে দ্বিতীয় সপ্তর্ষি যুগের প্রথমে কল্পমুখ নির্দিষ্ট হয় এবং মনু গণনাও আরম্ভ হয় এই সময়ে। কল্পারম্ভের একশো বৎসর পরেই মহাদেব বিদ্যমান ছিলেন এবং তখন তিনি প্রবীণ ব্যক্তি।

চতুর্বিংশ যুগে যে কল্প শেষ, এ কথার সমর্থন বায়ু পুরাণেও আছে। পরীক্ষিতের কালে সপ্তর্ষি যখন শত বর্ষ মঘায় থাকবেন এবং যখন অন্ধ্রকাল আসবে ও চতুর্বিংশ যুগ আসবে, তখন সমস্ত প্রজা ধর্ম

অর্থ কাম বিষয়ে মিথ্যায় অভিভূত হয়ে অত্যন্ত বিপন্ন হবে ॥বায়ু। ৯৯।৪২৩-৪২৪॥

এই সব উক্তি বিচার করে অসংশয়ে মেনে নেওয়া যায় যে জ্যেষ্ঠায় নক্ষত্র যুগের আরম্ভ এবং কল্পের আরম্ভ মূলা নক্ষত্রে। এই জন্যই বোধ হয় এই নক্ষত্রকেই মূল নক্ষত্র বলা হয়েছে। মূলা থেকে মনু গণনারও আরম্ভ।

বিষ্ণু পুরাণে পাওয়া যায় যে পরীক্ষিতের সময়ে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিল এবং সেই সময় থেকে দ্বাদশাব্দ শতাত্মক কলি যুগের প্রবর্তন হয়। —

তে তু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ।।বিষ্ণু৪।২৪।৩৪

আমরা জানি যে ৫০০০ বৎসরের কল্পে ৪৫০০ বৎসর অতীত হবার পর কলি যুগের আরম্ভ এবং কলি কালের পরিমাণ ৫০০ বৎসর। কিন্তু ১২০০ বৎসরের কলি পাওয়া যাচ্ছে। এই কলি দৈব মানের ॥ বিষ্ণু।১।৩।১০-১৪॥ অনুমান করা যেতে পারে যে দৈব মান ও মানুষ মানের কলি একই সঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছিল। অষ্টাবিংশ পিতৃ-যুগের গোড়া থেকেই যে কলি যুগের আরম্ভ, তাও আমরা জানি। কৃষ্ণাগ্রজ বলরামের সঙ্গে রেবতীর বিবাহ দেবার পরামর্শ দিয়ে ব্রহ্মা বলছেন, সম্প্রতি ভূতলে অষ্টাবিংশ যুগ চলছে। মনুর চতুর্যুগ অতীত প্রায় এবং কলিযুগ আসন্ন। —

সাম্প্রতং ভূতলেঽষ্টাবিংশতিতমমস্য মনোশ্চতুর্যুগমতীতপ্রায়ম্
আসন্নো হি তং কলিঃ॥ বিষ্ণু৪।১।২৩

এ রকমের কথা স্কন্দ পুরাণেও আছে। দ্বাপরান্তে অষ্টাবিংশ যুগ উপস্থিত হলে এবং সেই সময়ে ভারত যুদ্ধ অবসানে কলি যুগ এলে—

অষ্টাবিংশে তু যজ্ঞাতে দ্বাপরান্তে বসুন্ধরে।
যুদ্ধে চ ভারতেঽতীতে তিষ্যে সতি যুগে তথা॥
স্কন্দ।বিষ্ণু।৩।১৩॥

এই সব উক্তি থেকে জানা যায় যে সপ্তর্ষি যুগ মঘার আরম্ভে কলি যুগের প্রবর্তন হয়। অর্থাৎ এই সময়ে কল্পের ৪৫০০ বৎসর অতীত হয়ে গেছে।

কৃষ্ণের জন্মকাল বিষয়ে বায়ু পুরাণে আছে বে অষ্টাবিংশ যুগে দ্বাপরেব সন্ধ্যাংশ সম্যক্ ক্ষয় হলে ধর্ম যখন বিনষ্ট হয়েছিল, তখনই বৃষ্ণি কুলে জন্মেছিলেন প্রভু বিষ্ণু।—

অষ্টাবিংশতিমে তদ্দ্বাপরস্যাংশ সংক্ষয়ে।
নষ্টে ধর্মে তদা যজ্ঞে বিষ্ণু বৃষ্ণি কুলে প্রভুঃ॥ বায়ু।৯৮।৯৭॥

মহাভারতেও আছে যে দ্বাপর ও কলির অন্তর কাল এলে কৌরব ও পাণ্ডব সেনার যুদ্ধ হয়েছিল সমন্তপঞ্চকে।—

অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলি দ্বাপর য়োবভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডব সেনয়োঃ॥

—মহাভারত আদি।২।১৩॥

কলির সন্ধ্যা যে ৫০০ মাসের, আমরা তা জানি। ৫০০ মাসে ৪১ বৎসর ৮ মাস। দ্বাপরের সন্ধ্যাংশ সম্পূর্ণ ক্ষয় হবার পর কৃষ্ণ জন্মেছিলেন এবং কলির আরম্ভে অর্থাৎ সন্ধ্যা শেষ হবার পর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে যুদ্ধকালে কৃষ্ণের বয়স প্রায় ৪২ বৎসর। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে আছে যে যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই পরীক্ষিতের জন্ম। তাঁর পিতা অভিমন্যুর বয়স যুদ্ধের সময়ে ১৬ বৎসর মনে করলে অর্জুনের বয়স ৪২ বৎসর ধরা যেতে পারে। অর্জুনের ২৬ বৎসর বয়সে অভিমন্যু জন্মেছিলেন, এটাই স্বাভাবিক। কৃষ্ণ অর্জুনের সমবয়সী ছিলেন বলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বয়সও ৪২ বললে কোনমতেই অযৌক্তিক হবে না।

এইবারে কৃষ্ণের বয়স খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া গেলেই পুরাণের সমস্ত ...ারই কাল নির্দেশ সম্ভব হবে।

আছে ...র্তমান বিশ্বে যীশু খ্রীষ্টের নামে প্রচলিত খ্রীষ্টাব্দ দিয়ে ইতিহাসের যখন ...নির্দেশ করা হচ্ছে। খ্রীষ্টাব্দ প্রচলিত হবার পূর্বের ঘটনা খ্রীষ্ট

পূর্বাব্দ দিয়ে গণনা করা হয়। এর অর্থ যীশু খ্রীষ্টের কত কাল পূর্বে সেই ঘটনা ঘটেছিল, তা অনুমান করা হয়। এই জন্য খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের আগে একটা আনুমানিক শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পুরাকালে ভারতেও যে অব্দ গণনার প্রচলন ছিল, তা কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কহ্লনের গ্রন্থ রাজতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায়। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুধিষ্ঠিরাব্দের উল্লেখ করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির ভারতের একছত্র সম্রাট হয়েছিলেন এবং তাঁর নামেই আধুনিক প্রথায় একটি অব্দ প্রচলিত হয়। কিন্তু এই যুধিষ্ঠিরাব্দ এখন আর প্রচলিত নেই। অনুমান করলে অন্যায় হবে না যে পরবর্তী কোন সম্রাট তাঁর নিজের নামে একটি অব্দ চালু করলে যুধিষ্ঠিরাব্দ অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। আমরা জানি যে যুধিষ্ঠিরের পর মহাপদ্ম নন্দই ভারতে একছত্র সম্রাট হয়েছিলেন সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে। তিনি তাঁর নিজের নামে নন্দাব্দের প্রচলন করেছিলেন মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এই নন্দাব্দও এখন অপ্রচলিত। তার পরিবর্তে সকল পঞ্জিকায় আমরা কল্যব্দ দেখি। এই কল্যব্দের গণনা এখনও ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত আছে। অনেকেই মনে করেন যে কলি যুগের আরম্ভ থেকে কল্যব্দের সূচনা। কিন্তু এই কল্যব্দ দেখে স্বতঃই সন্দেহ জাগে যে কলি যুগের আরম্ভ এত প্রাচীন কালে হতেই পারে না।

যত দূর জানা যায়, আর্যভট সর্ব প্রথমে এই কল্যব্দের কথা বলেন ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। সেদিন তিনি বলেছিলেন যে কলির ৩৬০০ বৎসর অতীত হয়েছে। এই হিসাবেই ধরা হয় যে (৩৬০০ − ৪৯৯ =)৩১০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কলি যুগের আরম্ভ এবং বর্তমান কল্যব্দ (৩১০১ + ১৯৮২ =) ৫০৮৩। আর্যভটকে অনেকে আর্যভট্ট বলেন। তিনি যে প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোপারনিকাশের জন্মের প্রায় হাজার বছর আগেই তিনি বলেছিলেন যে নৌকায় চেপে স্রোতের অনুকূলে চললে যেমন

তীরের অচল বস্তুদের প্রতিকূলগামী মনে হয়, তেমনি পৃথিবীব মধ্য-ভাগ থেকেও আকাশেব স্থিব জ্যোতিষ্কদের সমবেগে পশ্চিমগামী বলে মনে হয়।—

অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সম পশ্চিমগানি লঙ্কাযাং॥

পৃথিবী যে স্থির নয়, পৃথিবী গতিশীল—এই ভূভ্রম-বাদ জ্যোতিষ তত্ত্বে তাঁরই আবিষ্কার। জ্যোতির্বিদ্যায় যে মহাযুগেব ধাবণা ও ব্যবহার, এতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। গণনা কবেই তিনি কলি যুগের সূচনা নির্ধারণ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তে তিনি কী ভাবে উপনীত হয়েছিলেন, তা বোঝা কঠিন নয়। বহু দিন থেকেই এ দেশে সপ্তর্ষি যুগের গণনা প্রচলিত ছিল। তিনি গণনা কবে দেখেছিলেন যে ৩১০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে রাহু ছাড়া অন্য সব গ্রহেব মধ্যাবস্থান মেষাদির খুব সন্নিহিত হয়। তাই তিনি সকল মধ্য স্থানকেই শূন্য কল্পনা করে ঐ বৎসরকেই কলিব আদি বলে স্থির করেন।

খুব সঙ্গত কারণে ধবে নেওয়া যেতে পারে যে তাঁর সময়ে যে অব্দ প্রচলিত ছিল, তাবই সূচনাকালের সঙ্গে এক নক্ষত্র মহা যুগ অর্থাৎ ২৭০০ বৎসর যোগ করে তিনি কল্যব্দেব আরম্ভ বলেছিলেন। ৩১০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ২৭০০ বৎসব বাদ দিলে পাওয়া যায ৪০১ খ্রীষ্ট পূবাব্দ। এইটিই যে মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক কাল, তা মনে কববার যুক্তি আছে এবং পূর্ণ সমর্থন আছে পুবাণের।

মহাপদ্ম নন্দ তাঁর রাজ্যাভিষেকের পর একটি নূতন অব্দের প্রচলন করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি শূদ্র ছিলেন এবং এ দেশের সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে একছত্র সম্রাট হয়েছিলেন। ইতিহাসে তাঁকেই ভারতের প্রথম সম্রাট বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি শূদ্র ছিলেন বলে ব্রাহ্মণের সমর্থন পান নি। পুরাণকাররা তাঁর প্রশংসা না করে নিন্দা করেছেন। মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে

যে নন্দ ছিলেন কলিকাংশজ বা সাক্ষাৎ কলি॥ মৎস্য ২৭২।১৭॥ নন্দেব রাজ্যকালে কলি যে বৃদ্ধি পাবে এবং কলিকালে কোন ক্ষত্রিয় রাজা থাকবে না, এ কথাও পুবাণে আছে। তাই তাঁব নামে প্রচলিত নন্দাব্দ যে কালক্রমে কল্যব্দে পবিণত হবে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বায়ু পুবাণে নন্দের উপাধি কালসম্বৃত॥ বায়ু।৯৯।৩২৬॥ কালসম্বৃত কথার অর্থ কালেব মনোনীত বা কালের দ্বারা আবৃত অর্থাৎ কলিকাল নন্দকে মনোনীত বা আবৃত করায় নন্দাব্দই কল্যব্দে রূপান্তবিত হয়েছে। আর্যভট জানতেন যে সাতাশ যুগ গত হবাব পর কলি প্রবর্তিত হয়েছে। এই সাতাশ যুগ ১৭ পিতৃযুগ অর্থাৎ ৮৫০০ বৎসব। কিন্তু তাঁর সময়ে নক্ষত্রযুগ প্রচলিত ছিল বলে তিনি ২৭ নক্ষত্র যুগ অর্থাৎ ২৭০০ বৎসর কল্যব্দে রূপান্তরিত নন্দাব্দের সঙ্গে যোগ করে বললেন (৪০১+২৭০০=)৩১০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কলি যুগের আরম্ভ। আর্যভট কর্তৃক নির্দিষ্ট কল্যব্দই এখনও পঞ্জিকায় প্রচলিত আছে।

এই সব প্রমাণ থেকে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ৪০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে নন্দের বাজ্যাভিষেক হয়েছিল এবং সেই দিন থেকেই নন্দাব্দ প্রচলিত হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তেব আবও প্রমাণ আছে। অর্বাচীন কাল নির্দেশের জন্য পুরাণকার বলেছেন যে নন্দাভিষেকেব ১০১৫ বৎসর পূর্বে পরীক্ষেতের জন্ম এবং ৮৩৬ বৎসর পরে অন্ধ্র রাজ্যের শেষ। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণু পুরাণ ৪।২৪।৩২, বায়ু পুরাণ ৯৯।৪১৬ এবং মৎস্য পুরাণ ২৭৩।৩৬ দ্রষ্টব্য। নন্দাব্দ প্রচলিত না থাকলে পুরাণকাররা এই বকম উক্তি করতেন না। এই সব পুরাণ রচনা কালে যুধিষ্ঠিরাব্দ অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল বলেই নন্দের অভিষেকের কাল দিয়ে সময় নির্দেশ করা হয়েছে।

নন্দের অভিষেক কাল স্থির করবার পর পরীক্ষিতের জন্মকাল নির্ণয়ের আর কোন অসুবিধা থাকে না। বিষ্ণু পুরাণে আছে, পরীক্ষিতের জন্ম থেকে নন্দের অভিষেক পর্যন্ত কালের পরিমাণ ১০১৫ বৎসর।—

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।

এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ বিষ্ণু ।৪।২৪।৩২

বায়ু পুরাণে অবশ্য এই ব্যবধান ১০৫০ বৎসর। কিন্তু এই উক্তি গ্রহণযোগ্য নয় এই কারণে যে বিষ্ণুপুরাণের অন্য শ্লোকে আছে, সপ্তর্ষিরা পূর্বাষাঢ়ায় গেলে নন্দ প্রভৃতি হতে কলি বৃদ্ধি পাবে ॥ বিষ্ণু। ৪।২৪।৩৯ ॥ এবং বায়ু পুরাণের কথা মেনে নিলে নন্দের রাজ্যকাল পূর্বাষাঢ়া ছাড়িয়ে যায়। কাজেই পরীক্ষিতের জন্ম (৪০১ + ১০১৫ =) ১৪১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। পুবাণের মতে এই বৎসরেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান হয় এবং এই যুদ্ধে সূর্য বংশের রাজা বৃহদ্বল নিহত হন। এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই কাবণে যে বৃহদ্বলের কাল নির্ণীত হলে সূর্যবংশেব সমস্ত রাজার আনুপূর্বিক কাল নির্ণয় সম্ভব হবে। পুরাণে সূর্য ও চন্দ্র বংশের সমস্ত রাজার ক্রম পাওয়া যায়। সত্য যুগের আদিতে প্রথম যুগে বর্তমান ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনু, বৈবস্বত মনু ছিলেন ত্রেতা যুগেব আরম্ভে ত্রয়োদশ যুগে, মূলক ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে এবং বৃহদ্বল ছিলেন কলির প্রারম্ভে অষ্টাবিংশ যুগে। যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ তাঁর সমকালীন ছিলেন। পৌরাণিক উপাদানে স্বায়ম্ভুব মনুর কাল নির্ণয় কবতে পারলে সমস্ত রাজার কালই খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া যাবে।

এর জন্য একটি স্থির বিন্দুব দরকার এবং কৃষ্ণের জন্মকালই সেই স্থির বিন্দু হবার পরম উপযোগী। আমরা মানি যে কৃষ্ণের জন্মকাল থেকেই কলির সূচনা হয়েছে এবং কলি প্রবল-হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে। কৃষ্ণের জন্মকালের উল্লেখ প্রায় সমস্ত পুরাণেই আছে। এই সব উক্তির বিচার করে তাঁর জন্মকাল সঠিক ভাবে নির্ণয় করা কঠিন কাজ নয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় কৃষ্ণের বয়স ৪২ বৎসর ছিল, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল ১৪১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। সুতরাং কৃষ্ণের জন্ম (১৪১৬ + ৪২ =)১৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে।

কৃষ্ণ অষ্টাবিংশতি যুগে জন্মেছিলেন। এই সূত্র থেকে কল্পের আদি জানা যাবে। বায়ু পুরাণে অষ্টাবিংশ যুগে কৃষ্ণের জন্মের

কথা আছে।' এই কথা বিষ্ণু পুরাণেও আছে। পুরাকালে গর্গ বলেছিলেন যে দ্বাপর শেষ হলে অষ্টাবিংশ যুগে যদু বংশে হরির জন্ম হবে।—

পুরা গর্গেণ কথিতমষ্টাবিংশতিমে যুগে।
দ্বাপরান্তে হরের্জন্ম যদোর্বংশে ভবিষ্যতি॥ বিষ্ণু ৫।২৩।২৫॥

বিষ্ণু পুরাণে এ কথাও আছে, যত দিন কৃষ্ণ পাদপদ্ম দিয়ে এই বসুন্ধরাকে স্পর্শ করে ছিলেন, তত দিন কলি এই পৃথিবীকে স্পর্শ করতে পারে নি।—

যদা স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাম।
তাবৎ পৃথ্বি পরিষ্বঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ॥ বিষ্ণু।৪।২ ।৩৬॥

যেদিন হরি মেদিনী ত্যাগ করে স্বর্গে গিয়েছেন, সেই দিনই এই কালকায় বলবান কলি অবতীর্ণ হয়েছে।—

যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সন্ত্যজ্য মেদিনীম্।
তস্মিন্নেবাবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ো বলী কলিঃ॥

—বিষ্ণু।৫।৩৮।৮॥

এই উক্তিগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে কৃষ্ণ অষ্টাবিংশ যুগে দ্বাপরের সন্ধ্যাংশ শেষ হবার পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যত দিন তিনি জীবিত ছিলেন, তত দিন কলি পৃথিবীকে স্পর্শ করে নি, তাঁর মৃত্যুর পরেই বলবান কলি অবতীর্ণ হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে যে দ্বাপরের পরেই কলি আসে নি। কলির সন্ধ্যা চলেছিল কৃষ্ণের প্রথম জীবনে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময কলির সন্ধ্যা শেষ হয়েছে এবং কলি প্রবল হয়েছে কৃষ্ণের মৃত্যুর পর। কল্পারম্ভ থেকে ২৭ পিতৃযুগ অর্থাৎ ৪৫০০ বৎসর অতীত হবার পর কলির সন্ধ্যা আরম্ভ। এর অর্থ (১৪৫৮ + ৪৫০০ =) ৫৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কল্পের আরম্ভ এবং আর ৫০০ বৎসর পরে অর্থাৎ (১৪৫৮—৫০০ =) ৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কলির ও কল্পের শেষ।

এই হিসাবে আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে মানব কল্পের

আবম্ভ ৫৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। এই সময় থেকেই স্বাযম্ভুব মনুব কাল এবং কৃত বা সত্যযুগও আরম্ভ হযেছে। খ্রীষ্টাব্দে চতুর্যুগ এই বকম—

কৃত বা সত্যযুগ ৫৯৫৮ থেকে ৩৯৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ,
ত্রেতা যুগ ৩৯৫৮ থেকে ২৪৫৮ খ্রীষ্ট পূবাব্দ,
দ্বাপব যুগ ২৪৫৮ থেকে ১৪৫৮ খ্রীষ্ট পূবাব্দ এবং
কলি যুগ ১৪৫৮ থেকে ৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

পূবাতন কল্প শেষ হবাব পবে নূতন কল্প আবম্ভ হযেছে এবং নূতন কল্পেব ধর্মযুগ এই বকম—

কৃত বা সত্যযুগ ৯৫৮ খ্রীষ্ট পূবাব্দ থেকে ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ।
ত্রেতা যুগ ১০৪২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে ত্রেতা যুগ চলছে এবং এই যুগই চলবে আবও কয়েক শো বৎসব।

এক মনুব কাল ৩৫৫ বৎসব এবং দুই বৎসবেব পনেবটি মনু সন্ধিব কথা মনে বেখে পাওয়া যায যে স্বাযম্ভুব মনু থেকে বৈবস্বত মনু পর্যন্ত কাল ২১৪৪ বৎসব। এই সময়ে ৬ জন মনু অতীত হযেছেন। খ্রীষ্টাব্দেব হিসাবে বৈবস্বত মনুব কাল আবম্ভ (৫৯৫৮—২১৪৪=) ৩৮১৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। এই সময়েব মধ্যে সমস্ত পুবাণ মিলিযে রাজাদেব যে নাম পাওয়া যায, তাঁদেব পর্যায কাল গড়ে ১৪ বা ২৫ বৎসর ধবলে মানতে হয় যে রাজা ভবতের কাল ৫৮৩৭ খ্রীষ্ট পর্বাব্দ, ধ্রুবের কাল ৫১৬১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ, বেণেব কাল ৪৯১৯ খ্রীষ্ট পূবাব্দ এবং পৃথুর কাল আবম্ভ এব কিছু পবেই। পৃথু ও প্রচেতাদেব মধ্যে ৯৮৭ বৎসবের ইতিহাস পাওয়া যায না। কোন প্রাকৃতিক প্রলয়ে বিশ্বে যে একটা বড় বকমের রদবদল হয়েছিল এবং মহাপ্লাবনে ভেসে গিয়েছিল দেশ ও মানুষ, তাব ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রচেতাদেব সমুদ্রেব জলে নিমগ্ন হয়ে হাজার বছর তপস্যার রূপকে। এর পর দক্ষ প্রজাপতি এলেন ৩৮৮৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। পৃথিবীর নানা ভাষায়

বিশ্বগ্রাসী মহাপ্লাবনের যে কাহিনী পাওয়া যায়, তার সমর্থন আছে আমাদের পুরাণে। ভূমি পর্বত ও সমুদ্রের যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, ভূতত্ত্ববিদ তা বলতে পারবেন।

দেবতা দৈত্য ও দানবরা কশ্যপের সন্তান। তাঁদের কাল ৩৮৩৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এই সময় থেকে প্রায় শত বৎসর তাঁদের বিবাদ চলেছিল। নহুষ ও যযাতির কাল যথাক্রমে ৩৭৩৯ ও ৩৭২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। দেবাসুরের সংগ্রাম ৫৭০০ থেকে ৫৮০০ বৎসরের পুরাতন ঘটনা।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ভারতে ইতিহাস রচনার জন্য সূত ও মাগধ নিযুক্ত হয়েছিল পৃথুর রাজ্যাভিষেকের পর অর্থাৎ আনুমানিক ৪৯০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। কিন্তু সে সময় থেকে কোন অব্দ চলে আসে নি বলে বহু পরবর্তী কালে আমাদের খ্রীষ্টাব্দে গণনা আরম্ভ করতে হয়েছে। যীশুখ্রীষ্টের জন্ম খুব বেশি দিনের পুরনো ঘটনা নয়। দু হাজার বছরের পুরাতন ঘটনাই খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বলতে হয় এবং নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না বলে তার আগে একটা আনুমানিক শব্দ ব্যবহার করতে হয়। এর অর্থ, সঠিক কাল জানা নেই বলে অনুমান করা হচ্ছে।

যত দূর জানা যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় এই অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। দেশবিদেশের পণ্ডিতরা মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণকে ঐতিহাসিক দলিল বলে মেনে নিয়েছেন। মেগাস্থিনিস ছিলেন পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজা সেলিউকাসের দূত। রাজা তাঁকে ভারতে চন্দ্রগুপ্তের সভায় পাঠিয়েছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে। পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের সভায় বহু দিন থেকে তিনি ইণ্ডিকা নামে যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তারই কিছু অংশ বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস বলে মনে করা হয়। ইউরোপের মেসিডোনিয়া প্রদেশের রাজা ফিলিপ গ্রীস জয় করেছিলেন। তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডার বিশ্বজয়ের জন্য প্রথমে

পারস্যের সাম্রাজ্য জয় করেন, তারপর হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি আফগানিস্তান ও ভারতে বিপাশার তীর পর্যন্ত ছোট ছোট রাজ্যগুলি জয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেনাবাহিনী আর অগ্রসব হতে না চাইলে বাধ্য হয়েই তাঁকে ফিবে যেতে হয়। তিনি ফিরেছিলেন বেলুচিস্তানের মরুভূমিব উপর দিয়ে। ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর এই অভিযানের কাল ইতিহাসে পাওয়া যায়। ৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এবং ৩২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি ফিরে যান। মরুভূমি পেরিয়ে পারস্যের একটা শহরে পৌঁছেছিলেন পরের বছর মে মাসে এবং এর পরের বছরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আলেকজাণ্ডার এ দেশে আসবাব অনেক আগে শিশুনাগ মগধে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা কবেন, তার পঞ্চম রাজা বিম্বিসার ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। এই বংশের দশজন রাজা রাজত্ব করবার পর মহাপদ্ম নন্দ নামে একজন শূদ্র মগধের সিংহাসন অধিকার কবেন। ইনি অসাধারণ বীর ছিলেন এবং উত্তর ভারতেব প্রায় সমস্ত রাজ্য জয় করে যমুনা থেকে চম্বল নদী পর্যন্ত নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। ঐতিহাসিক যুগের এইটেই প্রথম সাম্রাজ্য। তাঁর পরে এই বংশের আটজন রাজা হয় এক যোগে কিংবা অল্প সময়ের মধ্যে খুব পর পর রাজত্ব কবেন। এঁদেরই শাসন কালের শেষ দিকে আলেকজাণ্ডার এ দেশে এসে ফিরে গিয়েছিলেন।

ভারতে আলেকজাণ্ডার মাত্র দু বছর ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই পঞ্চনদের বিজিত রাজারা গ্রীকদের তাড়িয়ে পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই অভিষানের নায়ক ছিলেন নন্দবংশজাত চন্দ্রগুপ্ত। মগধ-রাজের বিরাগভাজন হয়ে তিনি পাঞ্জাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে তিনি মগধও অধিকার করেন।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরে তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন

তাঁরই সেনাপতি সেলিউকাস। ইনি পাঞ্জাব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলে চন্দ্রগুপ্তের হাতে ভীষণ ভাবে পরাজিত হয়ে কাবুল কান্দাহার ও হীরাট ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করেন। তারপরেই চন্দ্রগুপ্তের সভায় পাঠিয়েছিলেন মেগাস্থিনিসকে।

এইখান থেকেই ভারতের ইতিহাস শুরু হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে আমরা এই ইতিহাস পড়ি। এর পূর্ব্বে সমস্ত ঘটনাই অনুমান করা হয়েছে অথবা শিলালিপি মুদ্রা প্রভৃতি প্রমাণ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেকের কালও এই ভাবে পাওয়া গেছে। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেছেন যে নন্দের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল ৪১৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। আমরা তা মেনে নিয়েছি। কোন প্রতিবাদ করি নি, কোন অনুসন্ধানও হয়তো করি নি। কিন্তু আমাদের পুরাণের উপাদান থেকে আমরা যে তারিখটি পাই, তা ৪০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। কালের ব্যবধান সামান্যই। কিন্তু ভুল শুদ্ধের বিচারে ব্যবধান অপরিসীম। ৪১৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ অনুমানের কথা এবং ৪০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ প্রমাণসিদ্ধ। মহাপদ্ম নন্দ তাঁর রাজ্যাভিষেকের সময় যে নন্দাব্দের প্রচলন করেছিলেন, তা আবৃত হয়েছিল কল্যব্দ শব্দ দিয়ে। আর্যভট এই অব্দের সঙ্গে এক নক্ষত্র মহা যুগের কাল ২৭০০ বৎসর যোগ করে বিভ্রমের সৃষ্টি করেন। কল্যব্দ থেকে এই ২৭০০ বাদ দিলেই নন্দাব্দ পাওয়া যাবে আমাদের বর্তমানে প্রচলিত পঞ্জিকাতেই। এইখান থেকে আরম্ভ করে পিছিয়ে গেলেই কৃষ্ণের জন্মকাল ১৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে নির্দিষ্ট হবে। এই সময় থেকে কৃষ্ণাব্দ প্রচলিত হলে ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ হত ৪৫০০ কৃষ্ণ পূর্বাব্দে এবং ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ হত ৩৪৪০ কৃষ্ণাব্দ। এর অর্থ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর আগে।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাস রচিত হয় নি, এ কথা যাঁরা বলেন তাঁরা পুরাণ পড়েন নি। পুরাকালের সমস্ত ঘটনাকে কালের মানদণ্ডে ধরে রাখবার প্রবল ইচ্ছা না থাকলে পৌরাণিকরা যুগ, পিতৃযুগ,

ধর্মযুগ, সপ্তর্ষি যুগ, মনু মন্বন্তর কল্প প্রভৃতি বিবিধ মানদণ্ডের উদ্ভাবন ও প্রচলন করতেন না। মনুর নামে অব্দের প্রচলনের সঙ্গে নৈসর্গিক ও জ্যৌতিষিক মানও যুক্ত করে দেওয়ায় স্থূল ভাবে পৌরাণিক কাল নির্দেশ নির্ভুল হবে।

ঘটনা পঞ্জী

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীকে কালানুক্রমে সাজালে এই রকম দাঁড়াবে। -

কৃত বা সত্য যুগ

(৫৯৫৮ থেকে ৩৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ

৫৯৫৮ খ্রীঃ পূঃ কল্পারম্ভ ও স্বায়ম্ভুব মনু।

৫৯৩৪ ,, প্রিয়ব্রত, প্রথম দক্ষ ও কর্দম ঋষি

৫৯০ ,, মহাদেব শিব, সাংখ্য দর্শন প্রণেতা কপিল এবং প্রথম দক্ষের যজ্ঞ

৫৮৬১ ,, ঋষভ বা প্রথম জৈন তীর্থংকর আদিনাথ

৫৮৩৭ ,, রাজা ভরত, যাঁর নামে ভারতবর্ষ

৫১৮৫ ,, উত্তানপাদ

৫১৬১ ,, ধ্রুব

৪৯৯১ ,, চাক্ষুষ মনু

৪৯১১ ,, বেণ হত্যা

৪৮৯৫ ,, পৃথুর রাজসভায় ঐতিহাসিক নিয়োগ

৪৮৭০ থেকে ৩৯৫৮ খ্রীঃ পূঃ বা সত্য যুগের শেষ—মহাপ্লাবনের পর অন্ধকার যুগ

ত্রেতা যুগ

(৩৯৫৮ থেকে ২৪৫৮ খ্রীঃ পূঃ)

৩৮৮৯ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় দক্ষ

৩৮৩৯ থেকে ৩৭৫৮ খ্রীঃ পূঃ দেবাসুরের যুদ্ধ

৩৭২১ খ্রীঃ পূঃ যযাতি

৩৬০৮ ,, কুবলয়াশ্ব ও মরুস্থলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

৩৪৫৮ ,, মান্ধাতা

৩৩৮৬ ,, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা

৩১৭১ ,, হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠা

৩১০১ ,, পঞ্জিকার মতে কল্যব্দ আরম্ভ

৩০৬৪ ,, হরিশ্চন্দ্র ও বিশ্বামিত্র

২৯৯২ ,, কার্তবীর্য অর্জুন ও পরশুরাম

২৮৩৮ ,, সগর

২৭৪১ ,, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন

২৪৫৮ ,, মূলক

দ্বাপর যুগ

(২৪৫৮ থেকে ১৪৫৮ খ্রীঃ পূঃ)

২২২৫ খ্রীঃ পূঃ বিদর্ভ

২১২৪ ,, রাম

১৮১৭ ,, কুরু

১৪৮৭ ,, শান্তনু

১৪৫৮ ,, কৃষ্ণের জন্ম

কলি যুগ

(১৪৫৮ থেকে ৯৫৮ খ্রীঃ পূঃ)

১৪১৬ খ্রীঃ পূঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও পরীক্ষিতের জন্ম

দ্বিতীয় সত্য যুগ

(৯৫৮ খ্রীঃ পূঃ থেকে ১০৪১ খ্রীঃ)

৮৮১ থেকে ৭৩৩ খ্রী পূঃ প্রদ্যোত বংশ

৭৩৩ ,, ৪০৩ ,, শিশুনাগ বংশ

৬১২ খ্রীঃ পূঃ বিম্বিসার

৫৭২ ,, অজাত শত্রু

৪০৩ ,, মহাপদ্ম নন্দ

৪০১ ,, নন্দের রাজ্যাভিষেক

৩২০ থেকে ১৭৮ খ্রীঃ পূঃ মৌর্যবংশ

৩১৫ খ্রীঃ পূঃ চন্দ্রগুপ্ত

২৭১ ,, অশোকবর্ধন

১৭৮ থেকে ৬৬ খ্রীঃ পূঃ পুষ্পমিত্র ও শুঙ্গ বংশ

৬৬ ,, ২১ ,, বসুদেব ও কণ্ব বংশ

২১ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৩০৭ খ্রীঃ অন্ধ্র বংশ

৩০৭ থেকে ৩৯৬ খ্রীঃ অন্ধ্র ভৃত্য বংশ

৪০৩ থেকে ৪৩৫ ,, অন্ধ্র বংশ

১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ত্রেতা যুগ চলছে।

খুবই আশ্চর্যের কথা যে গৌতম বুদ্ধ এবং বর্ধমান মহাবীর সম্বন্ধে কোন মূল্যবান কথা পুরাণে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধদের সঙ্গে কল্কি অবতারের যুদ্ধের কথা বিস্তারিত ভাবে আছে কল্কি পুরাণে। কিন্তু সেখানেও বুদ্ধের বা মহাবীরের কোন কথা নেই। বিম্বিসার বা অজাত শত্রুর প্রসঙ্গেও তাঁদের কথা লেখা হয় নি। অথচ বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলে কল্পনা করা হয়।

ভবিষ্য রাজবংশের প্রসঙ্গে গুপ্ত রাজাদের নামের উল্লেখ মাত্র আছে। কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ নেই। তাই অনুমান করা যেতে পারে যে মূল পুরাণগুলি এই সময়ের পূর্বে রচিত হয়েছিল এবং পরবর্তী কালে রাজাদের নাম ও রাজত্বকাল সংক্ষেপে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

এর পর বলা বাহুল্য যে পুরাণ কিংবদন্তী বা mythology নয়, পুরাণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বা history.

পুরাণে ভৌগোলিক বিবরণ

রাজা ভরতের নামে ভারতবর্ষ এবং পৃথুর নামে পৃথিবী, এ কথা আমরা জেনেছি। কিন্তু এই ভারতবর্ষ বা পৃথিবীর সম্বন্ধে আর কোন কথা জানা যায় নি। দেবতা ও দৈত্যদের কথায় স্বর্গের কথা এসে পড়বে। স্বর্গের অধিকার নিয়ে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই ছিল। পাতালে নির্বাসিত হত দৈত্যরা। গন্ধর্ব ও অপ্সরারা অন্তরিক্ষে বিচরণ করত। পরবর্তীকালে স্বর্গ মৃত্যুর পর সুখ ভোগের স্থান বলে নির্দিষ্ট হয়েছে এবং পাতাল পরিণত হয়েছে ভূ-বিবরে। সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না হলে স্বর্গ অন্তরিক্ষ ও পাতালের অবস্থানও বোঝা যাবে না। আর সেকালের পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু না জেনে ইতিহাসের কথাও বোঝার অসুবিধা হবে। তাই এবারে পুবাণে ভৌগোলিক বিবরণ আছে কিনা, তা বিচার করে দেখা যাক।

বিষ্ণুপুবাণের দ্বিতীয়াংশের প্রথম থেকে পঞ্চম অধ্যায়ে সপ্ত দ্বীপ সপ্ত পাতাল ও ভারতবর্ষের যে বর্ণনা আছে, তা সংক্ষেপে এই রকম।

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের মধ্যে তিনজন যোগ পরায়ণ হয়েছিলেন বলে প্রিয়ব্রত তাঁর বাকি সাত পুত্রকে সপ্তদ্বীপ বিভাগ করে দেন। অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপ, মেধাতিথিকে প্লক্ষ দ্বীপ, বপুষ্মানকে শাল্মলী দ্বীপ, জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপ, দ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, ভব্যকে শাকদ্বীপ এবং সবলকে পুষ্কর দ্বীপ দিয়েছিলেন। জম্বু দ্বীপের রাজা অগ্নীধ্রও তাঁর রাজ্য পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেন। নাভিকে দক্ষিণ হিমবর্ষ বা হিমালয়ের দক্ষিণের বর্ষ দান করেন, কিম্পুরুষকে দেন হেমকুট বর্ষ, হরিকে নৈষধ বর্ষ, ইলাবৃতকে মেরুর চতুর্দিকবর্তী বর্ষ, রম্যকে নীলাচলের আশ্রিত বর্ষ, হিরণ্বানকে

তার উত্তরে শ্বেতবর্ষ, কুরুকে শৃঙ্গবান পর্বতের উত্তরস্থ বর্ষ, ভদ্রাশ্বকে মেরুর পূর্বভাগের বর্ষ এবং কেতুমালকে গন্ধমাদন বর্ষ দান করেন।

জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত সমুদ্রে সমভাবে পরিবেষ্টিত। পৌরাণিক বর্ণনা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে দ্বীপ ও সমুদ্রের অর্থ সেকালে অন্য রকম ছিল। অর্থাৎ দুধারে জল থাকলেও দ্বীপ ও বড় নদীকেও সমুদ্র বলা হত। যে ভূখণ্ডের দুই প্রান্তে বড় নদী বা সমুদ্র আছে, তারই নাম দ্বীপ এবং কোন ভূখণ্ডকে দ্বীপ বলার জন্য নদী ও সমুদ্রে প্রভেদ করা হয় নি। নদীতে স্বাদু জল থাকে এবং সমুদ্রের জল লবণাক্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দধি দুগ্ধ ঘৃত ইক্ষুরস বা সুরার নদী বা সমুদ্র হতে পারে না। নদী বা সাগরের নামের বদলে এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়। জম্বু দ্বীপই এই সপ্ত দ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং জম্বু দ্বীপের মাঝখানে মেরু পর্বত। মেরু পর্বত এ যুগের সুমেরু বা কুমেরু নয়, এই মেরু এশিয়া মহাদেশের কোন্ পর্বত তা যুক্তি দিয়ে নির্ণয় করতে হবে।

বিষ্ণুপুরাণে কনক পর্বত মেরুর বর্ণনা আছে। শৈলেশ মেরু যেন পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকা। তার দক্ষিণে হিমবান, হেমকূট ও নিষধ এবং উত্তরে নীল শ্বেত ও শৃঙ্গী বর্ষ পর্বত। মেরুর দক্ষিণে প্রথম বর্ষ ভারত, তারপর কিম্পুরুষ বর্ষ ও হরি বর্ষ। উত্তরে রম্যক, হিরন্ময় ও উত্তর কুরু বর্ষ। ইলাবৃত বর্ষ মেরুর চতুর্দিকে বিস্তৃত। তাকে বেষ্টন করে আছে চারটি পর্বত—পূর্বে মন্দর, পশ্চিমে বিপুল, উত্তরে সুপার্শ্ব ও দক্ষিণে গন্ধমাদন। এই সব পর্বতে পিপ্পল বট কদম্ব ও জম্বু বৃক্ষ আছে। জম্বু বৃক্ষ বা জাম গাছ থেকেই জম্বু দ্বীপ নাম হয়েছে। জম্বু ফলের রসেই জম্বু নদীর উৎপত্তি হয়েছে গন্ধমাদন পর্বতে। এই নদীর জল পানে জরা ও ইন্দ্রিয় ক্ষয় হয় না, মন হয় স্বচ্ছ। মেরুর পূর্বে ভদ্রাশ্ব ও পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ। মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ।

সুমেরুর পূর্বে চৈত্ররথ বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ বন, উত্তরে নন্দন বন ও দক্ষিণে গন্ধমাদন বন। অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ ও মানস এই চারিটি সরোবর মেরুর চতুর্দিকে অবস্থিত। মেরুর উপরে ব্রহ্মার পুরী, তার চারি দিকে ও চারি কোণে ইন্দ্রাদি লোকপালদের পুরী। বিষ্ণুপাদোৎপন্না গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করে অন্তরিক্ষ থেকে ব্রহ্মপুরীতে পতিত হয়েছেন, তারপব চতুর্দিকে বিভক্ত হয়েছেন। এই চারি ধারার নাম সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা। সীতা পূর্ববাহিনী হয়ে ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে, দক্ষিণবাহিনী অলকনন্দা ভারতবর্ষে এসে সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। চক্ষু পশ্চিম দিকের পর্বত অতিক্রম করে কেতুমাল বর্ষের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে এবং ভদ্রা উত্তব গিরি ও উত্তর কুরু অতিক্রম করে উত্তব সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

মাল্যবান ও গন্ধমাদন পর্বত উত্তর দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। মেরু তাদের মধ্যে কর্ণিকার আকারে অবস্থিত। মর্যাদা শৈলেব মধ্যবর্তী ভারতবর্ষ, কেতুমালবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ ও কুরুবর্ষ এই পদ্মের পত্র স্বরূপ। জঠর ও দেবকুট মর্যাদা পর্বত, তারা উত্তর দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। গন্ধমাদন ও কৈলাস নামের আর দুটি মর্যাদা পর্বত দুটি সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে অবস্থিত। মেরুর পশ্চিমে নিষধ ও পারিপাত্র নামে আর দুটি মর্যাদা পর্বত পূর্ব দিকের পর্বতের ন্যায় অবস্থিত। মেরুর উত্তর দিকে ত্রিশৃঙ্গ ও জারুধি নামের দুই বর্ষ পর্বত পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করেছে। মেরুর চতুর্দিকে কেশর পর্বতের মধ্যে মনোরম সন্ধি স্থলে সুরম্য কানন ও পুরী আছে। সিদ্ধ ও চারণগণ সেখানে বাস করেন। এই সকল স্থানেই কিন্নরদের দ্বারা সেবিত লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি ও সূর্যাদি দেবগণের আয়তন বর্ষ আছে। গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, দৈত্য ও দানবেরা এই সব পর্বত সন্ধিতে অহর্নিশ ক্রীড়া করেন। এই স্থান ভৌম বা পৃথিবীর স্বর্গ বলে পরিগণিত। এখানে

ধার্মিকদেরই বাস। পাপীরা শত জন্মেও এখানে আসতে পারে না।

বায়ু ও অন্যান্য পুরাণেও মেরু পর্বতের বর্ণনা আছে। এই সব বর্ণনা থেকে স্পষ্টই জানা যায় যে জম্বু দ্বীপের মাঝখানে মেরু পর্বতই ছিল শ্রেষ্ঠ স্থান এবং দেবতা নামের কোন জাতি এখানে বাস করতেন। লোকপাল নামে পরিচিত দেবতাদের পুরী ছিল এই পর্বতের চারি ধার ঘিরে।

মেরু পর্বতের অবস্থান সযত্নে লক্ষ্য করা দরকার। বলা হয়েছে যে এর দক্ষিণে হিমবান হেমকূট ও নিষধ পর্বত ভারতের সীমায় বর্ষ পর্বত। মেরুর দক্ষিণে প্রথম বষ ভারত। তারপর কিম্পুরুষ বষ ও হরিবর্ষ। ইলাবৃত বর্ষ মেরুর চতুর্দিকে বিস্তৃত। তাকে যে চারটি পর্বত বেষ্টন করে আছে তার মধ্যে দক্ষিণে গন্ধমাদন পর্বত। এক দিকে মানস সরোবর আছে। গঙ্গার যে ধারা দক্ষিণে প্রবাহিত তার নাম অলকনন্দা।

এর পর বিষ্ণুপুরাণে ভারতবর্ষের বর্ণনা আছে। যে ভূখণ্ড সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে তার নাম ভারতবর্ষ। এর বিস্তার নয় হাজার যোজন। এখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র নামে সাতটি কুল পর্বত আছে। এখান থেকেই স্বর্গ মোক্ষ অন্তরিক্ষ ও পাতালে যাওয়া যায়। ভারতবর্ষের নটি ভাগ আছে। তাদের নাম ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম, গন্ধর্ব, বারুণ ও একটি সমুদ্র পরিবৃত দ্বীপ। এই দ্বীপ উত্তর-দক্ষিণে এক হাজার যোজন দীর্ঘ। এর পূর্ব দিকে কিরাত, পশ্চিমে যবন ও মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদের বাস।

শতদ্রু ও চন্দ্রভাগাদি নদী হিমালয়ের মূল দেশ থেকে, বেদ-স্মৃতি প্রভৃতি কতগুলি নদী পারিপাত্র পর্বত থেকে, নর্মদা ও সুরসাদি নদী বিন্ধ্যাচল থেকে, তাপী পয়োষ্ণী নির্বিন্ধ্যা প্রভৃতি নদী ঋক্ষ পর্বত থেকে, গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি নদী সহ্য পর্বত থেকে,

কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী প্রভৃতি নদী মলয় পর্বত থেকে, ত্রিযামা আচার্য কুল্যাদি নদী মহেন্দ্র পর্বত থেকে এবং ঋষিকুল্যা ও কুমারী প্রভৃতি নদী শুক্তিমান পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এদের বহু শাখা নদী ও উপনদী আছে। কুরু পাঞ্চালবাসী, মধ্যদেশ ও পূর্বদেশবাসী, কামরূপবাসী, পুণ্ড্র কলিঙ্গ মগধ ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসী, অপরান্ত সৌবাষ্ট্র শূব আভীব অর্বুদ কারূষ মালব ও পারিপাত্রবাসী, সৌবীর সৈন্ধব হূণ শাল্ব ও শাকলবাসী, মদ্র আরাম অম্বষ্ঠ ও পারসীকরা এই সমস্ত নদীব তীরে বাস করে।

এর পর আছে বাকি ছয়টি দ্বীপের বর্ণনা। তারপর সপ্ত পাতালের বিবরণ। অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, সুতল ও সপ্ত পাতাল নামে পাতালের সংখ্যা সাতটি। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে এই সপ্ত পাতালের ভিন্ন নাম পাওয়া যায়। এই সব নাম অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। অতলে ময়পুত্র মহামায়ের বাস, বিতলে হাটকেশ্বর হর, সুতলে বৈরোচন বলি, তলাতলে ত্রিপুরাধিপতি ময় এবং মহাতল রসাতল ও পাতালে বাস যথাক্রমে সর্প দানব ও নাগজাতির। দেবর্ষি নারদ এই সপ্ত পাতাল ভ্রমণ করে এসে দেবতাদের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা বিষ্ণুপুরাণে আছে। তিনি বলেছিলেন পাতাল স্বর্গেব চেয়েও রমণীয়। সেখানে অনেক মণি আছে, নাগেরা সেই মণি ধারণ করে। দৈত্য ও দানব কন্যাদের দেখে বিবাগী ব্যক্তিরও আনন্দ হয়। সেখানে সূর্যের রশ্মিব প্রভা আছে, নেই উত্তাপ। চন্দ্রের কিরণে আলো আছে, কিন্তু শীত নেই। পান ভোজনে আনন্দিত থেকে কালের গতি বোঝা যায় না। নদী বন সরোবর ও কোকিলের আলাপের মতো অনেক মনোজ্ঞ আকর্ষণ আছে। রমণীয় ভূষণ, সুগন্ধ অনুলেপন, বীণা বেণু মৃদঙ্গ ও তূর্যের স্বর, পাতালবাসীরা এই সব ভোগ করে।

এই সমস্ত পাতালের অধো ভাগে বিষ্ণুর তামসী তনু শেষ আছেন। তিনি সহস্র শির। জগতের হিতের জন্য তিনি সহস্র ফণা

বিস্তার করে মুকুটের ন্যায় এই ক্ষিতি মণ্ডলকে মাথায় ধারণ করে আছেন। তাঁর গুণের অন্ত জানা যায় না বলে এই নাগশ্রেষ্ঠ শেষ অনন্ত নামে খ্যাত।

বায়ু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি নানা পুরাণে এই রকমের বর্ণনা আছে। এই সব বর্ণনা বর্তমান কালের মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে জম্বু দ্বীপ ও বর্ষ বিভাগ অনুমান করা অসম্ভব কাজ নয়। জম্বু দ্বীপ কেন বলা হত, তাও অনুমান করা যায়। বিষ্ণু ও অন্যান্য পুরাণেব মতে জম্বু বৃক্ষ থেকেই জম্বুদ্বীপ নাম। জম্বু বৃক্ষ একাদশ শত যোজন উচ্চ পর্বতের উপরে ধ্বজার ন্যায় নির্মিত হয়ে আছে। তার মহাগজ পরিমিত ফলগুলি পর্বতের পৃষ্ঠে পড়ে চূর্ণ হয়ে যায় এবং তাদের রস থেকেই উৎপন্ন হয়েছে জম্বু নদী। এই নদী গন্ধমাদন পর্বত থেকে নির্গত হয়েছে এবং তার জলে কোন দুর্গন্ধ নেই বলে সেখানকার অধিবাসীরা এই জল পান করে। এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে জম্বু বৃক্ষ মানে জাম গাছ নয়। পর্বতের তুষারাবৃত চূড়াকেই জম্বু বৃক্ষ এবং বরফের চাপকেই বোধহয় জম্বু ফল বলা হয়েছে। তুষার ঝড়ে এই বরফেব চাপ ভেঙে পড়ে যে তুষার নদী বা glacier-এর জন্ম, তাই জম্বু নদী রূপে প্রবাহিত হয়েছে। বর্তমানে কাশ্মীরের দক্ষিণে জম্মু প্রদেশ নামটি লক্ষণীয়। জম্বুর সঙ্গে জম্মুর কোন সম্পর্ক থাকলে কারাকোরম পর্বতকেই গন্ধমাদন বলতে হয়। কারাকোরমেই বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গটি সেকালে জম্বু বৃক্ষ বলে অভিহিত হয়েছিল কিনা কে জানে! গন্ধমাদন হিন্দুকুশ পর্বতের নামও হতে পারে। এই পর্বতেরই পশ্চিমাংশে কেতুমাল বর্ষ।

সেকালের বর্ষগুলির অবস্থান সঠিক ভাবে বুঝতে হলে মেরু পর্বতকেই সর্ব প্রথমে চিনে বার করতে হবে। মেরুকে কর্ণিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কর্ণিকা শব্দে বীজ কোষ বোঝায়, অর্থাৎ পর্বতে বেষ্টিত কোন মালভূমি হওয়া অসম্ভব নয়। এই মেরু পর্বত ইলাবৃত বর্ষের মাঝখানে। ভারতবর্ষ তার দক্ষিণে। পূর্বে ভদ্রাশ্ব

বর্ষ, পশ্চিমে কেতুমাল ও উত্তরে কুরুবর্ষ। এই চারটি বর্ষ বা দেশ ইলাবৃতবর্ষকে ঘিরে রেখেছে। কিম্পুরুষবর্ষ ও হরিবর্ষও দক্ষিণে, উত্তরে রম্যক ও হিরণ্ময়বর্ষ। বর্ণনা পড়ে মনে হয় যে এই চারটি বর্ষ ইলাবৃত বর্ষেব সংলগ্ন ছিল না। অনেকে মনে করেন যে কিম্পুরুষ বর্ষ ছিল বর্তমান তিব্বতের নাম। হবিবর্ষ ভারতবর্ষের পশ্চিমে পারস্য বা আরবকে বলা হত মনে হয়। কেতুমালবর্ষেব বিস্তৃতি কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত হতে পারে। ভদ্রাশ্ববর্ষ যেমন চীন, তেমনি কুরুবর্ষ রাশিয়ার সাইবেরিয়া প্রদেশ। রম্যকবর্ষ ও হিরণ্ময়বর্ষের অবস্থানও হয়তো সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব।

বর্ষের অবস্থান নির্ণয়ে বর্ষ পর্বতের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। দুই বর্ষের মাঝে যে পর্বত, তারই নাম বর্ষ পর্বত। হিন্দুকুশকে গন্ধমাদন পর্বত বললে বুঝতে হবে যে তার পূর্বে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ। নিষধ পর্বত যদি সুলেমান পর্বত হয়, তবে হরিবর্ষ তার পশ্চিমে বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানে। হিমবান বা হিমালয় ভারতবর্ষের উত্তরে এবং কিম্পুরুষবর্ষে হেমকূট পর্বত। শৃঙ্গবান পর্বতের উত্তরে কুরুবর্ষ। আলতাই পর্বতকেই শৃঙ্গবান পর্বত বলে মনে হয়। অনেকে অবশ্য এই পর্বতকেই মেরু পর্বত বলে মনে করেন। কিন্তু আলতাই মেরু পর্বত হলে ভারতবর্ষ তার দক্ষিণে হয় না এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তার যোগাযোগ এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবার সুযোগ পেত না।

সব দিক বিবেচনা করে মনে হয় যে কারাকোরাম ও হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরে পামির অঞ্চলেই ছিল মেরু পর্বত। পামির মালভূমিতে একটি পর্বতের জট আছে। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে টিয়েনশান পাহাড় এসেছে। দক্ষিণে এক দিকে হিন্দুকুশ, অন্য দিকে কারাকোরাম। তিব্বতের উত্তরে আল্‌টিন টাগ ও কুনলুন শানও পশ্চিমে পামিরে এসে ঠেকেছে। মেরুকে কনক পর্বত বলা হয়। পর্বতের উচ্চতা যোজনে বলা হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায় যে সেকালে পর্বতের উচ্চতা

মাপা হত পর্বতারোহণের পথের দৈর্ঘ্য দিয়ে। তাই সে আলোচনার সার্থকতা নেই। পামিরের সন্নিকটে কোন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যে দেবতা জাতিব বাস ছিল, তা কতকটা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সেখান থেকে ভারতবর্ষে যাতায়াতের পথ ছিল সুগম। দেবতারা সহজেই ভাবতবর্ষে আসতেন এবং ভারতবর্ষের অধিবাসীরাও যেতেন মেরু পর্বতে। মেরু পর্বতই ছিল পুরাকালের স্বর্গ।

এই পথ রুদ্ধ হবার কথাও পুরাণে আছে। মৎস্য পুবাণে আছে, হীনচেতা ইন্দ্র যখন থেকে বজ্র দিয়ে স্বর্গেব পথ রুদ্ধ করেন, তখন থেকে মানুষের স্বর্গেব মার্গ নিবারিত হয়েছে॥ মৎস্য। ১৯১।১০॥ স্বর্গের রাজা ইন্দ্র কেন এই পথ বন্ধ কবেন, তারও একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ থেকে প্রায়ই শত্রুরা আক্রমণ করত তাঁর রাজ্য, খুবই বিব্রত থাকতে হত তাঁকে। তাই তিনি সামরিক কারণেই তাঁর বজ্র অর্থাৎ বারুদে নির্মিত ডিনামাইট জাতীয় কোন বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার করে পাহাড় ধ্বসিয়ে এই পথ বন্ধ করেন। বর্তমানে আফগানিস্থানে যাতায়াতের জন্য বোলন, গোমল ও খাইবার নামে তিনটি গিরিপথ আছে। কাশ্মীর থেকে লাদাখ হয়ে তিব্বতে প্রবেশ করা যায় জোজিলা পাসের মধ্য দিয়ে। এই পথ এখনও ব্যবহাব যোগ্য আছে দেখে মনে হয় যে গিলগিট হয়ে কোন পথ সরাসরি মেরু পর্বতে পৌছত। তার নাম ছিল দেব যান, অর্থাৎ দেবতাদের পথ। এই পথ বন্ধ হয়ে যাবার পর ভারতবর্ষ থেকে বদ্রীনাথ ও মানসসরোবর হয়ে স্বর্গে যেতে হত! পাণ্ডবেরা এই পথে স্বর্গে যাত্রা করেছিলেন। স্বর্গ তখন তীর্থরূপে পরিগণিত হত। পিতৃপুরুষেরা এই পথে স্বর্গে যেতেন বলে এই পথের নাম হয় পিতৃ যান। জোজিলা পাসের পথ বোধহয় তখনও আবিষ্কৃত হয় নি এবং খাইবার প্রভৃতি পাস দিয়ে গেলে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হত।

বিভিন্ন পুরাণে এই অঞ্চলের বহু গিরি নদীর নাম পাওয়া যায়।

আধুনিক নামের সঙ্গে মিলিয়ে হয়তো বহু চিত্তাকর্ষক তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। এ রকমের কোন চেষ্টা এ যাবৎ হয়েছে কিনা জানা নেই। কিন্তু চেষ্টা করলে গবেষককে নিরাশ হতে হবে না।

জম্বু দ্বীপের পর অন্য ছয়টি দ্বীপের সম্বন্ধে ভৌগোলিক তথ্য জানার প্রয়োজন আমাদের নেই। জম্বু দ্বীপের কোনও বর্ষের সম্বন্ধেও প্রয়োজন বোধে আলোচনা করা যাবে।

পুরাণে ভারতবর্ষের বর্ণনায় নটি ভাগের নাম আছে। এই ভাগগুলির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধু একটি কথা স্পষ্ট। তা হল ভারতবর্ষে সমুদ্র বেষ্টিত একটি দ্বীপ আছে। তা উত্তর-দক্ষিণে এক হাজার যোজন বিস্তৃত। এই দ্বীপ বর্তমানের শ্রীলঙ্কা নিশ্চয়ই নয়। বরং বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে বর্তমান ভারতের দক্ষিণাংশ সমুদ্র দিয়ে বিচ্ছিন্ন ছিল, এই ধারণাই হয়। অনেকে মনে করেন যে কোন সময়ে হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মাঝেও সমুদ্র ছিল এবং বিন্ধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মাঝেও কতগুলি সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ ছিল। এ কত কালের পুরাতন কথা এবং পুরাণে এর প্রমাণ আছে কিনা জানা নেই। ভূতত্ত্ববিদ এর অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র অগ্নীধ্র ভারতবষের রাজা হয়েছিলেন। তিনি মনুর পুত্র বলে তাঁদের দেশের অধিবাসীদের নাম মানব বা মানুষ হয়। মানুষ শব্দটি সে সময়ে জাতি বাচক ছিল। দেবতা জাতির মনু, তাঁরই বংশধর মানুষ। তারা ভারতবর্ষের অধিবাসী। পুরাণের কথায়, ভারতবর্ষ থেকে স্বর্গ, মোক্ষ, অন্তরিক্ষ ও পাতালে যাওয়া যায়। স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষের মেরু পর্বত, পাতাল সমুদ্র তীরবর্তী দক্ষিণের দেশ। অন্তরিক্ষ যে হিমালয়ে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এইখানে বাস করতেন সিদ্ধ গন্ধর্ব ও অপ্সরা। অন্তরিক্ষই মোক্ষ কিনা বা হিমালয়ের অন্য কোন অংশের নাম, তা জানা যায় না। মনে হয়, হিমালয়ে অবস্থিত কোন পুণ্য ভূমিকে মোক্ষ বলা হত।

পিতৃগণ সেখানে তপস্যা ও দেহত্যাগ করে তাকে মোক্ষে পরিণত করেছেন। অন্তরিক্ষ বলতে মধ্যবর্তী দেশ বোঝায়। স্বর্গ থেকে ভারতে আসার পথে মানুষের পিতৃপুরুষ যে অন্তরিক্ষে বাস করেছিলেন, তার অপর নাম পিতৃলোক। মনে হয় যে বর্তমান কাশ্মীর এই পিতৃলোক। বৈদিক ভূগোলে আরও তিনটি নাম পাওয়া যায়। তা হল ইলা সবস্বতী ও ভারতী। মনে হয়, ইলাবৃত বর্ষ, কাশ্মীর ও উত্তর ভারত এই তিন নামেও পরিচিত ছিল। পৃথুর রাজ্য পৃথিবী ছিল বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে উত্তর ভারত। এই রাজ্যের অন্য নাম মর্ত্য। সাধারণ ভাবে দক্ষিণের দেশকেই পাতাল বলা হত। পাতাল নামে পরিচিত দেশের বিভাগ ছিল সাতটি। উত্তবের অংশের নাম অতল এবং পাতাল সব দক্ষিণের অংশ। পদ্মপুরাণের মতে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের নাম ছিল সুতল। পাতালে সঙ্কর্ষণ অগ্নির কথা আছে বিষ্ণুপুরাণে। আগ্নেয় গিবিই যে সঙ্কর্ষণাগ্নি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই বর্তমান যবদ্বীপকেই পাতাল বলা যায়। কিন্তু কপিল মুনি পাতালবাসী ছিলেন এবং তাঁব আশ্রম সাগর দ্বীপে ছিল বলে আমরা সাগর দ্বীপ অঞ্চলকেই পাতাল ভাবি। অন্য চারটি পাতালের অবস্থান অনুমান সাপেক্ষ।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস প্রসঙ্গে জম্বু দ্বীপ ভিন্ন অন্য একটি দ্বীপ সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। কয়েকটি পুরাণে পাওয়া যায় যে কৃষ্ণের কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পুত্র শাম্ব শাক দ্বীপ থেকে সূর্যের পূজারী এনেছিলেন। এঁরা মগ নামে এক জাতি এবং ব্রাহ্মণের কাজ করতেন। সূর্য পূজার জন্য শাম্ব তাঁদের ভারতবর্ষে এনেছিলেন। অনুমান করলে অসঙ্গত হবে না যে এই শাক দ্বীপ, শক জাতি, প্রাচীন সীদিয়া বা Scythians, শকস্থান বা বর্তমান সিস্তান নামের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। এই অঞ্চলকে শাক দ্বীপ ভাবলে যুক্তিসঙ্গত হবে বলেই মনে করি। কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে রাশিয়ার শহর বাকুতে হিন্দু মন্দিরের বিদ্যমানতার কথা শোনা যায়।

পৌরাণিক ঘটনা পরম্পরায় সন্দেহ হয় যে বিষ্ণু উপাধিধারী পরম শক্তিশালী কোন রাজা বা সম্রাট এই কাস্পিয়ান সাগরের তীরেই রাজত্ব করতেন। তিনি শাক দ্বীপের অধিপতি, না জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত হরিবর্ষের বা অন্য কোন বর্ষের, তা বলা সম্ভব নয়। তবে বিষ্ণুরা যে ইলাবৃতবর্ষের অধিপতি ইন্দ্রদের বিপদে আপদে সাহায্য করতেন, তা পুরাণ সম্মত। দেবতারা তাঁদের জ্ঞাতি দৈত্য দানবদের হাতে পরাজিত ও নির্যাতিত হলেই বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করতেন। কিম্পুরুষবর্ষের অধিপতি রুদ্রদের বাস ছিল কৈলাস পর্বত অঞ্চলে। ইন্দ্র সামরিক প্রয়োজনে ভারতবর্ষ থেকে স্বর্গে যাবার পথ বন্ধ করে দেবার পর রুদ্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষ থেকে যাঁরা তীর্থ করতে যেতেন ইলাবৃতবর্ষের মেরু পর্বতে, তাঁদের নূতন পথ হয়েছিল মানসসরোবর ও কৈলাস অতিক্রম করে। এই সময়েই ভারতবাসী রুদ্রের আধিপত্যের কথা জানতে পারে এবং কালক্রমে এই আধিপত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়। দক্ষ যজ্ঞের ঘটনাই এই মতের সমর্থক। যথাস্থানে এই নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

শাক দ্বীপের মতো কুশ দ্বীপের অবস্থানও অনেকে অনুমান করেছেন। তাঁদের মতে আরব ও আফ্রিকার ইথিওপিয়া অঞ্চলের নামই ছিল কুশদ্বীপ। এই ভাবে অন্য দ্বীপগুলির অবস্থানও হয়তো অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু ভারতের ইতিহাস রচনায় তার প্রয়োজন হয়তো নেই। ইতিহাসের প্রয়োজনে শুধু এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে পুরাকালে ইলাবৃতবর্ষের যে অংশ স্বর্গ নামে তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল, তা বর্তমান রাশিয়ার তাজিকিস্তান অর্থাৎ Tadzhikistan বা কিরগিজিয়া অঞ্চলের কোন পার্বত্য শহর। যে শৈলশিখরে ইন্দ্রাদি লোকপালদের আবাস বা পুরী ছিল, তারই নাম মেরু পর্বত। এটি কোন পর্বতশ্রেণী নয়, এটি হয়তো শহরের নাম ছিল। শৈত্যাধিক্য বা জলাভাবের জন্য দেবতারা এই পার্বত্য

নিবাস ত্যাগ করে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। একালের ভৌগোলিক বা ভূতত্ত্ববিদ চেষ্টা করলে সেই প্রাচীন শৈলাবাসটি যে খুঁজে বার করতে পারবেন, তাতে সন্দেহ নেই। অনেক প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন তো খুঁজে বার করা সম্ভব হচ্ছে। দেবতাদের প্রাচীন নিবাস মেরু পর্বতই বা কেন অনাবিষ্কৃত থাকবে!

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর

(৫৯৫৮—৫৫৯৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)

মনু ও তাঁর কন্যা বংশ

কর্দম, কপিল ও সাংখ্যদর্শন, প্রিয়ব্রত, দক্ষযজ্ঞ, ঋষভ ও ভরত

কল্পের আদি থেকেই মন্বন্তরের আরম্ভ। এক মনুর কাল ৭১ যুগ এবং এই যুগ ৫ বৎসরের। এই হিসাবে ৭১ যুগের এক মনুর কাল ৩৫৫ বৎসর। মনু সন্ধি ২ বৎসরের এবং প্রারম্ভে একটি সন্ধি ধরে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কাল ৩৫৯ বৎসর। এই হিসাব কাল্পনিক এবং ইতিহাস রক্ষাব জন্যই যে ৫০০০ বৎসরের কল্পকে এই ভাবে ভাগ করা হয়েছে, তা উপক্রমণিকায় আলোচিত হয়েছে।

৫৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকেই ইতিহাসের আরম্ভ। এর আগের কথা যা পাওয়া যায়, তার নাম ছিল পুরাণ। জগতের আদিম অবস্থা থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টির বিবরণ এই পুরাণের অন্তর্গত। পুরাণকার এই সব কথা পুরাকালের ঋষিদের নিকটে শুনে লিখেছেন বলে তার নাম পুরাণ হয়েছিল। যে ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শোনা, তাকে সেকালেও ইতিহাস বলা হত। সেকালের ইতিহাস একালে পুরাণের অন্তর্গত হয়েছে। কিন্তু পুরাণ থেকে ইতিহাসের উপাদান সহজেই উদ্ধার করা যায়।

সৃষ্টির বিবরণ যে পুরাণ রচয়িতারা শুনে লিখেছেন, তা নিজেরাই স্বীকার করেছেন। বিষ্ণু পুরাণে পরাশর মৈত্রেয়কে বলছেন, ঋষিরা পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকটে বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য জানতে চেয়েছিলেন। ব্রহ্মা যা বলেছিলেন, ঋষিরা তা নর্মদাতটে রাজা পুরুকুৎসকে বলেছিলেন। পুরুকুৎস বলেছিলেন সারস্বতকে, আর আমি শুনেছি সারস্বতের নিকটে।

প্রলয় কালে দিবারাত্রি আকাশ ভূমি আলো অন্ধকার বা অন্য কিছুই ছিল না। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অজ্ঞেয় একমাত্র প্রকৃতি পুরুষ ও ব্রহ্ম বর্তমান ছিলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ বিষ্ণুর স্বরূপ থেকে পৃথক। কাল নামে বিষ্ণুর অপর এক রূপের দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টি কালে পরস্পর সংযুক্ত ও প্রলয় কালে বিযুক্ত হন। তখন এই জগৎকে একটি সমুদ্রে পরিণত করে পরমেশ্বর নাগপর্যঙ্ক শয়নে শয়ন করেন। তারপর জাগ্রত হয়ে ব্রহ্ম রূপে পুনরায় সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য তাঁরই তিন নাম –ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব। তিনি স্রষ্টা হয়ে আপনাকে সৃজন করেন, পালক ও পাল্য হয়ে আপনাকে পালন করেন, তারপর সংহর্তা ও সংহার্য হয়ে নিজেই সংহৃত হন। তিনিই সৃজ্য, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই পালক ও সংহারক। ব্রহ্মের এই শক্তি অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ। এই জ্ঞানে তর্ক চলে না বলে একে অচিন্ত্যজ্ঞান বলে। ভগবান সৃষ্টিকার্যের জন্য লোক পিতামহ ব্রহ্মা রূপে উৎপন্ন হয়েছিলেন। নার বা জলে অয়ন বা আশ্রয় করে থাকেন বলে ভগবানের নাম নারায়ণ। তিনি বরাহ রূপে পাতাল থেকে পৃথিবী উদ্ধার করেন। দেহের বিস্তৃতির জন্য পৃথিবী জলে নিমগ্ন না হয়ে সমুদ্রের উপরে নৌকার ন্যায় ভাসতে লাগল। তারপর নারায়ণ পৃথিবীকে সমান করে তার উপর পর্বত স্থাপন করে সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত করলেন।

ব্রহ্মা ধ্যানে যে মানস প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন, তার বংশ বৃদ্ধি না হওয়াতে তিনি ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু অঙ্গিরা মরীচি দক্ষ অত্রি ও বসিষ্ঠ নামে নয় জন মানস পুত্রের সৃষ্টি করলেন। এর আগে তিনি যে সনন্দনাদি ঋষি সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের লোক সৃষ্টিতে নিরাসক্ত দেখে তাঁর ক্রোধ জন্মাল। তাঁর ক্রোধ-দীপ্ত ভ্রূকুটি-কুটিল ললাট থেকে মধ্যাহ্ন সূর্যের সমান প্রভার অর্ধ নারী-নর-বপু প্রচণ্ড রুদ্র উৎপন্ন হলেন। 'আত্মাকে বিভাগ কর', তাঁকে এই কথা বলে ব্রহ্মা অন্তর্ধান হলেন। ব্রহ্মার আদেশে রুদ্র প্রথমে স্ত্রী পুরুষ রূপে দ্বিধা বিভক্ত

হলেন, পরে সৌম্যাসৌম্য ও শান্তাশান্ত রূপে পুরুষকে একাদশ ভাগে ও স্ত্রীকে সিত ও অসিত স্বরূপে বহুধা বিভক্ত করলেন। তারপর ব্রহ্মা প্রজাপালনের জন্য নিজে আত্ম সম্ভূত মনু হয়ে তপস্যায় নিষ্পাপ সেই শতরূপা নারীকে পত্নী রূপে গ্রহণ করলেন।

মনু ও শতরূপার জন্ম মার্কণ্ডেয় পুরাণে কিছু অন্য রকম। মার্কণ্ডেয় ক্রৌষ্টুকিকে বলছেন, পূর্বে তিনি সনন্দাদি যে প্রজা সৃষ্টি করেন তাঁরা সংসারে আসক্ত না হয়ে সমাধিপরায়ণ হওয়াতে ব্রহ্মা জাতক্রোধ হলেন। তাতে সূর্য সন্নিভ সুবিশাল দেহের অর্ধনারী-নরদেহ পুরুষ জন্মগ্রহণ করলেন। তাই দেখে ব্রহ্মা বললেন, তুমি আত্মাকে বিভক্ত কর। বলে অন্তর্হিত হলেই সেই পুরুষ তার পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব পৃথক করে এক পুরুষ ও স্ত্রীর জন্ম দিলেন। ব্রহ্মা সেই পুরুষকে স্বায়ম্ভুব মনু ও সেই নারীকে শতরূপা রূপে নির্মাণ করলেন। স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন।

মনু ও তাঁর কন্যা বংশ

এই ভাবে জন্ম হল ইতিহাসের প্রথম পুরুষ মনুর। শতরূপা তাঁর পত্নী, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ তাঁদের দুই পুত্র। কন্যাও দুটি, তাঁদের নাম প্রসূতি ও আকূতি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মনুর পুত্র দশটি, কিন্তু নাম পাওয়া যায় দুজনেরই। কন্যার সংখ্যা যে তিন ছিল, তা জানা যায় শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবী ভাগবত থেকে। তৃতীয় কন্যার নাম দেবহুতি। মনু প্রসূতিকে দক্ষের হাতে ও আকূতিকে রুচির হাতে সম্প্রদান করেন। এই দক্ষ প্রথম দক্ষ। দক্ষ প্রজাপতি নামে যিনি পরিচিত, তিনি প্রচেতাদের পুত্র দ্বিতীয় দক্ষ। তাঁর জন্ম হয়েছিল চাক্ষুষ মন্বন্তরে। প্রথম দক্ষের চব্বিশটি কন্যা হয়েছিল। প্রথম তেরোটি কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন ধর্ম এবং এই কন্যারা এক একটি পুত্রের জন্ম দেন। শ্রদ্ধার পুত্রের নাম কাম, নন্দাকে বিবাহ করে তাঁর হর্ষ নামে এক পুত্র হয়। লক্ষ্মীর পুত্র দর্প, ধৃতির

পুত্র নিয়ম, তুষ্টির পুত্র সন্তোষ, পুষ্টির পুত্র লোভ, মেধার পুত্র শ্রুত, ক্রিয়ার পুত্র দণ্ড, বুদ্ধির পুত্র বোধ, লজ্জার পুত্র বিনয়, বপুর পুত্র ব্যবসায়, শান্তির পুত্র ক্ষেম, সিদ্ধির পুত্র সুখ ও কীর্তির পুত্র যশ। দক্ষের বাকি একাদশ কন্যাকে ঋষিরা গ্রহণ করেন—ভৃগু খ্যাতিকে, ভব সতীকে, মরীচি সম্ভূতিকে, অঙ্গিরা স্মৃতিকে, পুলস্ত্য প্রীতিকে, পুলহ ক্ষমাকে, ক্রতু সন্নীতিকে, অত্রি অনসূয়াকে, বশিষ্ঠ উর্জাকে, বহ্নি স্বাহাকে এবং পিতৃগন স্বধাকে গ্রহণ করেন।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে দ্বিতীয় দক্ষের সম্বন্ধেও বলা হয়েছে যে তাঁর দশটি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন ধর্ম। ধর্ম, দক্ষ কন্যাদের নাম ও তাঁদের পুত্রদের নাম থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এটি একটি রূপক। ধর্মের সহবাসে মানুষের গুণের যে রূপান্তর ঘটে, এই রূপকে তাই বলা হয়েছে। ঋষিদের সঙ্গে যে কন্যাদের বিবাহ হয়েছে, তাদের নামও অর্থবহ। ভব বা শিব বিবাহ করেছেন প্রথম দক্ষের কন্যা সতীকে।

রুচি আকূতিকে বিবাহ করেন। আকূতির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে দাম্পত্য মিথুনের জন্ম হয়। দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের যে দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়, তারা যম নামে খ্যাত দেবতা। এ কাহিনী বিষ্ণু পুরাণের।

কর্দম ও কপিল

দেবহুতির বিবাহের কাহিনী আছে শ্রীমদ্‌ভাগবতে। মৈত্রেয় বিদুরকে বলছেন, ব্রহ্মা কর্দমকে প্রজা সৃষ্টি করতে বলেছিলেন। তিনি সরস্বতীর তীরে দশ হাজার বৎসর তপস্যা করলেন। তাতে প্রসন্ন হয়ে বিষ্ণু তাঁকে দেখা দিলে কর্দম তাঁর স্তব করলেন। বিষ্ণু তাঁকে বললেন, তুমি কী জন্য এই তপস্যা করছ, তা আমি জানি। ব্রহ্মাবর্তের সম্রাট মনু তাঁর মহিষী শতরূপা ও কন্যা দেবহুতিকে নিয়ে পরশু এখানে আসবেন। সেই কন্যা তাঁর অনুরূপ পাত্র অন্বেষণ করছেন এবং তিনি তোমাকেই ভজনা করবেন। রাজা তোমাকে

কন্যা দান করবেন। তোমার নটি কন্যা জন্মাবে এবং আমি আমার অংশে তোমার পুত্র হয়ে জন্মে তত্ত্বসংহিতা প্রণয়ন করব। এই কথা বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন এবং যথাসময়ে রাজা মনু রথারোহণে পৃথিবী পর্যটন করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। কর্দম তাঁকে আসন দিয়ে বললেন, কী জন্য আপনার এখানে আগমন তা বলুন। মনু বললেন, ইনি আমার কন্যা, নারদের মুখে আপনার রূপ ও গুণের কথা শুনে আপনাকেই পতিত্বে বরণ করবেন বলে স্থির করেছেন। আমি শ্রদ্ধা সহকারে এঁকে সম্প্রদান করছি, আপনি গ্রহণ করুন। কর্দম বললেন, আমি এঁর প্রতি অনুরাগী, বিবাহ-বিধিসম্মত মন্ত্র আপনার এই কন্যার প্রতি প্রযোজিত হোক। যত দিন এই কন্যার সন্তান না হয়, তত দিন আমি গৃহধর্ম পালন করব। রাজা মনু তাঁর মহিষী ও কন্যার স্পষ্ট অভিপ্রায় অবগত হয়ে হৃষ্ট মনে কর্দমকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করলেন। তারপর তাঁরা ব্রহ্মাবর্তে তাঁদের বর্হিষ্মতী পুরীতে ফিরে গেলেন।

দেবহূতি কর্দমের পরিচর্যা করতে লাগলেন। দীর্ঘকাল এই ভাবে গত হলে তিনি আরও শীর্ণ হলেন এবং তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে কর্দমের করুণা হল। তিনি বললেন, আমি তপস্যা করে যা পেয়েছি, আমার সেবা করে তোমার তা আয়ত্ত হল। দেবহূতি ঈষৎ লজ্জার সঙ্গে সহাস্যে বললেন, আপনি আমার পাণিগ্রহণের সময় যে অঙ্গীকার করেছেন, তা রক্ষা করুন। যাতে আমার গর্ভাধান হতে পারে, এমন অঙ্গসঙ্গ একবার হোক এবং কামশাস্ত্র অনুসারে সাধনের উপায় কল্পনা করুন। কর্দমের যোগ বলে তখনই একটি কামচারী বিমান এসে উপস্থিত হল। দেবহূতি পতির আদেশে সরস্বতীর আধার বিন্দু সরোবরে গিয়ে অবগাহন করলেন। সেখানে সহস্র তরুণী কন্যা তাঁকে তেল মাখিয়ে স্নান করাল। বসনে ভূষণে সজ্জিত পত্নীকে নিয়ে ঋষি বিমানে আরোহণ করলেন। সেখানে তিনি অনেক দিন ক্রীড়া করলেন। দেবহূতি কয়েকটি সুন্দরী কন্যা

প্রসব করলেন। তারপর দেখলেন যে স্বামী প্রব্রজ্যাশ্রম গমনে উদ্যত। তিনি বললেন, আপনি বনে গেলে এই কন্যাদের নিজেদের পতি অন্বেষণ করতে হবে, আর আমাকেই বা কে জ্ঞান শিক্ষা দেবে! কর্দম বললেন, তুমি চিন্তা কোরো না। অচিরে ভগবান তোমার পুত্র হয়ে জন্মাবেন এবং তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ দেবেন।

ভগবান যখন জন্ম নিলেন, তখন আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল। মরীচি প্রভৃতি ঋষিদের নিয়ে ব্রহ্মা তাঁর আশ্রমে এসে বললেন, এই ঋষিদের হাতে তোমার সুন্দরী কন্যাদের সম্প্রদান কর। আর তোমার এই পুত্র ঈশ্বর, তিনি কপিল রূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই বলে তিনি নারদকে নিয়ে চলে গেলেন। কর্দম মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা, পুলস্ত্যকে হবির্ভূ, পুলহকে গতি, ক্রতুকে ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী এবং অথর্বকে শান্তি নামের কন্যাকে সম্প্রদান করলেন। তাঁরা সেই কন্যাদের নিয়ে নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন।

কর্দম তাঁর পুত্রকে নির্জনে বললেন, তুমি যখন আমার পুত্র রূপে জন্মেছ। তখম আমার দেব ঋণ, ঋষি ঋণ ও পিতৃ ঋণ শোধ হয়েছে। এবারে আমি পরিব্রাজক পথাবলম্বী হতে চাই। ভগবান বললেন, আত্মজ্ঞানের সূক্ষ্ম মার্গ কালবশে বিনষ্ট হয়েছে। আমি তা পুনরায় প্রবর্তন করব। এই কথা শুনে কর্দম অরণ্য যাত্রা করলেন এবং সমদর্শী হয়ে ভক্তিযোগে ভগবৎগতি লাভ করলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই কাহিনী থেকে অতি সহজেই অতিরঞ্জিত অংশটুকু বাদ দেওয়া যায়। তাহলেই দেখা যাবে যে সরস্বতী নদীর তীরে তপস্বী কর্দমকে দেখে মনু তাঁরই সঙ্গে কন্যা দেবহুতির বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর কয়েকটি কন্যা ও কপিল নামে এক পুত্র হয়। কর্দম তাঁর কন্যাদের বিবাহ দিয়েছিলেন ঋষিদের সঙ্গে। দেখা যাচ্ছে যে ঋষিদের পত্নীর নামে দুই পুরাণে কিছু মতভেদ আছে। থাকা অসম্ভব নয়। বোঝা যাচ্ছে যে ব্রহ্মার মানসপুত্র নামে

পরিচিত কয়েকজন ঋষি দক্ষ ও কর্দমের কন্যাদের বিবাহ করেছিলেন। কে কার কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং কার কী নাম তা সঠিক না জানলেও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে মূল্যবান কথা এই যে ভারতের প্রাচীনতম দার্শনিক কপিলের জন্মের বিষয়ে কোন মতান্তর নেই। তিনি কর্দম ও দেবহুতির পুত্র, স্বায়ম্ভুব মনুর দৌহিত্র এবং আনুমানিক ৫৯০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জন্মেছিলেন। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৫৯০০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করে যে তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের কথা ভেবেছিলেন এবং সাংখ্যতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিম্নোক্ত কাহিনী থেকেই তা জানা যায়।

পিতা অরণ্য যাত্রা করলে কপিল তাঁর মাতার প্রিয় সাধনের জন্য বিন্দু সরোবরের তীরস্থ আশ্রমেই নিষ্ক্রিয় হয়ে বাস করতে লাগলেন। একদিন দেবহুতি পুত্রের নিকটে এসে বললেন, আমি বিষয় অভিলাষে শ্রান্ত হয়েছি, তুমি আমার এই মোহ দূর কর। এই কথা শুনে কপিল আনন্দিত হয়ে বললেন, বিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিত্ত বিষয়ে আসক্ত হলেই জীবের বন্ধন এবং পুরুষোত্তমে সংযত হলে তার মোচন হয়। আমি ও আমার প্রকৃতি অভিমান থেকে উৎপন্ন কাম লোভ মোহাদি যখন মনে থেকে দূর হয়, তখন জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তিযুক্ত চিন্তায় আত্মার স্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞান থেকে উদ্ভূত আত্মদর্শনকে পণ্ডিতরা মুক্তির কারণ বলেন। জীবের অন্তর্জ্যোতি যে আত্মা, তিনিই পুরুষ। তিনি অনাদি ও স্বপ্রকাশ এবং প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েই বিশ্ব প্রকাশ পায়। প্রকৃতি লীলার জন্য সেই পুরুষের নিকটে উপগত হলে তিনি তাঁকে ইচ্ছা মতো গ্রহণ করেন। তারপর সেই প্রকৃতি নিজের গুণে বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করতে থাকলে পুরুষ অবিদ্যায় মুগ্ধ হন এবং নিজেকেই তার কর্তা বলে অভিমান করেন। কিন্তু পুরুষ কেবল সাক্ষী মাত্র, তিনি কোন কর্মেরই কর্তা নন।

পুরুষের এই কর্তৃত্বের অভিমান হলেই জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়। পণ্ডিতরা বলেন যে কার্য কারণ ও কর্তৃত্ব এ সবের কারণ প্রকৃতি। সুখ দুঃখের ভোক্তৃত্ব বিষয়ে পুরুষকে কারণ বলা যায়।

দেবহুতি বললেন, প্রকৃতি ও পুরুষ তো এই বিশ্বের কারণ, তাদের লক্ষণ বল।

কপিল বললেন, যিনি প্রধান তাঁর নাম প্রকৃতি। সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম কাজের তিনি আশ্রয়। তিনি ত্রিগুণ, অব্যক্ত ও নিত্য। তাঁর কাজের চব্বিশটি গুণ আছে—পাঁচ পাঁচ দশ ও চার এই রকম সংখ্যা। ভূমি জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত, গন্ধ রূপ রস স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্র, শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ ও বাক্, পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি অহংকার ও চিত্ত এই চার অন্তরিন্দ্রিয়। অন্তঃকরণকেই বৃত্তি ভেদে চার ধরা হয়েছে। এই চব্বিশ তত্ত্বই স্বগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশ স্থান। এর ওপর কালকে নিয়ে এই তত্ত্বের সংখ্যা পঁচিশ। যোগযুক্ত ভক্তি বৈরাগ্য ও জ্ঞানের দ্বারা জীবাত্মায় পরমেশ্বরের চিন্তা করতে হয়।

মাতা দেবহুতির নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কপিল তাঁর মোহ দূর করলেন। তারপর মায়ের অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করলেন। দেবহুতি সেই আশ্রমে থেকে যোগযুক্তা হয়ে অচিরে পরম ব্রহ্ম ভগবানকে লাভ করলেন।

মায়ের আশ্রম থেকে বেরিয়ে কপিল প্রথমে উত্তর দিকে গিয়েছিলেন। সমুদ্র তাঁকে অর্ঘ ও বাসস্থান দিয়েছিলেন।

এই কাহিনীতে দুটি বিষয় লক্ষ্য করবার মতো। একটি হল কপিলের সাংখ্য দর্শন। সে যুগের সমাজ কত উন্নত হয়েছিল তা মাতা-পুত্রের প্রশ্নোত্তরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই বলতে হয় যে কল্পারম্ভেই এই সমাজের প্রথম অবস্থা নয়, এই সময় থেকে কালের হিসাব রাখার আরম্ভ হয়েছে। একটি সুসভ্য সমাজ উপলব্ধি

করেছিল যে দেশের ইতিহাস রক্ষা করতে হলে কালের মাপকাঠিতে তাকে ধরে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় কথা দেশের ভৌগোলিক সংস্থান। কপিল প্রথমে উত্তর দিকে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি অন্য দিকে ফিরেছিলেন কিনা জানা নেই। সমুদ্র তাঁকে অর্ঘ ও বাসস্থান দিয়েছিলেন। এই সমুদ্র উত্তরে না দক্ষিণে তা বোঝা যাচ্ছে না। আমরা জানি কপিলের আশ্রম ছিল বাঙলার দক্ষিণে সাগর দ্বীপে। এর মূলে কোন সত্য আছে কিনা কে জানে!

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। শ্রীমদ্‌ভাগবতে মনুর কন্যা বংশের কথা সবিস্তারে আছে। তাতে দেখা যায় যে শ্রদ্ধার বিবাহ হয় অঙ্গিরার সঙ্গে এবং উতথ্য ও বৃহস্পতি তাঁদের পুত্র। পুলস্ত্যের পত্নী হবির্ভূ বিশ্রবার মাতা এবং কুবের ও রাবণ প্রভৃতি বিশ্রবার পুত্র। ভৃগু বিবাহ করেছিলেন খ্যাতিকে, তাঁদের পুত্র উশনা বা শুক্র। এই বংশ পরিচয় সত্য হতে পারে না। অঙ্গিরা পুলস্ত্য ও ভৃগুর পুত্র ও পৌত্রদের আমরা অনেক পরবর্তী কালে পাই। মনে হয় যে বৃহস্পতি শুক্র বা রাবণেরা ঐ সব বংশজাত বলেই তাঁদের পুত্র বা পৌত্র বলা হয়েছে। কিংবা একই নামে একাধিক ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন।

প্রিয়ব্রত

মনুর রাজত্বকালে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা জানা যায় না। শুধু শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি কথায় বিস্মিত হতে হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে মনুর দুই পুত্র ছিল প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কন্যা আকূতির বিবাহ দিয়েছিলেন রুচির সঙ্গে পুত্রিকা ধর্ম অনুসারে। এই বিবাহের একটি শর্ত আছে—কন্যার পুত্র হলে তা পিতার বংশে গণ্য হবে। এর এই অর্থ হতে পারে যে আকূতির বিবাহের পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রতের জন্ম

হয়েছিল। মনু ভেবেছিলেন যে তাঁর হয়তো পুত্র সন্তান হবে না। আকূতির পুত্রের নাম যজ্ঞ। যজ্ঞকে মনু নিজের গৃহে নিয়ে আসেন। এর পর আকূতির দক্ষিণা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। যজ্ঞ রাজা হন নি। তিনি তাঁর অনুজা দক্ষিণাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের বারোটি পুত্র তুষিত নামে দেবতা হয়েছিলেন। ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ পুরাণকার সমর্থন করতে পারেন নি বলে যজ্ঞকে বিষ্ণু বলেছেন এবং পুত্রিকা ধর্মের কথাও বলেছেন।

এই ঘটনার উল্লেখ দেখে আরও একটি সন্দেহ জাগে। উত্তানপাদ নামে মনুর কোন পুত্র হয়তো ছিল না। থাকলে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল অকালে অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পূর্বে। সেকালের প্রথা অনুসারে রাজারা তাঁর রাজত্ব পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। কিন্তু মনুর সমগ্র রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। প্রিয়ব্রতের বংশ শেষ হবার পরেই উত্তান-পাদ রাজা হয়েছিলেন বলে দেখা যায়। এ প্রায় সাড়ে সাতশো বৎসর পরে। এই সময়ের মধ্যে প্রিয়ব্রত বংশের প্রায় একত্রিশজন রাজা রাজত্ব করেন। উত্তানপাদ শিশুপুত্র রেখে পিতার জীবদ্দশায় মারা গিয়েছিলেন মনে করা যেতে পারে। তাই প্রিয়ব্রত বংশের শেষ রাজা বিশ্বগ্‌জ্যোতির পর উত্তানপাদ বংশের একজন উত্তানপাদ নাম নিয়ে রাজত্ব করেছিলেন। এঁরই পুত্রের নাম ধ্রুব। ধ্রুবের কাল ৫১৮৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। কিংবা উত্তানপাদ মনু বংশজাত ছিলেন বলেই তাঁকে মনুর পুত্র বলা হয়েছিল।

শ্রীমদভাগবতে আছে যে প্রিয়ব্রত নারদের নিকটে পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে কিছুকাল রাজ্যসুখ ভোগ করবার পর পুত্রদের মধ্যে রাজ্য সম্পদ ভাগ করে দিয়ে ভগবৎ পদ লাভ করেন। তিনি অধ্যাত্ম চিন্তায় দীক্ষা গ্রহণ করবেন বলে স্থির করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা মনু তাঁকে পৃথিবী পালনের ভার নেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজপদ গ্রহণ করলে মিথ্যা রাজ্য প্রপঞ্চ থেকে

আত্মার পরাভব হবে বিচার করে তিনি পিতার আদেশ মানতে রাজী হন নি। ব্রহ্মা তাঁকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, এখন তুমি সংসার ভোগ কর, পরে তুমি সঙ্গ ত্যাগ করে আত্মনিষ্ঠ হয়ো। প্রিয়ব্রত এ কথা মেনে নিতেই মনু তাঁকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে নিজে গৃহের ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন।

বিষ্ণু পুরাণে পাওয়া যায় যে প্রিয়ব্রত কর্দমের এক কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। অন্যান্য পুরাণের মতে কর্দম প্রিয়ব্রতের ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন। তাই এই কথা ঠিক বলে মনে হয় না। শ্রীমদ্‌-ভাগবত ও দেবী ভাগবতে আছে যে প্রিয়ব্রত বিশ্বকর্মা প্রজাপতির কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের একটি কন্যা ও দশটি পুত্র জন্মে। কন্যার নাম উর্জস্বতী এবং পুত্রদের নাম অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান, দ্যুতিমান, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবল, পুত্র ও জ্যোতিষ্মান। মেধা, অগ্নিবাহু ও পুত্র জাতিস্মর ছিলেন। বাকি সাত পুত্রকে প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপ বিভাগ করে দেন। অগ্নিধ্রকে জম্বু দ্বীপ, মেধাতিথিকে প্লক্ষ দ্বীপ, বপুষ্মানকে শাল্মলী দ্বীপ, জ্যোতিষ্মানকে কুশ দ্বীপ, দ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, ভব্যকে শাকদ্বীপ এবং সবলকে পুষ্কর দ্বীপ দিয়েছিলেন। প্রিয়ব্রতের রাজ্যে এই সপ্ত দ্বীপের সৃষ্টি কী ভাবে হয় তা দেবী ভাগবতে আছে। প্রিয়ব্রত তাঁর শাসন কালে দেখেছিলেন যে সূর্য যখন পৃথিবীর এক ভাগে আলো দেন, তখন অন্য ভাগে অন্ধকার থাকে। তিনি এই অন্ধকার দূর করবার জন্য সূর্যের মতো প্রভাময় রথে সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন। তাঁর রথের চাকায় ভূভাগ সাত সমুদ্রে বিভক্ত হয়েছিল এবং তাতেই সপ্ত সমুদ্র ও সপ্তদ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এই সপ্ত দ্বীপের অবস্থান নিয়ে উপক্রমণিকায় আলোচনা করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে প্রিয়ব্রত তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্নীধ্রকে যে জম্বু দ্বীপ দিয়েছিলেন, তা একালের এশিয়া মহাদেশ।

প্রিয়ব্রতের উর্জস্বতী নামে যে কন্যার উল্লেখ আছে, তিনি

তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন উশনস বা শুক্রের সঙ্গে এবং কাব্যে বিখ্যাত দেবযানী তাঁদের কন্যা। এই কথা নিশ্চিত ভাবে ভুল বলা যায়। কাবে বিখ্যাত দেবযানীর বিবাহ হয়েছিল যযাতির সঙ্গে। যযাতির জন্ম চন্দ্র বংশে এবং তাঁর কাল ৩৭২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। দেবযানীর পিতা দৈত্যগুরু উশনা বা শুক্র এই সময়েই বিদ্যমান ছিলেন। কাজেই অন্য কোন শুক্রের সঙ্গে প্রিয়ব্রতের কন্যার বিবাহ হয়ে থাকলেও কাব্যে বিখ্যাত দেবযানী প্রিয়ব্রতের দৌহিত্রী নন।

প্রিয়ব্রতের পুত্র অগ্নীধ্রর কথাও আছে শ্রীমদ্‌ভাগবতে। পুত্র-লাভের জন্য তিনি মন্দর পর্বতের গুহায় তপস্যারত ছিলেন। এই সময়ে তাঁর পরিচয় হয় পূর্বচিত্তি নামে এক অপ্সরার সঙ্গে। পূর্বচিত্তি রাজার বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র রূপ যৌবন সম্পদ ও উদারতায় আকৃষ্ট হয়ে বহুকাল তাঁর সঙ্গে পার্থিব সুখ উপভোগ করেছিলেন। তাঁদের নটি পুত্র হয়। তাঁদের নাম নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্য, হিরণ্য, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। অগ্নীধ্র তাঁর রাজ্য জম্বু দ্বীপ এই নয় পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন। এঁদের রাজ্যকে বর্ষ বলা হয়। প্রত্যেকের নামে বর্ষের নাম। মনে হয় হরি বর্ষ কোন পুত্রের নাম ছিল না। হরির নামেই হরি বর্ষ নাম হয়েছে। নাভি যে বর্ষ পেয়েছিলেন, পরবর্তী কালে তাঁরই নাম ভারতবর্ষ হয়েছিল। নাভির পুত্র ঋষভ ও ঋষভের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত এই রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। হিম নামের দক্ষিণ বর্ষ ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষ হয়েছিল।

দক্ষ যজ্ঞ

দক্ষ যজ্ঞ এই মন্বন্তরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দক্ষ ছিলেন রাজা প্রিয়ব্রতের ভগিনীপতি। প্রিয়ব্রতের ভগিনী প্রসূতিকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। এঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা খ্যাতিকে বিবাহ করেন ভৃগু এবং দ্বিতীয়া কন্যা সতীকে বিবাহ করেন ভব বা

শিব। অন্যান্য কন্যাদেরও বিবাহ হয় ব্রহ্মার মানস পুত্র ঋষিদের সঙ্গে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে যে মহাদেবের পত্নী সতী পুত্রলাভ করতে পারেন নি। তাঁর পিতা দক্ষ বিনা অপরাধে মহাদেবের প্রতিকুল আচরণ করলে তিনি রোষ বশে যৌবনেই দেহত্যাগ করেন।

দক্ষ কেন সতীর অনাদর করে মহাদেবের প্রতি বিদ্বেষ করেছিলেন, তার কারণও এই পুরাণে আছে। পুরাকালে বিশ্বসৃষ্টি-কারী প্রজাপতিদের যজ্ঞে দেবতা ও ঋষিরা অনুচরবর্গ নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন। দক্ষ যখন সেই সভায় আসেন, তখন ব্রহ্মা ও মহাদেব ছাড়া আর সকলেই আসন থেকে উঠে দক্ষকে অভিনন্দন জানান। ব্রহ্মাকে প্রণাম করে দক্ষ উপবেশন করে বললেন, এই শিব নির্লজ্জ অবিনয়ী ও কর্তব্য আচরণে বিমুখ হয়ে সাধুদের পথ দূষিত করল। এ আমার কন্যাকে বিবাহ কবেছে। কিন্তু গাত্রোত্থান তো করলই না, কথা বলেও আমার সম্মান রক্ষা করল না। শূদ্রকে বেদ বিদ্যা প্রদানের মতো আমি একে কন্যাদান করেছি। এই ব্যক্তি ভূত প্রেতেব সঙ্গে উলঙ্গ দেহে উন্মত্তের মতো শ্মশানে বিচরণ করে। মাদকে মত্ত, এ শুধু নামেই শিব। বলে দক্ষ জলস্পর্শ করে অভিশাপ দিলেন, দেবতাদের যজ্ঞে এ যজ্ঞভাগ পাবে না। তাবপর সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

মহাদেবের প্রধান অনুচর নন্দীশ্বর এই কথা শুনে দক্ষের সমর্থক ব্রাহ্মণদের বললেন, অহঙ্কারে দক্ষ আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব বিস্মৃত হয়েছে। অতএব সে পশুর তুল্য। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, সে স্ত্রীকামী ছাগ-মুখ হোক, আর এই শিব বিদ্বেষী ব্রাহ্মণেরা জীবিকার জন্য বিদ্যার্জন ও ব্রতাচরণ করুক ও যাচকের বেশে বিচরণ করুক। ভৃগু দক্ষের জামাতা। তিনি অভিশাপ দিলেন, যারা শিবের ব্রত অবলম্বন করে ও তার ভক্তদের অনুসরণ করে, তারা পাষণ্ড হোক।

ভৃগুর কথায় শিব কিঞ্চিৎ বিমনা হয়ে নিজের অনুচরদের নিয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করলেন। অন্যান্য সকলে সহস্র বর্ষ

ব্যাপী যজ্ঞে হরির পূজা দেখে প্রয়াগে যজ্ঞান্ত স্নান সেরে গৃহে ফিরলেন।

এই কাহিনীতে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। শিব ধর্মাচরণের জন্য যে মার্গ অবলম্বন করেছিলেন, দক্ষ তার নিন্দা করেছেন। শিবের অনুচররা প্রতিবাদ করলেও শিব বিমনা হয়ে তাঁর অনুচরদের নিয়ে প্রস্থান করেন। বিবাদের সময়ে অভিশাপ দেবার একটা প্রবণতা ছিল। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এই অভিশাপ অসম্ভব কিছু নির্দেশ করে না। দক্ষের দাড়ি ছিল বলেই হয়তো তাঁকে 'ছাগমুখ হোক' বলা হয়েছে। ভৃগু বলেছেন, যারা শিবের ব্রত অবলম্বন করে তারা পাষণ্ড হবে। পাষণ্ড শব্দের অর্থ ধর্মে অবিশ্বাসী বা নাস্তিক। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে শিব কোন নূতন ধর্মপথ অবলম্বন করেছিলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে এর পরের ঘটনা এই রকম। বহুকাল অতিবাহিত হবার পর ব্রহ্মা যখন দক্ষকে প্রজাপতিদের আধিপত্যে অভিষিক্ত করলেন, তখন দক্ষ সগর্বে বাজপেয় যজ্ঞ সমাপ্ত করে বৃহস্পতি যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। তাতে দেবর্ষি ঋষি প্রভৃতি সকলেই পত্নীদের সঙ্গে পূজা পেলেন। সতী আকাশের খেচরদের কাছে এই কথা শুনলেন এবং বিমানে গন্ধর্ব দম্পতিদের সেই উৎসব ক্ষেত্রে যেতে দেখে শিবকে বললেন, আমারও সেখানে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে, গেলে সবার সঙ্গে আমার দেখা হবে। শিব এ কথা শুনে ঈষৎ হেসে বললেন, মেয়েরা অনিমন্ত্রিত হয়েও আত্মীয় স্বজনের গৃহে যেতে পারে, কিন্তু কুটিল প্রকৃতির আত্মীয়দের দুর্বাক্যে বড় পরিতাপ ভোগ করতে হয়। আমি জানি যে তুমি পিতার স্নেহের পাত্রী, কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ আছে বলে তুমি তাঁর কাছে সমাদর পাবে না। আমার কথা উপেক্ষা করে যদি যাও তো তোমার মঙ্গল হবে না। এতে সতী একবার গৃহ থেকে বার হন, তারপরই শিবের ভয়ে গৃহে ফিরে আসেন। তারপর হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে তিনি পিতৃগৃহে

যাত্রা করলেন। সতী বৃষে আরোহণ করলেন এবং শিবের অনুচররা তাঁর সঙ্গে চলল।

সতী পিতার যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করলে দক্ষের অনাদর দেখে তাঁর মা ও বোনেরা ছাড়া আর কেউ সমাদর করলেন না। তিনি দেখলেন যে এই যজ্ঞে শিবের কোন ভাগ নেই, তিনিও অনাদৃতা। তাই ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি গর্বিত দক্ষকে নিন্দা করে বললেন, কারও সঙ্গে যাঁর বিরোধ নেই, তাঁর সঙ্গে আপনি প্রতিকূল আচরণ করছেন। কেউ স্বামীর নিন্দা করলে তার জিব কেটে নিয়ে প্রাণ ত্যাগ করাই ধর্ম। আপনি শিবের নিন্দা করছেন, তাই আপনা থেকে উৎপন্ন এই দেহ আমি আর ধারণ করব না। বলে সতী মৌনাবলম্বন করে উত্তরমুখী হয়ে বসে যোগ অবলম্বন করলেন। তাঁর দেহের কলুষ বিনষ্ট হয়ে সমাধি সমুৎপন্ন অগ্নি সদ্য প্রজ্বলিত হল। এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে চারি দিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হল। তারা বলতে লাগল, দক্ষের কী কঠিন হৃদয়! কন্যাকে মরতে দেখেও তাকে নিবারণ করলেন না! পরলোকে তাঁর নরক প্রাপ্তি হবে। সতীর অনুচররা দক্ষকে বিনাশ করতে উদ্যত হলে ভৃগু মন্ত্র উচ্চারণ করে আহুতি দিলেন। তাতে ঋভু নামের দেবতারা উত্থিত হয়ে তাদের তাড়িয়ে দিলেন।

নারদের মুখে অপমানিত সতীর দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে মহাদেবের অতিশয় ক্রোধ হল। তিনি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তাঁর জটা ছিঁড়ে নিক্ষেপ করতেই মহাকায় বীরভদ্র উৎপন্ন হলেন। বললেন, আজ্ঞা করুন, কী করতে হবে! ভূতনাথ বললেন, আমার অনুচরদের অধিনায়ক হয়ে যজ্ঞ সহ দক্ষকে বিনাশ কর। এই আদেশ পেয়েই বীরভদ্র অনুচরদের নিয়ে যজ্ঞস্থলের দিকে ধাবিত হলেন। তারা যজ্ঞস্থল অবরোধ করে সব কিছু ভেঙে ফেলতে লাগল। পলায়নপর দেবতাদের তারা ধরতে লাগল। মণিমান ভৃগুকে বন্ধন করলেন, বীরভদ্র দক্ষকে, চণ্ডেশ সূর্যকে এবং নন্দীশ্বর ভগদেবকে বন্ধন করলেন। অন্যান্য সকলে যে যে ভাবে পারল পলায়ন করলেন।

প্রজাপতিদের যজ্ঞ সভায় ভৃগু তাঁর শ্মশ্রু দেখিয়ে শিবকে উপহাস করেছিলেন বলে বীরভদ্র তাঁর শ্মশ্রু উপড়ালেন। ভগ সেখানে চোখের ইসারায় দক্ষকে শিবের নিন্দায় উৎসাহ দিয়েছিলেন বলে তাঁর চোখ উপড়ে দিলেন। পুষা সেখানে দাঁত বার করে হেসে-ছিলেন বলে বীরভদ্র তাঁর দাঁত উপড়ে ফেললেন। তার পর দক্ষকে হাড় কাঠে ফেলে পশুর মতো তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। দক্ষের লোকেরা তাঁর নিন্দা করছে দেখে কুপিত বীরভদ্র দক্ষের মুণ্ড আগুনে আহুতি দিয়ে যজ্ঞশালা দগ্ধ করে কৈলাসে ফিরে গেলেন।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পূর্বেই বুঝতে পেরে দক্ষের যজ্ঞে যান নি। দেবতারা ব্রহ্মার নিকটে এসে সব কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন। ব্রহ্মা বললেন, শিব যজ্ঞের অংশভাগী, তাঁকে তোমরা বঞ্চনা করেছ। এই বাবে তাঁর পা ধরে তাঁকে প্রসন্ন কর। এই বলে তিনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে নিজেও কৈলাসে এলেন। এই পর্বতে যোগ বিষয়ে সিদ্ধ দেবতাদের বাস এবং কিন্নর গন্ধর্ব ও অপ্সরায় পরিবৃত। এর সৌন্দর্য দেখে দেবতারা বিস্মিত হলেন। তাঁরা অলকা নামে একটি মনোরম পুরী ও সৌগন্ধিক নামে একটি বন দেখতে পেলেন। নন্দা ও অলকনন্দা নামে দুটি নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। তাঁরা যক্ষেশ্বরের পুরী অতিক্রম করে সৌগন্ধিক বন দেখলেন এবং তারই নিকটে একটি বট গাছের নীচে মহাদেবকে উপবিষ্ট দেখলেন। অত্যন্ত প্রশান্ত তাঁর মূর্তি, কুবের ও ঋষিরা তাঁর সেবা করছিলেন। ব্রহ্মাকে সমাগত দেখে মহাদেব আসন থেকে উঠে আনত মস্তকে তাঁর বন্দনা করলেন। ব্রহ্মা সবার কাছে অভিনন্দিত হয়ে বললেন, আমি জানি আপনিই বিশ্বের ঈশ্বর। জগতের যোনি ও বীজ যে প্রকৃতি ও পুরুষ, যাকে শিব ও শক্তি বলে, এই দুয়ের কারণ নির্বিকার ব্রহ্ম আপনারই স্বরূপ। অপনিই অবিভক্ত শিব ও শক্তিতে ক্রীড়া করে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করছেন। ধর্ম ও অর্থপ্রদ বৈদিক কর্মপদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য আপনিই যজ্ঞের অবতারণা করেছিলেন। আপনি

সর্বজ্ঞ, তাই যারা জড় কর্মে আসক্ত তাদের আপনি অনুগ্রহ করুন। দক্ষের যজ্ঞ উদ্ধার করুন, যজ্ঞ কর্তা দক্ষ আবার জীবিত হোক, ভগ তার চোখ ফিরে পাক, ভৃগু তার শ্মশ্রু ও পুষা তার দন্ত। প্রহারে যারাই আহত হয়েছে, তারা সবাই আরোগ্য হয়ে উঠুক। আপনার ভাগ নিয়ে আপনি যজ্ঞ সম্পূর্ণ করুন। মহাদেব বললেন, ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ অজ্ঞ লোকের আমি কোন অপরাধ নিই না। তবে লোকের হিতের জন্যই দণ্ড বিধান করেছি। দক্ষের মাথা তো দগ্ধ হয়েছে, তার ছাগ মুণ্ড হোক, ভগদেব মিত্রের চোখ দিয়ে নিজের যজ্ঞভাগ দেখুক, পুষা যজমানের দাঁত দিয়ে ভক্ষণ করুক এবং অন্যান্য সকলেই সুস্থ হয়ে উঠুক।

মহাদেবের এই কথায় সকলে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ও ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ করে যজ্ঞস্থলে আনলেন। দক্ষের দেহে যজ্ঞের ছাগমুণ্ড সংযোজিত হল এবং মহাদেবের দৃষ্টিপাতে তাঁর প্রাণ সঞ্চার হলে দক্ষ তাঁর স্তব করতে লাগলেন। পুনবায় যজ্ঞ প্রবর্তন হলে গরুড়ে আরোহণ করে বিষ্ণু এসে উপস্থিত হলেন। এর পর দক্ষ যজ্ঞ সমাপ্ত করলেন এবং দেবতারা স্বর্গে ফিরে গেলেন।

এই ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। প্রথমেই বলতে হয় যে সতী দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করে শিবকে ভয় দেখিয়ে পিতৃগৃহে যাবার মত আদায় করেছিলেন, এই কাহিনী এই পুরাণে নেই। সতীর দেহত্যাগের পর শিব শোকে উন্মত্ত হয়ে পত্নীর দেহ কাঁধে নিয়ে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন এবং বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রে সেই দেহ খণ্ড খণ্ড করে নানা জায়গায় ফেলেছিলেন, সে কাহিনীও এই পুরাণে নেই। পীঠস্থান প্রসঙ্গে অনেক পরবর্তী কালে এই কাহিনী সংযোজিত হয়েছে। সত্য ঘটনা এই রকম।—দক্ষ অহংকারী ছিলেন। প্রজাপতিদের যজ্ঞে শিব দক্ষকে সম্মান না করায় তিনি তাঁর নিজের যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ না করে অপমান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিজের কন্যা সতী অনাহূত হয়ে এলে তিনি সবার সামনে শিবের

নিন্দা করেন। সতী এই দুঃখে আত্মহত্যা করেন, সম্ভবত যজ্ঞের আগুনে পুড়ে মরেন। এর জন্য শিবের অনুচররা যজ্ঞ পণ্ড করেন। দক্ষ এবং আরও অনেকে আহত হন। মনে হয়, দক্ষকে যূপকাঠে ফেলে বলি দেবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। কিন্তু তিনি গুরুতর রূপে আহত হন। শিব সেকালের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকও ছিলেন, তাঁকে বৈদ্যনাথ বলা হত। আহতদের চিকিৎসার জন্য শিবকেই বুঝিয়ে সুঝিয়ে আনা হয় এবং তিনি সবাইকে নিরাময় করেন।

ব্রহ্মার কথায় আরও একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্রহ্মা স্বীকার করেছেন যে শিবও যজ্ঞের ভাগী, অর্থাৎ তিনি যে ধর্ম পথ অনুসরণ করছেন তা নাস্তিক বা পাষণ্ডের পথ নয়। একদা শিবই ধর্ম ও অর্থপ্রদ বৈদিক কর্ম পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য যজ্ঞের অবতারণা করেছিলেন। নিমন্ত্রিতদের যজ্ঞের ভাগ দিতে হত। পরে বোধহয় তিনি এই যজ্ঞ কার্যের চেয়ে যোগমার্গ অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। ব্রহ্মা বলছেন, জগতের যোনি ও বীজ যে প্রকৃতি ও পুরুষ, যাকে শিব ও শক্তি বলে, এই দুইয়ের কারণ নির্বিকার ব্রহ্মই আপনার স্বরূপ। আপনিই অবিভক্ত শিব ও শক্তিতে ক্রীড়া করে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করেছেন। শিবের ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা যায় যে তিনি শ্মশানচারী যোগীর জীবন যাপন করছিলেন এবং তাঁর অনুচরও কম ছিল না। সেকালের জন জীবনে তাঁর প্রতিপত্তিও জানা যাচ্ছে।

এই ঘটনায় শিবের বাসস্থান কৈলাসেরও ভৌগোলিক তথ্য পাওয়া যায়। নন্দা ও অলকনন্দা নামে দুটি নদী ও অলকাপুরী নামে কোন স্থান আছে। এখানেই যোগ বিষয়ে সিদ্ধ দেবতাদের বাস। গন্ধর্ব অপ্সরা ও কিন্নরদের বাসও এইখানে। যক্ষরাজ কুবেরও এখানে বাস করেন এবং ঋষিদের নিয়ে শিবের সেবা করেন। বর্তমান কালের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে হিমালয়ের উত্তরাখণ্ডে অলকনন্দার

উপত্যকায় বদ্রীনাথেরও উত্তরে একটি স্থান এখনও অলকাপুরী নামে পরিচিত। এই বর্ণনায় দ্বিতীয় দক্ষের দৌহিত্র গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের কথা বলা হয়েছে ভুল ক্রমে।

যক্ষ যজ্ঞের কাল নির্ণয় করা যায় সহজে। প্রিয়ব্রত ও দক্ষ সমকালীন বলে প্রবীণ দক্ষের যজ্ঞকাল প্রিয়ব্রতের পুত্র নাভির রাজত্ব-কালে ধরা যেতে পাবে। তার কারণ, এই সময়েই দক্ষের জামাতা শিবের প্রতিপত্তি নিয়েই বিবাদ হয়েছিল। নাভি শিবের সমকালীন এবং নাভিব পুত্র ঋষভ যে শিবেব যোগ জীবনে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, তা তাঁর জীবন ধাবা আলোচনা কবলেই জানা যাবে। এই সব বিচাব করে বলা যেতে পাবে যে ৫৯০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কিছু পরে এই দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল। নাভির কাল ৫৮৮৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। পুত্র উপযুক্ত হয়েছে মনে হলে সেকালের রাজারা পুত্রেব হাতে রাজ্যভার দিয়ে বাণপ্রস্থে যেতেন। এই রীতি প্রচলিত ছিল বলেই মনে করা হয়েছে যে দক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল নাভির রাজত্বকালে, অর্থাৎ ৫৮৮৬ খ্রীষ্ট পূবাব্দের কিছু পরে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কর্দমের পুত্র কপিলও একই সময়ে বর্তমান ছিলেন এবং তাঁর সাংখ্যদর্শন প্রচার করেছিলেন। মনে হয় যে কপিলও শিবের ধর্ম চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং প্রকৃতি ও পুরুষকেই বিশ্বসৃষ্টির কারণ বলে মেনে নিয়েছিলেন।

ঋষভ

ঋষভের কথা বলতে হলে তাঁর পিতা নাভির কথাই আগে বলতে হয়। নাভি মেরুর কন্যা মেরু দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। শ্রীমদ্-ভাগবতে আছে যে রাজা নাভি তাঁর নিঃসন্তান পত্নী মেরু দেবীর সঙ্গে সন্তান লাভের জন্য যজ্ঞ পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। তিনি যখন যজ্ঞ কর্মে রত, তখন ভগবান নিজ মূর্তিতে দেখা দিয়েছিলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁকে সমাদরে পূজা করলেন। ঋত্বিকরা তাঁর

স্তব করে বললেন, রাজর্ষি নাভি আপনার তুল্য একটি সন্তান লাভের জন্য আপনার শরণাগত হয়েছেন। ভগবান বললেন, তোমরা আমার তুল্য বর চাইছ, কিন্তু আমি অদ্বিতীয় বলে জগতে আমার তুল্য এক আমিই আছি। কাজেই আমিই মহারাজ নাভির মধ্যে অংশত অবতীর্ণ হব। তিনি এই কথা মেরুদেবীর শ্রুতিগোচরে বলেই অন্তর্হিত হলেন এবং তিনিই নাভির অন্তঃপুরে মেরু দেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নাভি তাঁর পুত্রের নাম রাখলেন ঋষভ।

ঋষভের জন্মের ব্যাপারে বিষ্ণুকে যুক্ত করাব কারণ বোধ হয় বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলার মতো। বিষ্ণুব অংশে জন্ম বলে পুরাণকার বোঝাতে চান যে তিনি কোন নূতন ধর্ম প্রচার করেন নি। মনে হয় যে এই রকমের একটা কাহিনী প্রচাব কবে ঋষভের জন্ম ও কর্ম গৌরবান্বিত করা হয়েছে। পুবাণকার আরও বলেছেন যে একবাব ইন্দ্র তাঁব রাজ্যে বৃষ্টিপাত না করলে ঋষভ তা জেনে সহাস্যে যোগ বলে বৃষ্টিপাত করিয়েছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে কশ্যপের পুত্র ইন্দ্র কয়েক মন্বন্তব পরে জন্মেছিলেন। ইলাবৃতবর্ষের রাজারা ইন্দ্র নামে পরিচিত এবং কশ্যপের পুত্রও ইলাবৃতবর্ষের রাজা হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সে বহুকাল পরে। মেঘ বা বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র বৈদিক কল্পনা। প্রাকৃতিক শক্তির উপরে যখন দেবত্ব আরোপ করা হয়েছিল, তখন দেবতা জাতির রাজা ইন্দ্র হয়েছিলেন মেঘ বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা। নাভি তাঁর পুত্রের প্রতি প্রজাদের অনুরাগ জানতে পেরে তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করে মেরু দেবীর সঙ্গে বদরিকাশ্রমে যান এবং সেখানে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়ে বাসুদেবের আরাধনা করে জীবন্মুক্তি লাভ করেন।

ঋষভ নিজের রাজ্যকে কর্মক্ষেত্র জ্ঞান করে গুরু কুলে বাসের পর বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত কর্মের অনুষ্ঠান করেন। তিনি ইন্দ্রের প্রদত্ত কন্যা জয়ন্তীকে বিবাহ করেন। তাঁদের একশোটি পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রদের মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ এবং ভরতের নামেই ভারতবর্ষ নাম

হয়েছে। ভরতের পর কুশাবর্ত ইলাবর্ত ব্রহ্মাবর্ত মলয় কেতু ভদ্রসেন ইন্দ্রস্পৃক বিদর্ভ ও কীকট নামে নয়জন পুত্র প্রধান হয়েছি'লন। এদের পরে কবি হবি অন্তরীক্ষ প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন আবির্হোত্র দ্রুমিল চমন ও করভাজন এই নয় জন ভাগবত ধর্মের উপদেশক হয়েছিলেন। বাকি একাশীটি পুত্র কর্মবিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

এখানে লক্ষণীয় যে ঋষভ জয়ন্তী নামে কোন কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। জয়ন্তী কার কন্যা তা বলা হয় নি। ইন্দ্র তাঁকে প্রদান করেছিলেন। কশ্যপের পুত্র ইন্দ্রের কন্যার নাম জয়ন্তী। কিন্তু ঋষভ এই জয়ন্তীকে বিবাহ করেন নি। ইনি অন্য কোন জয়ন্তী। অথবা ঋষভের পত্নী নির্বাচন করেছিলেন ইলাবৃতবর্ষের তৎকালীন অধিপতি। ঋষভের পুত্রেব সংখ্যা একশো। এটা অতিরঞ্জিত মনে হয়। বহু পুত্রকেই একশো পুত্র বলা হয়েছে, কিংবা পুত্র স্থানীয় প্রজাকে পুত্র বলা হয়েছে। পরের কথা জেনেই এই রকম অনুমান হয়। ঋষভ একবার দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে ব্রহ্মাবর্তে পৌঁছে প্রজাদের সামনে নিজের পুত্রদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, তপস্যা করা সকলের উচিত, তাতে চিত্তশুদ্ধি ও অনন্ত ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। তোমরা মাৎসর্য ত্যাগ করে তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভরতের সেবা কর, তাতেই তোমাদের পিতৃসেবা ও প্রজাপালন সিদ্ধ হবে। এই বলে ঋষভ পৃথিবী পালনের জন্য ভরতকে রাজপদে অভিষিক্ত করে ব্রহ্মাবর্ত থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে উন্মত্তের মতো নগ্ন হয়ে বহির্গত হলেন। তিনি মৌন ব্রত গ্রহণ করে প্রব্রজ্যার সময় দুর্জন কর্তৃক নানা ভাবে উৎপীড়িত হয়েও তা অগ্রাহ্য করে একাকী পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই অবস্থায় লোকেরা তাঁর যোগের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছে দেখে তিনি অজগর ব্রত অবলম্বন করলেন। নিজের দেহত্যাগের ইচ্ছায় যোগীদের দেহত্যাগের প্রণালী শিক্ষা দেবার জন্য নিজের আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে দেখে আত্মার

অভিমান ত্যাগ করেছিলেন। এই ভাবে তিনি কোঙ্ক বেঙ্কট কুটক ও দক্ষিণ কর্ণাটক দেশে উপস্থিত হয়ে কুটকাচলের উপবনে মুখে একটি পাথর নিয়ে উন্মাদের মতো মুক্ত কেশ ও নগ্ন বেশে বিচরণ করতে লাগলেন। বায়ুবেগে বাঁশ গাছের সংঘর্ষে দাবানল উৎপন্ন হয়ে সেই বনের সঙ্গে ঋষভকেও ভস্মীভূত করল।

ঋষভ তাঁর পুত্রদের উপদেশ দিতেন যে মনীষীরা মহতের সেবাকে মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সঙ্গ নরকের দ্বার বলে বর্ণনা করেন। যাঁরা সদাচারসম্পন্ন, সর্বত্র সমচিত্ত, প্রশান্ত স্বভাব, ক্রোধ বর্জিত ও সকল প্রাণীর সুহৃৎ, মহৎ তাঁরাই। পূর্ব জন্মের যে পাপের জন্য এই অনিত্য দেহের উৎপত্তি হয়েছে, এ জন্মে পুনরায় তা করা সমীচীন নয়। জীব যত দিন আত্ম তত্ত্বজিজ্ঞাসু না হয়, তত দিন অজ্ঞানতার জন্য তার স্বরূপের পরাভব ঘটে। বাসুদেবের প্রতি প্রীতি না জন্মালে দেহ বন্ধন থেকে মুক্তি নেই। স্ত্রীপুরুষের যুগল ভাবকে পরস্পরের একটি স্থূল ও দুশ্ছেদ্য হৃদয় গ্রন্থি বলা হয়ে থাকে। এই ভাব থেকে 'আমি ও আমার' এই মোহ জন্মায়। এই অহঙ্কার গ্রন্থিটি শিথিল হলেই জীব মুক্ত হয়ে পরম পদ লাভ করে। যিনি সংসারীকে ভক্তি মার্গের উপদেশ দিয়ে মুক্ত না করেন, তিনি গুরু নন, স্বজন নন, পিতামাতা পতিও নন, দেবতাও নন।

এই ঋষভদেব যে জৈন ধর্মের আদি পুরুষ আদিনাথ, তার প্রমাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতেই আছে। এতেই বলা হয়েছে যে কলিযুগে অধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেলে কোক বেঙ্কট ও কুটক দেশের রাজা অর্হৎ লোক পরম্পরায় ঋষভদেবের এই আশ্রমাতীত আচরণের কথা শুনবেন। পূর্ব জন্মের পাপে মোহিত হয়ে তিনি ঐ আচরণ ধর্ম মনে করে শিক্ষা করবেন এবং লোক সমাজে একটি বেদ বিরোধী ও নিকৃষ্ট কুমার্গের প্রবর্তন করবেন।

এ কালের পুরাণকার জৈন ধর্মকে বেদবিরোধী ও হিন্দু ধর্মের পরিপন্থী মনে করে এই ভাবে তার নিন্দা করেছেন। কিন্তু একটু

মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের ৫৮০০ বৎসরেরও বেশি পূর্বে তিনজন চিন্তাশীল ব্যক্তি জীবের মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছিলেন। কৈলাস পর্বতে শিব গৃহী হয়েও শ্মশানচারী যোগীর জীবন যাপন করেছিলেন, কপিল সমুদ্র তীরে পাতালবাসী হয়ে প্রকৃতি ও পুরুষকে সৃষ্টির কারণ মনে করে ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করেন নি এবং ঋষভ কর্মক্ষয়ের জন্য অজগব ব্রত অবলম্বন করে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছিলেন। মহেঞ্জোদরোর মাটি খুঁড়ে সিন্ধু সভ্যতার যে নিদর্শন আমরা আবিষ্কার করেছি, তাতে এই তিন মহাপুরুষেব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। আমরা সেকালেব যোগ সাধনা ও লিঙ্গ পূজার সমাদরের প্রমাণ পেয়েছি। বৃষভ শিবের বাহন, বৃষভ ও ঋষভ একই শব্দ। যিনি বৃষভবাহন, তিনি শিব না ঋষভদেব, তা নির্ধারণ করবার মতো কোন সূত্র এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভরত

ঋষভের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতের রাজ্যকাল ৫৮৩৭ থেকে। তিনি বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেছিলেন। সুমতি রাষ্ট্রভৃৎ সুদর্শন আবরণ ও ধূম্রকেতু নামে তাঁর পাঁচটি পুত্র জন্মে। তাঁর সময় থেকেই এই দেশ ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হয়েছে। তিনি স্বধর্মনিষ্ঠ হয়ে বাৎসল্য সহকারে প্রজাপালন করেছিলেন। দীর্ঘকাল রাজত্ব ভোগের পর পুত্রদের মধ্যে রাজত্ব ভাগ করে দিয়ে পুলহাশ্রমে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

ভরতের সম্বন্ধে কয়েকটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি একটি হরিণ শিশুর মায়ায় আত্মচিন্তায় বিমুখ হয়েছিলেন। পরজন্মে তিনি জাতিস্মর হরিণ হয়ে জন্মেছিলেন। তার পরের জন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মান এবং এইটিই তাঁর শেষ জন্ম। এ জন্মেও তাঁর পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ থাকায় তিনি জড়ের মতো আচরণ করতেন এবং জড়

ভরত নামে পরিচিত হন। কিন্তু এ সব ইতিহাসের বিষয় নয় বলেই এ কাহিনী এখানে অবান্তর।

ভরতের পর রাজা হয়েছিলেন তাঁর পুত্র সুমতি। তারপর ইন্দ্রদ্যুম্ন। বায়ু পুবাণের মতে এই দুজনের মাঝে তৈজস নামে আব একজন রাজা ছিলেন। এই ভাবে পরমেষ্ঠী প্রতিহার প্রতিহর্তা উন্নেতা ভুব উদ্‌গীথ একের পর এক রাজা হয়েছিলেন। উন্নেতাব নাম বিষ্ণুপুরাণে নেই, আছে বায়ু পুরাণে। উদ্‌গীথ বাজা হয়েছিলেন ৫৬২০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তবেব শেষ পর্যন্ত তিনিই বাজা ছিলেন এবং স্বারোচিষ মন্বন্তরেরও প্রথম চার বছব তিনিই রাজত্ব করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বারোচিষ মন্বন্তর

(৫৫৯৯ থেকে ৫২৪২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত)

স্বরোচি, সুরথ

উদ্‌গীথের পর প্রস্তাব বিভু পৃথু নক্ত গয় নর বিরাট মহাবীর্য ধীমান মহান্ত মনস্যু ত্বষ্টা তুষ্টু বিরজ ও রজ এই পনর রাজা একে একে রাজত্ব করেন। এঁদের মধ্যে বিভুর নাম বিষ্ণু পুরাণে নেই, আছে বায়ু পুরাণে। আবার তুষ্টুর নাম বায়ু পুরাণে নেই, আছে বিষ্ণু পুরাণে। পৃথু বলে যে রাজার নাম পাওয়া যায়, তিনি বেণের পুত্র বিখ্যাত পৃথু নন। বিরাটও মহাভারতের বিরাট নন। এই ভাবে ত্বষ্টাও বিশ্বকর্মা নন, এঁর কোন কীর্তির কথাও পুরাণে নেই। গয় ও নর রাজারও কোন উপাখ্যান পাওয়া যায় না।

এই মন্বন্তরের নাম স্বারোচিষ কেন হল, এই কথা ভেবেই আশ্চর্য হতে হয়। এ যাবৎ স্বারোচিষ নামের কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যায় নি। বিষ্ণু পুরাণে মন্বন্তরের নাম স্বারোচিষ হবার কোন প্রসঙ্গ নেই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে স্বরোচি নামে এক ব্যক্তির উপাখ্যান। তাঁর পুত্রের নাম দ্যুতিমান। এঁরই নামে মন্বন্তরের নাম হয়েছে স্বারোচিষ। এই উপাখ্যানটি সত্য ঘটনার উপরে ভিত্তি করে, না সম্পূর্ণ কল্পিত, তা বলা যায় না।

স্বরোচি

শুধু স্বরোচির কথা নয়, তাঁর জন্মের বৃত্তান্তও আছে মার্কণ্ডেয় পুরাণে। সংক্ষেপে সেই কাহিনী এই রকম। অরুণাস্পদ নগরে বরুণা নদীর তটে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি ছিলেন অশ্বিনী

কুমারের চেয়েও রূপবান, সচ্চরিত্র, বেদ বেদাঙ্গ পারগ ও অতিথি পরায়ণ। তাঁর ইচ্ছা হল পৃথিবী দর্শন করবার। একদিন তাঁর গৃহে এক অতিথি এলেন। তাঁকে নানা দেশের কথা শোনাতেই ব্রাহ্মণ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বললেন, আপনি তো বৃদ্ধ নন, যৌবনও বেশি দিন গড়ায় নি। অথচ এরই মধ্যে আপনি কী ভাবে পৃথিবী পর্যটন করলেন? অতিথি বললেন, মন্ত্রৌষধি বলে আমার অপ্রতিহত গতি। অর্ধেক দিনে আমি সহস্র যোজন চলতে পারি। ব্রাহ্মণ তাঁর কথায় বিশ্বাস করে সাদরে বললেন, সমস্ত পৃথিবী দর্শন করতে আমারও খুব ইচ্ছা। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন। তাতে সেই উদার বুদ্ধি ব্রাহ্মণ তাঁকে পাদলেপ লাগিয়ে দিলেন এবং ব্রাহ্মণ অনুলিপ্ত পায়ে হিমালয়ের দিকে চললেন। হিমালয়ের সানুদেশে পৌঁছে বরূথিনী নামে এক অপ্সরার সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ব্রাহ্মণকে দেখে অপ্সরার মনে অনুরাগ জন্মাল। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরে গেলেন। ব্রাহ্মণের বিরহে বরূথিনী তাঁর যৌবনেরই নিন্দা করতে লাগলেন।

এদিকে কলি নামের এক গন্ধর্ব ইতিপূর্বেই বরূথিনীর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু বরূথিনী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই বারে কলি সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পেরে সেই ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে এগিয়ে এলেন এবং দুজনে নানা মনোহর স্থানে আহ্লাদে বিহার করতে লাগলেন। বরূথিনীর গর্ভ সঞ্চার হলে কলি বিদায় নিলেন এবং যথাসময়ে প্রজ্জ্বলিত পাবক প্রতিম প্রভায় সূর্যের মতো চারিদিক উদ্ভাসিত করে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। সূর্যের মতো স্বরোচিঃ বা স্বয়ংপ্রভা বলে তার নাম হল স্বরোচি।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে পুরাণকার স্বরোচিকে ব্রাহ্মণের পুত্র বলেন নি, অথচ অপ্সরা মাতার ধারণা যে এই পুত্র ব্রাহ্মণের সন্তান। মনে হয় যে ব্রাহ্মণকে সচ্চরিত্র রাখার জন্যই এই রকমের একটা গোঁজামিল দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, স্বরোচি চন্দ্রের ন্যায়

বর্ধিত হতে লাগলেন এবং যৌবনে পদার্পণ করে বেদ ধনুর্বেদ ও সমস্ত বিদ্যা অর্জন করলেন।

বলা বাহুল্য যে বেদ রচনার কথা এখনও জানা যায় নি। তবে বেদ যে অপৌরুষেয় এবং ব্রহ্মাই বেদের রচয়িতা, তা আমাদের জানা আছে। বেদ রচনার কথা পরে আলোচিত হবে।

স্বরোচি এক দিন মন্দর পর্বতে বিচরণ করতে করতে এক ভয়াতুরা কন্যাকে দেখতে পেলেন। কন্যা তাঁকে দেখেই বললেন, আমাকে রক্ষা কর। স্বরোচি তাঁকে অভয় দিয়ে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করলে কন্যা বললেন, আমি বিদ্যাধর কন্যা মনোরমা, দুই সখীর সঙ্গে আমি কৈলাস পর্বতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক ঋষিকে দেখলাম, তপস্যায় তাঁর শরীর অতি কৃশ। ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ ও চোখ কোটর গত। আমি হেসে ফেলতেই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, তুমি আমাকে উপহাস করলে! অচিরে রাক্ষস তোমাকে অভিভূত করবে। শাপের কথা শুনেই আমার সখীরা অনুযোগ করল, ধিক্ আপনাকে! ব্রাহ্মণের ধর্ম ক্ষমাশীলতা এবং ক্রোধ জয়েই তাঁর তপস্যা। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে তপস্যায় আপনার কোন ফল হয় নি। এই কথা শুনে ঋষি তাঁদেরও শাপ দিলেন, একজনের কুষ্ঠ হবে, অন্য জনের হবে ক্ষয় রোগ। তৎক্ষণাৎ তাদের তাই হয়েছে এবং এক রাক্ষস আমাকে অনুসরণ করে আসছে। আমাকে রক্ষা করলে আমি তোমাকে অস্ত্রগ্রাম হৃদয় বিদ্যা দেব। এই বিদ্যা শিখে দুরাত্মা রাক্ষসকে তুমি বধ কর। বলে তাকে সেই বিদ্যা দান করলেন।

ইতিমধ্যে রাক্ষস এসে মনোরমাকে গ্রহণ করতেই স্বরোচি ক্রুদ্ধ হয়ে অস্ত্র ধারণ করলেন। রাক্ষস তখনই মনোরমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, তুমি আমাকে শাপমুক্ত করলে। আমিই এর পিতা ইন্দীবরাক্ষ বিদ্যাধর, আড়ালে থেকে আমি ব্রহ্মমিত্র ঋষির অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শিখেছিলাম বলে তিনি আমাকে শাপ দিয়েছিলেন। আমি

ক্ষমা চাইলে বলেছিলেন যে নিজের কন্যাকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হলেই আমি শাপমুক্ত হব। আজ তুমি আমাকে উদ্ধার করেছ। এইবার আমার একটা প্রার্থনা তোমাকে রাখতে হবে। আমি তোমার হাতেই আমার এই কন্যাকে সম্প্রদান করতে চাই। এই বলে সেই বিদ্যাধর স্বরূপ ধারণ করে স্বরোচিকে কন্যাদান করলেন এবং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদও দিয়ে ফিরে গেলেন।

স্বরোচি মনোরমাকে নিয়ে তাঁর সখীদের কাছে গিয়ে ঔষধ ও রস প্রয়োগ করে উভয়কেই নীরোগ করলেন। ব্যাধি মুক্ত হয়ে একজন বললেন, আমিও বিদ্যাধর কন্যা বিভাবরী। এই উপকারের জন্য আমি তোমাকে আত্মদান করছি এবং তোমাকে এমন বিদ্যা দেব যে তার প্রভাবে তুমি সমস্ত প্রাণীর ভাষা অনায়াসে বুঝতে পারবে। অন্য জন বললেন, আমি পার ঋষির কন্যা কলাবতী, অপ্সরা আমার মা। আমার জন্মের পরেই মা আমাকে ফেলে রেখে চলে যান, পিতার কাছেই আমি বড় হয়েছি। তারপর অলি নামে এক অসুর আমাকে বিয়ে করতে চাইলে পিতা সম্মত হন নি। তাই সে তাঁকে হত্যা করে। আমি আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু শিবের পত্নী সতী আমাকে প্রতিষেধ করে বলেন, তুমি শোক কোরো না, স্বরোচি তোমার স্বামী হবেন এবং তাঁর পুত্র রূপেই জন্মাবেন মনু। যে বিদ্যার বলে এই রকম ঘটবে, সেই পদ্মিনী বিদ্যা তিনি আমাকে দিয়েছেন। তুমি নিশ্চয়ই স্বরোচি। তুমি আমাকে বাঁচালে বলে আমি তোমাকে আমার দেহ ও সেই বিদ্যা দিচ্ছি। স্বরোচি বিভাবতী ও কলাবতী উভয়েরই পাণি গ্রহণ করলেন। তারপর তিন পত্নীর সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন।

একদিন এক কলহংসী চক্রবাকীকে বলল, স্বরোচিই ধন্য। সংসারে কোন পতি পত্নীকে ভালবাসেন, অথবা পত্নী পতিকে ভালবাসেন। কিন্তু এঁদের মতো দম্পতির পরস্পর অনুরাগ দুর্লভ। চক্রবাকী বলল, না, তা নয়। সকলের প্রতি এঁর মন নেই।

নিশ্চয়ই ইনি বিদ্যার মূল্য স্বরূপ দাসের মতো নিজেকে বিক্রয় করেছেন। স্বরোচি প্রাণীর ভাষা বুঝতেন বলে লজ্জিত হলেন।

বহুকাল পরে তিনি এক মৃগকে দেখলেন। নিজেকে মৃগী পরিবেষ্টিত দেখে সে বলল, তোমরা আমাকে স্বরোচি পাও নি। এক স্ত্রী অনেক পুরুষের অনুগত হলে যেমন অবজ্ঞার পাত্রী হয়, তেমনি এক পুরুষ অনেক স্ত্রীর ভোগের সামগ্রী হলেও হাস্যাস্পদ হয়। স্বরোচি মৃগের কথা বুঝতে পেরে নিজের আত্মাকে পতিতের মতো বোধ করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই পত্নীদের সঙ্গে মিলিত হয়েই সে কথা ভুলে গেলেন।

তাঁর তিনটি পুত্র হল। মনোরমার পুত্র বিজয়, বিভাবরীর পুত্র মেরুনন্দ ও কলাবতীর পুত্র প্রভাব। স্বরোচি বিজয়কে প্রাচী দিকে কামরূপের পর্বতের উপরে এক পুর দিলেন। মেরুনন্দকে উদীচী দিকে নন্দবতী নামে এক পুরী দিলেন এবং প্রভাবকে দিলেন দক্ষিণাপদে তাল নামে এক পুর। তারপর তাঁর পত্নীদের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন।

একদিন অরণ্যে এক বরাহ দেখে স্বরোচি যখন তাঁর ধনু আকর্ষণ করলেন, তখন এক হরিণাঙ্গনা এসে বলল, ওকে নয়, তুমি আমাকে বধ কর। স্বরোচি আশ্চর্য হয়ে বললেন, তুমি কেন প্রাণ দিতে চাও? মৃগী বলল, আমি যাকে চাই, সে অন্যের প্রতি আসক্ত। তাই মৃত্যু ছাড়া আমার আর কোন গতি নেই। স্বরোচি বলল, তুমি কাকে চাও? মৃগী বলল, তোমাকে। আমাকে আলিঙ্গন করলেই আমি সম্মানিত বোধ করব। স্বরোচি সেই হরিণাঙ্গনাকে আলিঙ্গন করতেই সে দিব্য দেহ ধারণ করল। স্বরোচি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? তিনি লজ্জিত ভাবে বললেন, আমি এই অরণ্যের দেবতা। দেবতারা আমাকে মনুর জন্ম দিতে বলেছেন, তাই আমি তোমাকে মনুর জন্ম দিতে বলছি।

দ্যুতিমান তাঁদেরই পুত্র। স্বরোচির পুত্র বলে ইনিই স্বারোচিষ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা তাঁকে মনুর পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

স্বরোচির সম্বন্ধে আরও কিছু কথা আছে। স্বরোচি একদিন গিরি নির্ঝরে বিহার করতে করতে এক হংস দম্পতীকে দেখতে পেলেন। হংসী বারংবার হংসের প্রতি অভিলাষ পরবশ হওয়ায় হংস তাকে বলল, আর কেন, আত্মাকে এবারে সংযত কর। তুমি স্বরোচিকে দেখছ না! কী ভাবে সে উদ্ধার পাবে! আমার বিবেক জন্মেছে, তাই ভোগ সুখে নিবৃত্ত হয়েছি। এই কথা বুঝতে পেরে স্বরোচির উদ্বেগ হল, তিনি পত্নীদের নিয়ে তপশ্চরণের জন্য তপোবনে গেলেন এবং কঠোর তপস্যা করে অমর লোকে গেলেন।

স্বারোচিষের সম্বন্ধে কোন কথা নেই পুরাণে। তবে এই কাহিনী থেকে জানা যাচ্ছে যে স্বারোচিষ স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে জন্মান নি। অরণ্যে তাঁর জন্ম এবং কতকটা রহস্যাবৃত। এর মধ্যে কতটা সত্য ও কল্পনা কতটা, তা বলে দেবার দরকার নেই। কিন্তু এই কাহিনী যে সে কালে জনপ্রিয় ছিল, তার প্রমাণ এই যে কাল গণনার প্রয়োজনে স্বারোচিষ নামটিই গ্রহণ করা হয়েছিল।

সুরথ

মার্কণ্ডেয় পুরাণে আর একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীর সুরথ রাজা। দেবী মাহাত্ম্যের প্রারম্ভেই আছে, স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্র বংশের সুরথ সমস্ত পৃথিবীর রাজা হয়েছিলেন। কোলা বিধ্বংসী নৃপতিরা তাঁর বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হল এবং তাদের সঙ্গে রাজা সুরথের যুদ্ধ উপস্থিত হল। সেই নৃপতিরা হীনবল হয়েও রাজা সুরথকে পরাজিত করে। তিনি নিজের রাজধানীতে ফিরে এসে নিজের দেশের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কিন্তু সেই বলবান বৈরীরা সেখানে এসে পুনরায় তাঁকে আক্রমণ করলে তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর দুষ্ট ও দুরাত্মা অমাত্যরা তাঁর কোষ ও বল অপহরণ

করল। এই ভাবে তাঁর প্রভুত্ব অপহৃত হলে তিনি মৃগয়ার জন্য অশ্বারোহণ করে একাকী গহন বনে গমন করলেন।

সেখানে মহর্ষি মেধসের আশ্রম তাঁর চোখে পড়ল। সেই আশ্রম শান্ত স্বভাবের শ্বাপদে পরিবেষ্টিত ও শিষ্য পরম্পরায় পরিশোভিত। মুনি তাঁর সৎকার করলে তিনি কিছুকাল সেখানে অতিবাহিত করলেন। সে সময়ে তিনি আশ্রমে ইতস্তত বিচরণ করতেন। মমতায় মন আকৃষ্ট হওয়াতে তিনি সারাক্ষণ ভাবতেন, আমার পূর্ব পুরুষের পুর আর আমার অধিকারে নেই। আমার দুর্বৃত্ত ভৃত্যরা তা ধর্মানুসারে পালন করছে কিনা জানি না। যারা নিত্য আমার প্রসাদ ধন ও খাদ্য গ্রহণ করে আমার আনুগত্য করত, তারা নিশ্চয়ই এখন অন্য রাজাদেরও তাই করছে। তারা ব্যয় করতেও জানে না, নিশ্চয়ই তারা সতত ব্যয় করে আমার কষ্টে সঞ্চিত কোষ ক্ষয় করে ফেলছে।

একদিন তিনি সেই আশ্রমের নিকটে এক বৈশ্যকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? কেন এখানে এসেছ, আর কেনই বা তোমাকে শোকান্বিত ও দুর্মনার ন্যায় দেখছি? বৈশ্য প্রশ্রয়াবনত হয়ে উত্তর দিলেন আমার নাম সমাধি, ধনী বৈশ্য বংশে আমার জন্ম। কিন্তু আমার অসাধু স্ত্রী পুত্রেরা ধনের লোভে আমাকে পরিত্যাগ করেছে, ধনও নিয়ে নিয়েছে। আপ্ত বন্ধুরাও আমাকে ত্যাগ করেছে বলে আমি মনের দুঃখে বনে এসে এখানেই আছি। আমার স্ত্রী পুত্র স্বজনবর্গ ভাল আছে না মন্দ, তা জানি না। তাদের গৃহে লাভ হচ্ছে না ক্ষতি, আয় হচ্ছে না অপচয়, তারা সদাশয় না দুরাচারী হয়েছে, তারও কোন সংবাদ অবগত নই। রাজা বললেন, যে স্ত্রী পুত্ররা ধনের লোভে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের জন্য তোমার মন কেন স্নেহপ্রবণ হচ্ছে? বৈশ্য বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমার মন কিছুতেই দয়াহীন হচ্ছে না। যারা আমার ধনে লুব্ধ হয়ে পিতৃস্নেহ স্বজন-স্নেহ ও স্বামী-স্নেহ

ত্যাগ করে আমাকে নিরাকৃত করেছে, আমার মন তাদেরই প্রতি স্নেহপ্রবণ হচ্ছে। বন্ধুরা আমার প্রতিকূল হয়েছে জেনেও আমার মন তাদেব জন্য প্রেমপ্রবণ হচ্ছে। এটা কী তা বুঝতে পাবি না। তাদের কুব্যবহারেই আমি মনের দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছি। আমার প্রতি তাদের প্রীতির লেশ নেই, অথচ আমার মন তাদের প্রতি নিষ্ঠুর হচ্ছে না। আমি কী করব জানি না।

এর পর রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য একত্রে মেধস ঋষির নিকটে সমাগত হয়ে প্রণাম করে বসে কথোপকথন আরম্ভ করলেন। রাজা বললেন, আমার মন আয়ত্ত নয়, তাই যে বিষয়ে দুঃখের কারণ হয়েছে, তার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। আমার রাজ্য প্রভৃতি যে কিছুই নয়, তা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু এই জানা সত্ত্বেও অজ্ঞানের মতো তাতে আমাব মমতার সঞ্চার হচ্ছে। আর এই বৈশ্যকে তার স্ত্রী পুত্র ও ভৃত্যরা পরিত্যাগ করেছে এবং স্বজনেরা একে তাড়িয়ে দিয়েছে। তবু তাদের প্রতি এর সৌহার্দ্য আছে। বিবেকান্ধ হলে যেমন মোহের আবেশ হয়, আমাদেরও সেই রূপ ঘটেছে। এর কারণ কী?

ঋষি বললেন, সমস্ত প্রাণীরই আহার ও বিহার বিষয়ে এক রকম জ্ঞান আছে। এই জ্ঞান থাকলেই যদি জ্ঞানী হওয়া যায় তো তোমরাও জ্ঞানী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। সমস্ত বিষয় পৃথক শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট। মানুষ জ্ঞানী সত্য, কিন্তু শুধু তারাই জ্ঞানী নয়। তার কারণ পশুপক্ষীরও সাধারণ জ্ঞান আছে। পাখীরা নিজে ক্ষুধার্ত হয়েও মোহবশে খাবারের কণা তাদের শাবকের চঞ্চুতে দেয়। আবার মানুষও লোভবশতঃ প্রত্যুপকার পাবার আশায় নিজেরা না খেয়ে পুত্রদের খাওয়ায়। এ সব কথা জেনে শুনেও লোকে যে মমতার আবর্তে ও মোহের গর্তে পড়ে নানা ভাবে সংসার বিস্তার করে। মহামায়ার প্রভাবই তার কারণ। এতে বিস্ময় প্রকাশ করা উচিত হয়।

রাজা বললেন, মহামায়া কে, কী রূপে উৎপন্ন হন ও কী করেন, তাঁর স্বভাব ও স্বরূপ কেমন এবং কোথা থেকে তাঁর উদ্ভব হল, এ সব কথা আপনার প্রসাদে শুনতে চাই।

এই প্রশ্নের উত্তরেই মেধস ঋষি মহামায়া ভগবতীর কথা বললেন। তাঁর জন্ম মৃত্যু নেই, তিনি চিরকালই আছেন। এই জগৎ তাঁর মূর্তি এবং তিনি সর্বব্যাপী হয়ে আছেন। তবু তিনি দেবতাদের কার্য সিদ্ধির জন্য বার বার সমুৎপন্ন হন। কল্পান্তে বিষ্ণু যখন নাগ শয্যায় যোগ নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, তখন তাঁর কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুর উদ্ভূত হয়ে ব্রহ্মাকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছিল। ব্রহ্মার স্তবে যোগনিদ্রা বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করলে বিষ্ণু জাগ্রত হয়ে ছলনায় তাদের বধ করেছিলেন।

কারও কর্ণমল থেকে অসুরের জন্ম হতে পারে না। তাই এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলা কোন মতেই চলে না। মেধস ঋষি এর পরে দেবীর মহিষাসুর বধের কাহিনী বললেন। পুরাকালে দেবাসুরের শতাব্দী ব্যাপী যুদ্ধ হয়েছিল। তাতে মহিষাসুর অসুরদের ও পুরন্দর দেবতাদের আধিপত্যে নিয়োজিত হলেন। অসুররা দেবসৈন্যকে পরাজিত করে। তাতে মহিষাসুর সমস্ত দেবতাকে জয় করে ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত হন। এ দিকে দেবতারা পরাজিত হয়ে ব্রহ্মাকে নিয়ে বিষ্ণু ও মহাদেবের নিকটে গিয়ে সমস্ত ঘটনা তাঁদের গোচরে আনলেন। এতে শিব ও বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হলেন। তার পর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের মুখ থেকে তেজ নির্গত হল। ইন্দ্রাদি দেবতাদের শরীর থেকেও তেজ নির্গত হয়ে মিলিত হল এবং সেই সম্মিলিত তেজ থেকেই দেবীর আবির্ভাব হল। দেবী মহিষাসুরকে বধ করলেন।

এ ঘটনাও যে কাল্পনিক তা বলা বাহুল্য। তবে একটি কথা প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ এই ঘটনায় পারম্পর্য রক্ষা হয় নি। দেবতা ও অসুরদের যে শতাব্দী ব্যাপী যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তা সুরথ রাজার পূর্বে সংঘটিত হয় নি। এই যুদ্ধ বৈবস্বত মন্বন্তরের ঘটনা অর্থাৎ

৩৮৩৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পরে এই যুদ্ধ হয়েছিল এবং যে স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ বিদ্যমান ছিলেন তা শেষ হয়েছে ৫২৪২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। দেবতা ও দৈত্যরা কশ্যপের সন্তান। তাঁদের মাতামহ দক্ষ বিদ্যমান ছিলেন চাক্ষুষ মন্বন্তরের শেষের দিকে। দৈত্যদের বংশাবলী বিচার করে দেখা যায় যে মহিষ নামের দৈত্য ছিলেন হিরণ্যকশিপুর পৌত্র, তাঁর দ্বিতীয় পুত্র অনুহ্লাদের কনিষ্ঠ পুত্র। প্রহ্লাদের ভ্রাতুষ্পুত্র। এর জন্য নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ঐতিহাসিক মহিষের কথা মেধস ঋষি বলেন নি, যা বলেছেন তা কোন কল্পিত মহিষের কথা। মহিষের সেনাপতিদের নাম ছিল চামর, চিক্ষুর, মহাহনু, অসিলোমা, বাস্কল ও বিড়ালাক্ষ। এদের মধ্যে বাস্কল ঐতিহাসিক মহিষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পুরাণেই আছে যে বাস্কল ধার্মিক ছিলেন এবং স্বর্গ অধিকার করেও ইন্দ্রকে তা ফিরিয়ে দেন। সেকালে দেবতাদের সঙ্গে দৈত্য ও দানবদের যে যুদ্ধ হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে, তার কথা যথাস্থানে বলা হবে।

মেধস ঋষি বলেছিলেন যে মহিষাসুরের পর দেবী শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করেন। তার পূর্বে তিনি এই দৈত্যদের সেনাপতি ধূম্রলোচন চণ্ড মুণ্ড ও রক্তবীজকে বধ করেন। পুরাণে দৈত্য বা দানবদের বংশে এই সব নাম পাওয়া যায় না বলে মনে হয় যে এই যুদ্ধটিও কল্পিত হয়েছে, কিংবা এই রকমের কিংবদন্তী সেকালে প্রচলিত ছিল এবং তা সত্য বলে মনে করা হত।

এই তিনটি যুদ্ধের কাহিনী শেষ করে মেধস ঋষি রাজা সুরথকে বললেন, এই দেবীই জগৎ ধারণ করে আছেন এবং তিনিই আপনাকে ও এই বৈশ্যকে এবং অন্যান্য বিবেকী ব্যক্তিদের যেমন জ্ঞান দান করেন, তেমনি মোহিত করেও রাখেন। অনেকে মোহিত হয়ে আত্মবিস্মৃত হয়। তাঁর আরাধনা করেই লোকে স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্ত হয়।

রাজা সুরথ ঋষির এই কথা শুনে তাঁকে প্রণাম করলেন। মমতা

ও রাজ্য অপহরণের দুঃখে তাঁর নির্বেদ উপস্থিত হয়েছিল। তিনি তপশ্চরণের জন্য প্রস্থান করলেন। বৈশ্যেরও নির্বেদ জন্মেছিল। তিনিও তাঁর পথবর্তী হলেন। তাঁরা উভয়ে দেবীর দর্শনের জন্য নদীর তীরে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হলেন এবং দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে উপাসনা করতে লাগলেন। কখনও আহার ত্যাগ করে, কখনও বা আহার সংযম করে, সমাধিস্থ হয়ে তদ্গত চিত্তে নিজেদের শরীরের রক্ত দেবীর উদ্দেশে বলি স্বরূপ দান করতে লাগলেন। এই ভাবে তিন বৎসর আরাধনার পর দেবী তাঁদের সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, তোমরা যা প্রার্থনা করছ তা পাবে।

রাজা সুরথ এই বর চাইলেন, আমি যেন পর জন্মে রাজ্যচ্যুত না হই এবং ইহ জন্মেও যেন শত্রু দমন করে নিজের অপহৃত রাজ্য উদ্ধার করতে পারি। এর পর বৈশ্য সমাধি এই প্রার্থনা করলেন, আমার মন মমতায় বদ্ধ হওয়াতে আমি নির্বেদ গ্রস্ত হয়েছি। যাতে এই মমতার কারণ আসক্তির বিনাশ হয়, আমার যেন সেই জ্ঞান লাভ হয় এবং আমি যেন প্রজ্ঞাবান হতে পারি।

দেবী বললেন, রাজা, স্বল্পকালের মধ্যেই তোমার রাজ্য লাভ হবে। তুমি সমস্ত শত্রু বিনাশ করে রাজ্য চিরস্থায়ী করতে পারবে। তাছাড়া তুমি দেহাবসানে সূর্যের পুত্র হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে সাবর্ণিক নামে মনু হবে। বৈশ্যকে বললেন, তোমাকেও আমি বর দিলাম, তুমি জ্ঞান লাভ করে সিদ্ধি সমাধান করবে। দেবী এই বর দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। দেবীর বরেই সুরথ সূর্যের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে সাবর্ণি মনু হয়েছিলেন।

রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের কাহিনী দেবী ভাগবতেও আছে। পঞ্চম স্কন্ধে মহিষাসুর এবং শুম্ভ ও নিশুম্ভের উপাখ্যানের পর রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের বৃত্তান্ত। মেধস ঋষি বন্ধন ও মুক্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্য কাহিনীর অবতারণা করেছেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করতে তিনি শিবকে এনেছেন। বলেছেন

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবও দেবীর কুহকে ভুলে বার বার এই সংসারে ভ্রমণ করেছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতো দেবী ভাগবতেও সুরথ রাজার ও সমাধি বৈশ্যের দেবী দর্শন হয়েছিল। দেবী তাঁদের বর দিয়ে অন্তর্হিতা হলে রাজা যখন মুনিকে প্রণাম করে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন, তখন তাঁর অমাত্য ও প্রজারা এসে বলল, নিজ পাপে আপনার শত্রুরা বিনষ্ট হয়েছে। আপনি ফিরে চলুন। এই কথা শুনে রাজা তাদের সঙ্গে ফিরে গেলেন এবং সসাগরা পৃথিবী ভোগ করতে লাগলেন।

সুরথ রাজা বা তাঁর বংশের কোন রাজার নাম অন্যত্র পাওয়া যায় না। মনু বংশে তাঁর জন্ম নয়। তবু তাঁকে ঐতিহাসিক রাজা বলেই মনে হয়। দেবী ভাগবতে তাঁর কথা এই ভাবে বলা হয়েছে। স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। পর্বতবাসী ম্লেচ্ছরা সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য লাভের জন্য অকারণে তাঁর শত্রু হয়ে উদ্ধত ভাবে তাঁর নগরী ধ্বংস করবার জন্য উপস্থিত হল। তাদের সৈন্য অল্প হলেও দৈব বশে তারা রাজাকে পরাজিত করল। নীতিজ্ঞ বুদ্ধিমান রাজা রণে ভঙ্গ দিয়ে তাঁর সুরক্ষিত নগরে এসে ভাবলেন যে তাঁর মন্ত্রীরাও যখন শত্রুর বশীভূত, তখন তারা তাঁকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিতে পারে। তাদের কোন মতে বিশ্বাস করা উচিত নয় ভেবে তিনি একাকী অশ্বারোহণে নগর থেকে নির্গত হয়ে গহন বনে উপস্থিত হলেন। অনুসন্ধান করে তিনি জানলেন যে তিন যোজন দূরে নদীর তীরে সুমেধা মুনির আশ্রম আছে। রাজা সেই বেদধ্বনি মুখর আশ্রম দেখে আনন্দিত হলেন এবং শত্রুভয় ত্যাগ করে সেখানেই বিশ্রাম নিতে মনস্থ করলেন।

কাহিনীর আরম্ভ ও শেষ দেখে মনে হয় যে এটি ঐতিহাসিক কাহিনী। এই কাহিনীর মধ্যে দেবী মাহাত্ম্য যুক্ত করা হয়েছে। পুরাণ রচনার রীতি অনুসারে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে না দিলে মানুষ ইতিহাস মনে রাখবে না, এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল সেকালের পুরাণ-কারের। কথাটা যে মিথ্যা নয়, এখন তা মানতেই হয়। ইতিহাস আমরা মনে রেখেছি। ইতিহাস বলে নয়, তা ধর্মের কথা বলেই। ধর্মের কথা সযত্নে আলাদা করতে পারলেই ইতিহাসকে আমরা খুঁজে পাব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঔত্তমি মন্বন্তর

(৫২৪২ থেকে ৪৮৮৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)

উত্তানপাদ, ধ্রুব, উত্তম, অঙ্গ ও বেণ

স্বারোচিষ মন্বন্তরের শেষ রাজা ঔত্তমি মন্বন্তরের প্রথম দিকেও রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পরে প্রিয়ব্রত বংশের আর দুজন রাজা রাজত্ব করেন। তাঁদের নাম শত্রজিৎ ও বিশ্বগ্‌জ্যোতি। ৫১৮৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এই বংশ শেষ হয়ে যায় এবং উত্তানপাদ রাজা হন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে পুরাণে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ দুজনেই স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র রূপে পরিচিত। কিন্তু মনে হয় যে তাঁরা দুই ভাই ছিলেন না। উত্তানপাদও মনুর বংশে জাত বলেই বোধহয় তাঁকে মনুর পুত্র বলা হয়েছে। এই অনুমান বিষ্ণু পুরাণের দ্বিতীয় অংশে প্রথম অধ্যায়ের শেষ তিনটি শ্লোক সমর্থন করে।

উত্তানপাদ ও ধ্রুব

উত্তানপাদের সুনীতি ও সুরুচি নামে দুই পত্নী। সুনীতি সুরুচির মতো রাজার প্রিয় হতে পারেন নি। সুনীতির পুত্রের নাম ধ্রুব এবং উত্তম সুরুচির পুত্র। রাজা এক দিন উত্তমকে কোলে নিয়ে আদর করছিলেন। এমন সময় ধ্রুব তাঁর কোলে উঠতে চাইলে তিনি তাঁকে আদর করলেন না। সুরুচি সগর্বে বললেন, তুমি রাজার পুত্র হয়েও রাজার আসনে আরোহণের যোগ্য নও। তার জন্যে আমার পেটে তোমাকে জন্মাতে হত। ধ্রুব এই কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে নিজের মায়ের কাছে গেলেন। সুনীতি অন্তঃপুরে সুরুচির দুর্বাক্যের কথা শুনেছিলেন। চোখের জল ফেলে তিনি বললেন, পরকে দুঃখ দিলে নিজেকেই দুঃখ পেতে হয়। তোমার বিমাতা

ঠিকই বলেছেন, রাজার আসনে বসবার ইচ্ছা থাকলে ভগবানের আরাধনা কর।

ধ্রুব এই কথা শুনে পিতৃগৃহ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। নারদ এসে তাঁব মাথায় হাত রেখে বললেন, ধ্রুব, এখন তুমি বালক, এ তোমার খেলার বয়স। তোমার পক্ষে ভগবানকে পাওয়া এখন সম্ভব নয়। ধ্রুব বললেন, আমার মনে যে দুঃখ তাতে আমি আপনার উপদেশ মানতে পারব না। আমার পিতা বা পিতামহর চেয়েও বড পদ আমি চাই, তা পাবার পথ আমাকে বলে দিন। নাবদ বললেন, তবে তুমি যমুনার তীরে মধুবনে যাও, হরি সেখানে আছেন।

এই কাহিনী শ্রীমদ্‌ভাগবতেব। বিষ্ণু পুবাণে সপ্তর্ষি ধ্রুবকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন। সপ্তর্ষির একত্র সমাবেশ সম্ভব মনে হয় না। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবতের কাহিনীই বেশি বিশ্বাসযোগ্য। ধ্রুব যমুনাব দিকে চলে গেলে নাবদ উত্তানপাদের অন্তঃপুবে প্রবেশ করলেন এবং রাজার অর্ঘ গ্রহণ করে বললেন, ম্লান মুখে আপনি কী ভাবছেন? বাজা বললেন, স্ত্রীর বশীভূত হয়ে আমি আমার পাঁচ বছরের ছেলে ও তার মাকে নির্বাসিত করেছি। সেই বালক এখন ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে কী করছে জানি না। হয়তো কোন হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলবে। নাবদ বললেন, তার জন্য চিন্তা করবেন না। দেবতারা তাকে রক্ষা করছেন। তার যশ এক দিন জগতে ব্যাপ্ত হবে।

এদিকে ধ্রুব মধুবনে উপস্থিত হয়ে হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর কঠোর তপস্যা দেখে হরি তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, তোমাকে আমি দুষ্প্রাপ্য স্থান দিচ্ছি। আকাশের জ্যোতিশ্চক্রে সপ্তর্ষি এই স্থানে প্রদক্ষিণ করছেন। তোমার পিতা এখন তোমার হাতে পৃথিবীর ভার দিয়ে বনে যাবেন। বলে তিনি ফিরে গেলেন।

বিষ্ণু পুরাণে ধ্রুবের কাহিনীর শেষ এইখানেই। কিন্তু শ্রীমদ্‌-ভাগবতে তা হয় নি। হরির কাছে বর পাবার পর ধ্রুব পিতৃগৃহে

ফেরার পথ ধবলেন। কিন্তু ভগবানেব কাছে মুক্তি প্রার্থনা করেন নি বলে তাঁর মনস্তাপ উপস্থিত হল। ভাবলেন যে বহু জন্মের সাধনায় ঋষিবা যা জানতে পাবেন, ছয় মাসে তিনি তা জেনেও ভেদ দৃষ্টিব বশে অধঃপতিত বয়ে গেলেন।

এদিকে ধ্রুব ফিবে আসছেন শুনে রাজা উত্তানপাদ তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে গেলেন। সুনীতি ও উত্তমকে নিয়ে সুরুচি শিবিকারোহণে চললেন। ধ্রুব উপবনেব নিকটে এলে রাজা বথ থেকে নেমে তাঁকে আলিঙ্গন কবলেন। ধ্রুবও মাতা পিতা ও বিমাতাকে প্রণাম কবলেন। সুরুচিও ধ্রুবকে আলিঙ্গন করে বললেন, দীর্ঘজীবী হও। উত্তম ও ধ্রুবও পরস্পর আলিঙ্গন করলেন।

ধ্রুব যৌবনে পদার্পণ করলে উত্তানপাদ দেখলেন যে প্রজারা ধ্রুবেব অনুবক্ত। অমাত্যগণও সম্মত। তাই ধ্রুবকেই বাজ্যের ভার দিয়ে বনে গেলেন। প্রজাপতি শিশুমারের কন্যাকে ধ্রুব বিবাহ কবেছিলেন। তাঁব গর্ভে কল্প ও বৎসর নামে দুই পুত্রেব জন্ম হয়। তিনি বায়ুব কন্যা ইলাকেও বিবাহ করেন। অকৃতদার উত্তম একদা মৃগয়ার জন্য হিমাচলে গেলে এক যক্ষ তাঁকে বধ করে। তাঁর মাতাও পুত্রের দশা প্রাপ্ত হন। ধ্রুব ভ্রাতার নিধন বার্তায় ক্রোধে ক্ষোভে ও শোকে অভিভূত হয়ে বথারোহণে যক্ষালয়ের দিকে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি অলকাপুরী দেখতে পেয়ে শঙ্খধ্বনি করতেই যক্ষ বীররা তাঁকে আক্রমণ করল। তারপর তারা মায়া যুদ্ধ আবম্ভ করলে ধ্রুব নারায়ণাস্ত্র সন্ধান করলেন। তাতে সমস্ত মায়া বিনষ্ট হল। ধ্রুব নিরপরাধ যক্ষদের বধ করছেন শুনে তাঁর পিতামহ মনু ঋষিদের সঙ্গে এসে বললেন, ক্রোধ পাপে পূর্ণ ও নরকের দ্বার স্বরূপ। তাই নিন্দিত কাজ থেকে নিবৃত্ত হও। দেহকে আত্মা মনে করে পশুরা যেমন পরস্পরকে বধ করে, তুমিও তেমনি একজন যক্ষের অপরাধে বহু যক্ষ বধ করেছ। কুবেরের কোন অনুচর তোমার ভাইকে বধ

করে নি। পরমেশ্বরই জীবের সৃষ্টি ও সংহারের কারণ। তুমি তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ কর, আত্মদর্শী হয়ে নির্গুণ আত্মার অন্বেষণ কর। তিনি নির্বিরোধ অন্তঃকরণে সর্বদাই আছেন। ভেদ জ্ঞানের জন্যই তাঁকে এই অসৎ বিশ্ব প্রতীয়মান হয়। মনু তাঁর পৌত্র ধ্রুবকে এই উপদেশ দিয়ে ঋষিদের নিয়ে ফিরে গেলেন। ধ্রুবও তাঁর পুরীতে ফিরে এলেন।

এর পর তিনি বহু যজ্ঞ করে প্রচুর দক্ষিণা দিলেন। ছত্রিশ বৎসর পৃথিবী শাসন করবার পর পুত্রকে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে বদরিকাশ্রমে গেলেন। তিনি সেখানে সমাধিস্থ হয়ে দেখলেন সুনন্দ ও নন্দ নামে হরির দুই পার্ষদ আকাশ থেকে রথ নিয়ে নামলেন। বললেন, আমরা তোমাকে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র যে স্থান প্রদক্ষিণ করে সেই স্থানে নিয়ে যেতে এসেছি। ধ্রুব বললেন, দুঃখিনী মাকে ছেড়ে আমি কেমন করে যাব! তাঁরা ধ্রুবকে দেখিয়ে দিলেন যে তাঁর মা বিমানে আরোহণ করে তাঁর আগে যাচ্ছেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন। ধ্রুব বিমানে ত্রিলোক ও সপ্তর্ষি মণ্ডল অতিক্রম করে বিষ্ণু লোকে উপস্থিত হলেন।

এই কাহিনীতে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা হল, ধ্রুব উপেক্ষিত হয়েও নিজের চেষ্টায় রাজা হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন জ্ঞানে ও গুণে। উত্তানপাদের পর তিনিই রাজা হয়েছিলেন এবং ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করবার পর তাঁর পুত্রকে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে বাণপ্রস্থে গিয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে তাঁর রাজত্ব করার কথা নেই, কিন্তু শিষ্টি ও ভব্য নামে দুই পুত্রের মধ্যে শিষ্টির রাজা হবার কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর যে পুত্রদের নাম আছে, পরবর্তী কালে সে নামের কোন রাজা ছিলেন না। পরবর্তী রাজা শিষ্টি। শিষ্টির পর প্রাচীন গর্ভ, উদারধী ও দিব্যঞ্জয় ক্রমান্বয়ে রাজা হয়েছিলেন, কিন্তু এই তিনটি নাম বায়ু পুরাণে পাওয়া যায়। বিষ্ণু পুরাণে নেই। দিব্যঞ্জয়ের পর রিপু ও চক্ষু। চক্ষুর পুত্র চাক্ষুষ মনু।

উত্তম

শ্রীমদ্‌ভাবগতের মতে উত্তানপাদের পুত্র উত্তম অকৃতদার ছিলেন এবং হিমাচলে মৃগয়া করতে গিয়ে যক্ষের হাতে নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে যে এই উত্তম একজন মহাবলশালী ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তিনি বভ্রুর কন্যা বহুলার পাণি গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্রের নামও উত্তম এবং এঁরই নামে ঔত্তমি মন্বন্তর। উত্তান-পাদের পুত্র উত্তমের নামে একটি কাহিনীও মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে।

রাণী বহুলা যেমন অতি প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তেমনি রাজাও সেই সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁর শ্রুতিকটু বাক্যও রাজার নিকটে মধুর মনে হত এবং যৎপরোনাস্তি অপমানও সম্মান বলে মনে করতেন। রাজা উৎকৃষ্ট আভরণ দিলেও রাণী তা অবজ্ঞা করতেন। একদিন রাজা মদ্য পানের সময়ে এক পাত্র রাণীর হাতেও দিলেন। সেখানে প্রধান বারাঙ্গনারা গান গাইছিল। ভূমিপালরাও সমবেত ছিলেন। সবার সামনে রাজা এই পানপাত্র রাণীর হাতে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা দেখলেন যে রাজার প্রতি বীতরাগ বশে রাণী তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এর জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা দ্বারপালকে ডেকে বললেন, তুমি এঁকে বনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে এসো। দ্বারপাল কোন বিচার না করে রাণীকে রথে চড়িয়ে বনে ছেড়ে দিয়ে এল। রাজার দৃষ্টির বাহিরে গিয়ে রাণী এটা পরম অনুগ্রহ বলে মনে করলেন। কিন্তু রাজা দুঃখে আর দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করলেন না, তাঁরই চিন্তায় মগ্ন থেকে ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

একদিন সুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে বললেন। রাত্রে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। ঘরের দ্বার ছিল খোলা। এই সুযোগে কেউ আমার স্ত্রীকে হরণ করে নিয়ে গেছে। অনুগ্রহ করে আপনি তাঁকে এনে দিন। রাজা বললেন, আপনি তো জানেন না, কে আপনার স্ত্রীকে হরণ করে কোথায় নিয়ে গেছে। কার বিরুদ্ধে যাত্রা করে কোথা থেকে আপনার স্ত্রীকে আনব? ব্রাহ্মণ বললেন, রাত্রে

কপাট বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকলে কেউ যদি কারও স্ত্রীকে হরণ করে, আপনি কি তা জানতে পারেন! আমাদের কাছে আপনি যে ষড় ভাগ নেন, সেই বেতন নিয়ে সবাইকে রক্ষা করেন। তাইতেই তো আমরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই। রাজা বললেন, আপনার স্ত্রীকে আমি কখনও দেখি নি। তাই তাঁর বয়স দেহ রূপ ও স্বভাব চরিত কেমন তাই বলুন। ব্রাহ্মণ বললেন, তাঁর দেহ উন্নত। বাহু হ্রস্ব, মুখ কৃশ, চোখ কঠোর ও রূপ বিরূপ। আমি তাঁর নিন্দা করছি না, তিনি বাস্তবিকই কুরূপ, অতিশয় অপ্রিয়দর্শন। তাঁর কথাও কর্কশ ও সুশীলা নন। তাঁর প্রথম বয়স কিছু অতীত হয়েছে। রাজা বললেন, এ রকম স্ত্রীর আর আপনার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে অন্য স্ত্রী এনে দেব। স্ত্রী সর্বলক্ষণ যুক্ত হলেই সুখ এবং আপনার স্ত্রীর মতো হলেই দুঃখ। সুন্দর রূপ ও সুশীলতা এই দুটিই কল্যাণের কারণ। তাই রূপ ও শীলবিহীন হলে স্ত্রীকে ত্যাগ করাই বিধেয়। ব্রাহ্মণ বললেন, রাজা, স্ত্রীকে রক্ষা করা যে সর্বথা কর্তব্য, এই লোক-প্রবাদ কি প্রচলিত নেই? আত্মা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, তাই স্ত্রীকে রক্ষা করাই কর্তব্য। যার স্ত্রী নেই, তার সারাক্ষণ কর্মহানি হয়। এই জন্যই আমার স্ত্রীর রূপ গুণ আপনাকে বললাম। আপনি তাকেই এনে দিন।

এ কথা শোনবার পর রাজা রথে আরোহণ করে পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। এক সময় অরণ্যে এক রমণীয় তপোবন দেখে সেখানে নেমে দেখলেন যে একজন ঋষি কুশাসনে বসে নিজের তেজে যেন জ্বলছেন। রাজাকে দেখে তিনি উঠে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে শিষ্যকে অর্ঘ্য আনতে বললেন। শিষ্য তাঁকে ধীরে ধীরে বলল, এঁকে কী রকম অর্ঘ্য দেওয়া হবে আজ্ঞা করুন। ঋষি রাজার বৃত্তান্ত অবগত হয়ে সম্মান ও আসন দিয়ে সম্মান রক্ষা করে বললেন, আমি জানি আপনি উত্তানপাদের পুত্র উত্তম। কী অভিপ্রায়ে এখানে এসেছেন বলুন। রাজা বললেন, কোন ব্যক্তি এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে

হরণ করে নিয়ে গেছে। তার কোন বৃত্তান্ত আমার জানা নেই। তবু আমি তারই অন্বেষণে এখানে এসেছি। আপনাব গৃহে আমি অভ্যাগত। তাই প্রণাম করে যা জিজ্ঞাসা কবছি, অনুগ্রহ কবে আপনাকে তা বলতে হবে। ঋষি বললেন, শঙ্কা ত্যাগ কবে প্রশ্ন করুন। বাজা বললেন, প্রথম দর্শনেই আপনি আমাকে অর্ঘ্য দানে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু কেন তা দেওয়া হল না? ঋষি বললেন, আপনাকে দেখেই আমি পূবাপব না ভেবে মনেব আবেগে শিষ্যকে আজ্ঞা করেছিলাম। এই শিষ্য আমাবই প্রসাদে জগতেব যাবতীয় ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ঘটনা আমার মতোই বিদিত আছে। তাই সে 'আজ্ঞা করুন' বলাতেই আমার চৈতন্য হয়। সেই জন্যই আমি আপনাকে বিধান অনুসারে অর্ঘ্য দিই নি। আপনি স্বায়ম্ভুব বংশে জন্মে অর্ঘ্যের যোগ্য পাত্র হলেও আমরা আপনাকে অর্ঘ্যযোগ্য মনে করি না। রাজা বললেন, আমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এমন কী কবেছি যে বহু কাল পবে এসেও অর্ঘ্যেব যোগ্য হলাম না? ঋষি বললেন, আপনি কি ভুলে গেছেন যে আপনি আপনার পত্নীকে অরণ্যে ত্যাগ করেছেন! আপনি শুধু পত্নীকে নয়, সেই সঙ্গে ধর্মও ত্যাগ করেছেন। এক পক্ষ নিত্য কর্ম না করলেই লোকে অস্পৃশ্য হয়, আব আপনি এক বৎসর নিত্য কর্ম করেন নি। স্বামী দুঃশীল হলেও পত্নীকে যেমন অনুকূলচাবী হতে হয়, তেমনি স্ত্রী দুঃশীল হলেও তাকে পোষণ করা স্বামীর কর্তব্য। সেই ব্রাহ্মণকে দেখুন, ধর্মের জন্যই তিনি প্রতিকূল-চারী স্ত্রীকে ফিরে পাবার জন্য উৎসুক হয়েছেন। আপনি রাজা, উৎপথে প্রবৃত্ত লোককে আপনি স্বধর্মে আনেন, কিন্তু নিজে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে লোকে আপনাকে মানবে কেন? ঋষির এই কথায় রাজা অপ্রতিভ ও লজ্জিত হয়ে বললেন, আপনি যখন জগতের সব অতীত ও অনাগত দেখতে পান তখন বলুন ব্রাহ্মণের পত্নীকে কে হরণ করে নিয়ে গেছে। ঋষি বললেন, অদ্রির পুত্র বলাক রাক্ষস সেই ব্রাহ্মণীকে হরণ করছে, আপনি উৎপলাবতক অরণ্যে তাঁকে

আজ দেখতে পাবেন। সেখানে গিয়ে শীঘ্র আপনি ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সংযোগ সাধন করুন। ব্রাহ্মণকে যেন আপনার মতো পাপের ভাগী না হতে হয়।

ঋষিকে প্রণাম করে রাজা রথারোহণে উৎপলাবতক বনে সমাগত হলেন। দেখলেন যে ব্রাহ্মণ যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী অবিকল সেই রূপ। তিনি শ্রীফল খাচ্ছিলেন দেখে রাজা বললেন, স্পষ্ট বলুন তো, আপনিই কি বিশালেব পুত্র সুশর্মার পত্নী? ব্রাহ্মণী বললেন, আমি অতিরাতের কন্যা এবং যে নাম করলেন সেই বিশালের পুত্রই আমার স্বামী। নিদ্রিত অবস্থায় দুরাত্মা বলাক রাক্ষস আমাকে হরণ করে এনে এই বনে ছেড়ে দিয়েছে। সে আমাকে ভক্ষণ করে নি, উপভোগও করে নি। কী জন্য এনেছে তা জানি না। রাজা বললেন, আপনার স্বামী আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনি কি জানেন, রাক্ষস আপনাকে ছেড়ে দিয়ে কোথায় গেছে? ব্রাহ্মণী বললেন, রাক্ষস এই বনেরই প্রান্তে আছে। বলে পথ দেখিয়ে দিলে রাজা সেই পথে বনে প্রবেশ করে দেখলেন যে বলাক তার পরিবারবর্গে বেষ্টিত হয়ে আছে। রাজাকে দেখবামাত্র তাড়াতাড়ি উঠে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে এগিয়ে এসে বলল, মহারাজ, আমার গৃহে পদার্পণ করে আপনি আমাকে অনুগ্রহ করেছেন। আমি আপনার রাজ্যে বাস করি। আপনার ভৃত্য। আপনি আমার প্রভু। এই আসনে বসে অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। তারপর আমি কী করব আজ্ঞা করুন। রাজা বললেন, অতিথি সৎকারে তোমার ত্রুটি হয় নি। এবারে তুমি বল, কেন তুমি এই ব্রাহ্মণের পত্নীকে হরণ করে এনেছ! যদি স্ত্রী চাও তো ইনি সুরূপা নন, সুরূপা রমণী অনেক আছে। আর যদি খাবার জন্য এনে থাকো তো কেন খাও নি? রাক্ষস বলল, অন্যান্য রাক্ষসরা মানুষ খায় বটে, কিন্তু আমরা মানুষ খাই না। আমরা পুণ্যের ফল খাই, সম্মানিত বা অপমানিত হলে নরনারীর স্বভাব ভক্ষণ করি। তাদের ক্ষমাগুণ ভক্ষণ করলে তারা ক্রুদ্ধ হয়। কিন্তু তাদের দূষিত স্বভাব ভক্ষণ করলে

তারা পুণ্যবাণ হয়। রাজা, আমাদের গৃহে অপ্সরার মতো সুন্দরী আছে, তাই নারীতে আমাদের আসক্তি নেই। রাজা বললেন, তবে ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করে কেন এঁকে হরণ করে এনেছ? রাক্ষস বলল, এঁর স্বামী মন্ত্র জানেন। আমি যে যজ্ঞেই যাই, তিনি রক্ষোঘ্ন মন্ত্র পাঠ করে সেখান থেকেই আমাকে উচ্চাটন করেন। তাতে আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। তিনি যদি সব যজ্ঞেই ঋত্বিক হন, তবে আমরা কোথায় যাব! পত্নীরা ছাড়া পুরুষ যজ্ঞেব যোগ্য হয় না বলেই আমি এই কাজ করেছি।

ব্রাহ্মণকে বিকল কবা হয়েছে শুনে রাজা বিষণ্ণ হলেন। তিনি ভাবলেন যে রাক্ষস তাঁকেও নিন্দা কবছে। কিন্তু রাক্ষস পুনরায় তাঁকে প্রণতি করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলল, আমাকে আজ্ঞা করে অনু-গৃহীত করুন। রাজা বললেন, তুমি স্বভাব ভক্ষণ কর বললে, আজ এই ব্রাহ্মণীর দুঃশীলতা ভক্ষণ করে তাঁকে তাঁর গৃহে রেখে এসো। রাক্ষস তখনই মায়ার বলে ব্রাহ্মণীর অন্তরে প্রবেশ করে তাঁর দুঃশীলতা ভক্ষণ করতেই ব্রাহ্মণী বললেন, এই রাক্ষসের দোষ নেই। অপরাধ কারও নয়। অন্য জন্মে আমিই বোধ হয় কারও বিরহ যোগ সাধন করেছিলাম, তাই এ জন্মে আমার নিজেরই তা ঘটল। রাক্ষস রাজাকে বলল, আপনার আদেশে আমি এঁকে এঁর স্বামীর গৃহে নিয়ে যাচ্ছি। আর কী করতে হবে বলুন। রাজা বললেন, তাতেই আমার সকল কাজ কবা হবে। পবে তোমাকে স্মরণ করলে এসো। 'যে আজ্ঞা' বলে বাক্ষস ব্রাহ্মণীকে তাঁর স্বামীর গৃহে পৌঁছে দিল।

এর পর রাজা তাঁর কী করা উচিত তা জানবার জন্য রথে চড়ে সেই ত্রিকালদর্শী ঋষির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। রথ থেকে নেমে ঋষিকে প্রণাম করে তাঁকে রাক্ষসের বৃত্তান্ত বললেন। ঋষি বললেন, আমি সবই জানি এবং আমার কাছে কেন এসেছেন তাও জানি। আপনাকে যা করতে হবে তা বলছি। স্ত্রী ধর্মার্থ কাম পুরুষের শক্তি। তাঁকে ত্যাগ করে আপনি ধর্মত্যাগী হয়েছেন। অপত্নীক মানুষ নিজ

কর্মের যোগ্য হয় না। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রে কোন প্রভেদ নেই। পত্নীকে ত্যাগ করে আপনি ভাল কাজ করেন নি। স্বামী যেমন স্ত্রীর অত্যাজ্য, তেমনি স্ত্রী ত্যাগ করাও স্বামীর কর্তব্য নয়। রাজা বললেন, আমার কর্ম বিপাকেই এই অশোভন সংঘটন হয়েছে। আমি অনুকূল হলেও সে প্রতিকূল ছিল এবং বিরহ যন্ত্রণার ভয়েই আমি সব জ্বালা সহ্য করেছিলাম। সম্প্রতি তাকে বনে পাঠিয়েছি। সে কোথায় গেছে, না বাঘ সিংহ বা রাক্ষসের পেটে গেছে, তা জানি না। ঋষি বললেন, রাজা, কেউ তাকে ভক্ষণ করে নি। পাতিব্রত্য রক্ষা করে তিনি এখন রসাতলে আছেন। রাজা বললেন, কে তাকে পাতালে নিয়ে গেল? কেমন করেই বা সে শুদ্ধাচারী হয়ে সেখানে বাস করছে? ঋষি বললেন, আপনি তাকে অরণ্যে ত্যাগ করলে পাতালের নাগরাজ কপোতক তাঁকে দেখতে পান। সমস্ত ঘটনা জানবার পর তিনিই অনুরাগ ভরে আপনার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে পাতালে নিয়ে গেছেন। নাগরাজের স্ত্রীর নাম মনোরমা এবং নন্দা তাঁদের কন্যা। পাছে তার মায়ের সপত্নী হন, এই ভয়ে সেই কন্যা আপনার স্ত্রীকে অন্তঃপুরে গোপন করে রেখেছেন। পিতার প্রার্থনায় উত্তর না দেওয়ার জন্য পিতা তাঁকে 'মূক হও' বলে শাপ দিয়েছেন। রাজা হর্ষাবিষ্ট হয়ে বললেন, সকলেই তো আমাকে অকৃত্রিম ভালবাসেন। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসা সত্ত্বেও কেন সে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে? ঋষি বললেন, পাণি গ্রহণের সময় আপনার প্রতি সূর্য মঙ্গল ও শনির দৃষ্টি এবং আপনার স্ত্রীর প্রতি শুক্র ও বৃহস্পতির দৃষ্টি ছিল। সেই মুহূর্তেই আপনার দিকে চন্দ্র ও আপনার স্ত্রীর দিকে বুধ ছিলেন। এঁরা পরস্পর বিপক্ষ ভাবে আপনাদের বিরুদ্ধে অবস্থিতি করেছিলেন। এই জন্যই আপনাদের এ অনিষ্ট হয়েছে। তাই এখন আবার পত্নী সহায় হয়ে ধর্ম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে পৃথিবী পালন করুন। ঋষির এই কথা শুনে তাঁকে প্রণাম করে রাজা ফিরে এলেন।

স্বনগরে ফিরে রাজা দেখলেন যে ব্রাহ্মণ তাঁর সুশীলা পত্নীর সহবাসে পরম হর্ষে আছেন। ব্রাহ্মণ বললেন, আমি কৃতার্থ হয়েছি। আপনি ধর্মজ্ঞ, তাই আমাব পত্নীকে এনে দিয়ে ধর্ম বক্ষা করেছেন। বাজা বললেন, আপনি নিজেব ধর্ম পালন করে কৃতার্থ হয়েছেন। কিন্তু আমাব গৃহ গৃহিণীশূন্য বলে আমি বড় সঙ্কটে পডেছি। ব্রাহ্মণ বললেন, আপনি ক্রোধের বশে ধর্মের হানি কবেছেন। কিন্তু অরণ্যে যদি বাণীকে কোন পশু ভক্ষণ করে থাকে তো আপনি আবাব কেন দাব পরিগ্রহ করছেন না? বাজা বললেন, সে বেঁচে আছে এবং তার চবিত্রও দূষিত হয নি। তাই আমি এখন কী কবব? ব্রাহ্মণ বললেন, তবে কেন তাঁকে পবিত্যাগ কবে পাপের অনুষ্ঠান কবছেন? বাজা বললেন, তাকে ফিবিয়ে আনলেও আমাব প্রতি সে সর্বদা প্রতিকূল ব্যবহাব করবে। তাতে দুঃখ ছাডা সুখ হবে না। সে যাতে আমার বশ হয়, আপনি সেই ব্যবস্থা করুন। ব্রাহ্মণ বললেন, মিত্রকাম পুরুষেরা যে অনুষ্ঠান করেন, আমি সেই যজ্ঞ কবব। এর নাম মিত্র বিন্দা। এতেই রাণী আপনার প্রতি প্রীতিমতী হবেন।

বাজা বহুবিধ দ্রব্য এনে দিলে ব্রাহ্মণ যজ্ঞ কবলেন। সাতবার যজ্ঞ করার পর রাজাকে বললেন, এইবাব আপনি রাণীকে এনে ভোগ সম্ভোগ ও যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। বাজা তখন সেই রাক্ষসকে স্মরণ করলেন। তৎক্ষণাৎ রাক্ষস রাজার নিকটে এসে প্রণিপাত করে বলল, আজ্ঞা করুন। রাজা তাকে সব কথা বলতেই সে পাতালে গিয়ে রাণীকে নিয়ে এল। বাণী রাজাকে দেখে আহ্লাদিত হয়ে অতি প্রণয় ও প্রীতি সহকারে বার বার বলতে লাগলেন, আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। রাজা সাগ্রহে ও সানুরাগে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, আমি প্রসন্ন হয়েই আছি। রাণী বললেন, নাগবাজ তাঁর কন্যা আমার সখীকে আমার জন্যই শাপ দিয়েছেন। তাতে সে মূক হয়ে আছে। তার মূকত্বের শান্তির জন্য প্রতিক্রিয়া করুন। রাজা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই মূকত্বের শান্তির জন্য কোন্ ক্রিয়ার

অনুষ্ঠান করা যেতে পারে? ব্রাহ্মণ বললেন, আপনার আদেশে আমি সারস্বতী নামের যজ্ঞ করব। তাতেই আপনার পত্নী ঋণমুক্ত হবেন।

তারপর ব্রাহ্মণ সেই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়ে সমাহিত চিত্তে সারস্বত মুক্ত জপ করতে লাগলেন। তাতেই নাগরাজ কন্যার বাক্ শক্তি ফিরে এলে গর্গ তাঁকে বললেন যে তোমার সখার স্বামীই এই দুষ্কর উপকার করলেন। এই কথা জেনেই নন্দা দ্রুতবেগে এসে রাণীকে আলিঙ্গন করে রাজাকে বললেন, আপনি আমার যে উপকার করলেন তাতে আমার হৃদয় আকৃষ্ট হয়েছে। আমি বলছি, আপনাব এক বীব পুত্র জন্মাবে, তার চক্র সমগ্র ভুবনে অপ্রতিহত হবে। সে সর্ব শাস্ত্রে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে ধর্মানুষ্ঠানে তৎপর হবে এবং মন্বন্তবের ঈশ্বর ও মনু হবেন। নন্দা তাঁদের এই বর দিয়ে সখীকে আলিঙ্গন কবে পাতালে ফিবে গেলেন।

এ দিকে পত্নীর সঙ্গে বিহার ও প্রজাপালন করে রাজার বহুকাল অতীত হল। তারপর এক পূর্ণিমায় রাজার এক পুত্র জন্মাল। আকাশ থেকে দেব দুন্দুভির সঙ্গে পুষ্প বৃষ্টি হল। মুনিরা এসে তাঁর নামও উত্তম রাখলেন। তাঁরা বললেন যে এই পুত্র উত্তম বংশে উত্তম সময়ে উত্তম কলেবরে জন্মেছেন বলে উত্তম নামেই বিখ্যাত হবেন।

উত্তমের এই পুত্রই উত্তম নামে মনু হয়েছিলেন। এঁর অজ পরশুচি ও দিব্য প্রভৃতি নামে সাত পুত্র হয়েছিল। তপস্যার তেজে তাঁরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। বিষ্ণু ও বায়ু পুবাণে উত্তানপাদের বংশে এঁদের কেউ রাজা হয়েছিলেন বলে দেখা যায় না।

সবিস্তারে উত্তমের কাহিনী বর্ণনার বিশেষ তাৎপর্য আছে। প্রথমেই লক্ষ্য করা যেতে পারে যে এই মন্বন্তরের আরম্ভ ৫২৪২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এবং উত্তানপাদের কাল ৫১৮৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। ধ্রুব ৫১৬১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন মনে করলে উত্তম তার পরে রাজা হয়ে থাকবেন। পূর্বে হয়ে থাকলেও দেখা যাচ্ছে যে তাঁর পুত্রের নামে

ঔত্তমি মন্বন্তর পরবর্তী কালের সংজ্ঞা অর্থাৎ এই মন্বন্তর আরম্ভ হবার সময় উত্তম নামে কেউ ছিলেন না।

এই কাহিনী থেকে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থারও একটি চিত্র পাওয়া যায়। প্রতিকূলাচারী বা কুরূপা স্ত্রীও পরিত্যাজ্যা নয়। তাতে ধর্ম নষ্ট হয়, সমাজে নিন্দিত হতে হয়। অপহৃতা বা পরিত্যক্তা স্ত্রীকে গ্রহণ করার কোন সামাজিক বাধা নেই। ব্রাহ্মণ বিনা প্রশ্নে কোন দ্বিধা না করে তাঁর অপহৃতা পত্নীকে গ্রহণ করেছেন। ক্ষত্রিয় রাজা তা করেছেন স্ত্রী দূষিত হন নি জেনে। রাক্ষসদেরও একটা পরিচয় আমরা পাই। তারা অরণ্যবাসী, তাদের সংসারে সুন্দরী কন্যার কোন অভাব নেই। তারা বিনয়ী ও বাধ্য। তাদের মধ্যে নরখাদক ছিল, কিন্তু সকলে নরখাদক নয়। প্রাচীনকালে অনেক জায়গায় নরখাদক মানুষ ছিল বলে শোনা যায়। এরাই ভারতে রাক্ষস নামে পরিচিত ছিল। ঋষির কথা থেকে জানা যায় যে সে যুগেও দেশে জ্যোতিষের চর্চা ছিল এবং গ্রহ বিমুখতার প্রতিকারের জন্য যাগ যজ্ঞের ব্যবস্থা ছিল।

ধ্রুবের কাহিনীতে আমরা একটি বড় সত্য আবিষ্কার করি। ধ্রুব দেবতার বরে আকাশে জ্যোতিষ্ক লোকে স্থান পেয়েছেন। একটি নক্ষত্রের নাম হয়েছে ধ্রুব। এই ভাবে আরও অনেক স্মরণীয় ও পূজনীয় মানুষ দেবতার মতো আকাশে স্থান পেয়েছেন, তাঁদের নামে গ্রহ নক্ষত্রের নাম হয়েছে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি। গন্ধর্ব রাজা বিবস্বান সূর্য হয়েছেন এবং সোম বা সিদ্ধি হয়েছেন আনন্দের দেবতা চন্দ্র। এই ভাবেই মানুষ তার কর্মের জন্য প্রথমে দেবতা হয়েছেন ও পরে আকাশের জ্যোতিষ্ক লোকে স্থান পেয়েছেন। ধ্রুবের কাহিনীই এর প্রথম উদাহরণ। এর পর থেকে পুরাণকাররা অনেক মানুষকে দেবতায় পরিণত করেছেন এবং অনেক দেবতাকে আকাশে স্থান দিয়েছেন প্রাকৃতিক শক্তির আধার রূপে। বেদে এই কথার সমর্থন আছে ছড়িয়ে।

অঙ্গ ও বেণ

রাজা চক্ষুর পুত্রের নাম মনু। কিন্তু ইনি ষষ্ঠ মন্বন্তরের অধিপতি চাক্ষুষ মনু হন নি। যে চাক্ষুষের নামে মন্বন্তর, তিনি ছিলেন রাজর্ষি অনমিত্রের জাতিস্মর পুত্র। যথা স্থানে তাঁর কাহিনী বলা হবে।

এঁর পর উরু রাজা হয়েছিলেন। উরুর পর অঙ্গ। বেণ অঙ্গের পুত্র। এঁর জন্মেব কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে। অঙ্গ ধর্মজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তখন দেবতারা আহূত হয়েও সেই যজ্ঞে আসেন নি। ঋত্বিকরা বিস্মিত হয়ে রাজাকে বললেন, এ জন্মে আপনার পাপ না থাকলেও পূর্ব জন্মের পাপের ফলে আপনি পুত্রহীন হয়েছেন। হরিব আরাধনায় আপনার পুত্র লাভ হবে। এই স্থির করে তাঁরা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পুবোডাশ আহুতি দিলেন। তাতে যজ্ঞের আগুন থেকে এক পুরুষ এক পাত্র পায়স নিয়ে উত্থিত হল। অঙ্গ সেই পায়স নিয়ে তাঁর পত্নী সুনীথাকে দিলেন। তিনি তা খেয়ে যথা সময়ে একটি পুত্র প্রসব করলেন। অধর্মের অংশে জন্ম এই পুত্রের নাম বেণ। মৃত্যু তাঁর মাতামহ।

বাল্যকাল থেকেই বেণ ধর্মহীন হলেন। ব্যাধের মতো ধনুর্বাণ নিয়ে বনে পশু বধ করে বিচরণ করতেন। খেলার সময়েও তিনি সঙ্গীদের নির্দয় ভাবে আক্রমণ করে পশুর মতো বধ করতেন। অঙ্গ এই পুত্রকে নানা ভাবে শাসন করেও সংযত করতে পারেন নি। এক দিন গভীর রাত্রে অঙ্গ সুনীথাকে পরিত্যাগ করে সকলের অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ করলেন। তাঁর অমাত্য পুরোহিত আত্মীয় ও প্রজারা শোকগ্রস্ত হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র খুঁজে বেড়ালেন। ব্যর্থ হয়ে তাঁরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেণকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন।

অতি উগ্র স্বভাব বেণ সিংহাসনে বসেছেন শুনেই দস্যুরা মূষিকের মতো আত্মগোপন করল। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত অবিনয়ী ও আত্মশ্লাঘাকারী হয়ে পূজনীয় ব্যক্তিদের অবমাননা করতে লাগলেন। তিনি স্বেচ্ছাচারী ও গর্বিত হয়ে রথারোহণে সর্বত্র বিচরণ করতে

লাগলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে দ্বিজরা যজ্ঞাদি ধর্মাচরণ করতে পারবে না। মুনিরা সত্র নামে এক যজ্ঞে সমবেত হয়ে স্থির করলেন যে সৎপরামর্শ দিয়ে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করতে হবে। বেণ যদি কথা না শোনেন, তাহলে তাঁরা নিজেদের তেজে তাঁকে দগ্ধ করবেন। এই স্থির করে তাঁরা নিজেদের মনের ভাব গোপন করে বেণের নিকটে গিয়ে বললেন, যে রাজার রাজ্যে প্রজারা নিজেদের ধর্ম পালন করে যজ্ঞেশ্বর হরির আরাধনা করেন, ভগবান সেই রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণেরা আপনার রাজ্যে নানা রকম যজ্ঞ করে হরির অংশ স্বরূপ দেবতাদের অর্চনা করেন, তাঁদের আপনি অবহেলা করবেন না। বেণ বললেন, আপনারা মূর্খ, তাই অধর্মকে ধর্ম মনে করছেন। আমাকে ছেড়ে আপনারা কুলটা নারীর উপপতি সেবার মতো হরির সেবা কেন করছেন? যজ্ঞ পুরুষ কে? সমস্ত দেবতাই তো রাজার দেহে বর্তমান। আপনারা আমারই অর্চনা করুন। ঋষিদের কথায় তিনি কর্ণপাত করছেন না দেখে তাঁরা অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই বেণকে বধ কর। এ জীবিত থাকলে এর পাপের আগুনে পৃথিবী দগ্ধ হবে। এই বলে ঋষিরা বেণকে বধ করলেন এবং পুত্রশোকাতুরা সুনীথা মন্ত্র শক্তিতে তাঁর দেহ রক্ষা করতে লাগলেন।

এর পর ঋষিরা দেখলেন যে তস্করেরা গৃহস্থের ধন অপহরণ করছে এবং রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ছে। অঙ্গের বংশ বিলুপ্ত হওয়া উচিত নয় ভেবে তাঁরা মৃত বেণের উরুদেশ মন্থন করে এক খর্বকায় পুরুষ পেলেন। তাঁর বর্ণ কৃষ্ণ, নাসিকা নিম্ন ও কেশ তাম্র বর্ণ। তিনি সবিনয়ে বললেন, আমাকে কী করতে হবে বলুন। ঋষিরা বললেন, তুমি নিষাদ অর্থাৎ উপবেশন কর। এই জন্য তিনি নিষাদ নামে পরিচিত হলেন এবং তার বংশধর নিষাদ জাতি বলে বনে জঙ্গলে বাস করতে লাগল।

ঋষিরা পুনরায় অপুত্রক বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করলে এক পুরুষ ও এক নারী উৎপন্ন হল। ঋষিরা বললেন, এই পুরুষ পৃথু নামে বিখ্যাত

রাজা হবেন এবং এই নারী অর্চি নামে তাঁর পত্নী হবেন। এঁরা হরি ও লক্ষ্মীর অংশে জন্মেছেন। তাঁর অভিষেকের সময় দেবতা ও প্রজারা এসে নানা দ্রব্য উপহার দিলেন। তারপর পৃথু সূত মাগধ ও বন্দীদের স্তবপাঠে উদ্যত দেখে বললেন, আমার তো কোন গুণই জগতে প্রকাশ পায় নি, কী নিয়ে আমার গুণগান করবে! তবুও গায়করা ঋষিদের আগ্রহে স্তব করলেন, আমরা হরির অংশাবতার পৃথুর উদার কীর্তি বর্ণনা করব। তিনি সকলকে ধর্মপথে পবিচালিত করবেন এবং ধর্মদ্বেষীদের শায়েস্তা করবেন। তিনি একশো অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন ইত্যাদি।

উপক্রমণিকা অংশে বেণ ও পৃথু সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের কাহিনী থেকে জানা যাচ্ছে যে বেণ ধার্মিক পিতার পুত্র, অঙ্গ যজ্ঞ করে বিষ্ণুর নামে আহুতি দিয়ে যে পায়স পেয়েছিলেন, তাই খেয়ে তাঁর রাণী বেণের জন্ম দেন। এর দুটি অর্থ হতে পারে—কোন ব্যক্তি যজ্ঞস্থলে এসে রাণীর জন্য ঔষধ মিশ্রিত পায়স প্রস্তুত করে দিয়েছিল, কিংবা অপুত্রক রাজা কোন বালককে দত্তক নিয়েছিলেন। বেণ অঙ্গের ক্ষেত্রজ পুত্রও হতে পারেন। সেই বালক দুরন্ত হয়ে উঠছে দেখে ঋষিরা তাঁকে অধর্মের অংশে জন্ম বলেছিলেন। কিন্তু বেণের দুরন্তপনার মধ্যে কোন অধর্মের কাজ ছিল না। খেলার সঙ্গীদের তিনি পশুর মতো বধ করতেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং এ কথা সত্য হলে রাজা অঙ্গ রাজপুত্রের দণ্ড বিধান করতেন, গভীর রাতে সবার অলক্ষ্যে তিনি গৃহত্যাগ করতেন না। পুরাণকার এই গৃহত্যাগের কারণ নির্ণয় করেন নি, অন্য পুরাণেও এ রকমের কথা নেই। তাই মনে হয় যে এর অন্য কোন কারণ আছে, যা পুরাণকার জানাতে চান নি। দেবতারা তাঁর যজ্ঞে আসেন নি, এই উক্তি অর্থবহ। এর থেকেই মনে হয় যে অঙ্গের সময় থেকেই বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল এবং দুর্বল প্রকৃতির রাজা ঋষিদের দমন করতে না পেরেই গৃহত্যাগ করতে বাধ্য

হয়েছিলেন। তাঁর পত্নী সুনীথা দুর্বল ছিলেন না বলেই মনে হয় যে তাঁকে মৃত্যুর কন্যা বলা হয়েছে। পুত্র বেণের মৃত্যুর পরে তিনিই রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন এবং মনে হয় যে তাঁর মৃত্যুর পরেই দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়।

বেণযে রাজা হবার অযোগ্য ছিলেন না, তার আরও একটি বড় প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণ হল এই যে অঙ্গের গৃহত্যাগের পরে তাঁর অমাত্য পুরোহিত আত্মীয় ও প্রজারা তাঁকে খুঁজে না পেয়ে বেণকেই রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। যদিও পুরাণকার বলেছেন যে এই কাজ তাঁরা অনিচ্ছা সত্ত্বেই করেছিলেন। কিন্তু বেণের যোগ্যতা অনস্বীকার্য। পুরাণকার বলেছেন যে উগ্র-স্বভাব বেণ সিংহাসনে বসেছেন শুনেই দস্যুরা মূষিকের মতো আত্মগোপন করেছিল। এই ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায় যে অঙ্গের রাজ্যে দস্যুদের উপদ্রব ছিল এবং অঙ্গ তাদের দমন করতে সক্ষম হন নি। পরাক্রান্ত বেণ দস্যুদের দমন করেও প্রশংসা লাভ করেন নি। তাঁকে অত্যন্ত উদ্ধত অবিনয়ী ও আত্মশ্লাঘাকারী বলা হয়েছে। কথাটা ঠিকই। যিনি শক্তিমান, তাঁর এই সব দোষ বা গুণ থাকা অসম্ভব নয়। তিনি স্বেচ্ছাচারী ও গর্বিত হয়ে রথারোহণে সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন। এটা রাজার গুণের কথা। নিজের রাজ্যে ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখা কোন দোষের কাজ নয়। তিনি পূজনীয় ব্যক্তিদের অবমাননা করতে লাগলেন। এ কথাও ঠিক বলে মনে হয়। অঙ্গ যাঁদের প্রশ্রয় দিয়ে ধার্মিক নাম পেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, বেণ যে তাঁদের অবমাননা করে ক্ষমতাচ্যুত করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বেণের সব চেয়ে বড় দোষের কথা বলা হয়েছে যে তিনি বিষ্ণুর নামে যজ্ঞ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা একে ধর্মাচরণ মনে করতেন, আর বেণ বললেন যে এটাই অধর্ম। দেশে একজন রাজা থাকতে অন্য দেশের রাজাকে ডেকে যজ্ঞের ভাগ বা কর দেওয়াই

অধর্ম। এর জন্যই বিবাদ, এর জন্যই ঋষিরা দলবদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র করে বেণকে হত্যা করলেন।

বেণের মাতা সুনীথা মন্ত্র শক্তিতে বেণের দেহ রক্ষা করতে লাগলেন। এর অর্থ, তিনিই রাজ কার্য পরিচালনা করছিলেন। তারপর তস্করেরা গৃহস্থের ধন অপহরণ করছে এবং রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ছে দেখে অমাত্য ও ঋষিরা প্রজাদের মধ্য থেকে নির্বাচন করে যাকে প্রতিপত্তিশালী পেলেন সে একজন নিষাদ জাতির আদিবাসী। তাকে পছন্দ হল না বলে তাঁরা সেনাপতিদের মধ্য থেকে পৃথুকে নির্বাচন করলেন। একই সঙ্গে তাঁর রাজ্যাভিষেক ও বিবাহ হল। এই সময়েই রাজসভায় নিযুক্ত হল সূত ও মাগধ নামের ইতিহাস রক্ষক। মাগধরা রাজার বংশবলী রক্ষা করে এবং সূতরা তা বিভিন্ন রাজ দরবার থেকে সংগ্রহ করে ঋষিদের যজ্ঞ সভায় পাঠ করে। এই ঋষিদের মধ্যেই আছেন পুরাণকার। সেই সময়ের বিচারে বেণ অধর্ম করেছিলেন এবং বুদ্ধিমান পৃথু রাজা হবার গৌরবে পুরাতন ধ্যান ধারণাকেই মেনে নিয়েছিলেন।

পৃথুই ঔত্তমি মন্বন্তরের শেষ রাজা। এই মন্বন্তর শেষ হবার দশ বৎসর আগে তিনি রাজা হন এবং পরবর্তী তামস মন্বন্তরের প্রথম দিকেও তিনি রাজত্ব করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তামস মন্বন্তর

(৪৮৮৫ থেকে ৪৫২৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে)

তামস, পৃথু, মহাপ্লাবন ও প্রচেতা

তামস

তামস নামের কোন ব্যক্তিকে এর পূর্বে পাওয়া যায় নি। তিনি কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তা জানবারও উপায় নেই। তবে মার্কণ্ডেয় পুরাণে চতুর্থ মনু তামসের উপাখ্যান আছে। মার্কণ্ডেয় ঋষি বলেছেন, পৃথিবীতে স্বরাষ্ট্র নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। যুদ্ধে তিনি কখনও পরাজিত হন নি। তিনি পরম জ্ঞানী ছিলেন এবং অনেক যজ্ঞ করেছিলেন। মন্ত্রীর আরাধনায় সূর্য তাঁকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। তাঁর পত্নী ছিল এক শো, কিন্তু তাঁরা তেমন দীর্ঘায়ু হতে পারেন নি বলে তাঁর আগেই মারা যান। মন্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনরাও আগে মারা যান। এই সব কারণে রাজা বীর্যহীন হলে বিমর্দ নামে একজন তাঁকে রাজ্যচ্যুত করে। বিষণ্ণ মনে তিনি বিতস্তার তীরে গিয়ে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। গ্রীষ্মে পঞ্চতপা হয়ে ও শীতে জলশায়ী হয়ে আহার ত্যাগ করে তপস্যা আরম্ভ করলে বর্ষায় অনবরত বর্ষণে পৃথিবী জলে প্লাবিত হল। ঘোর অন্ধকারে সমুদায় অনুলিপ্ত হলে কেউ কোন দিক জানতে পারল না। রাজা জল প্রবাহে ভেসে যেতে লাগলেন এবং নদীর তট খুঁজে পেলেন না। দূরে গিয়ে নদীর জলে এক মৃগীকে পেয়ে তার পুচ্ছ ধরলেন। সেই পুচ্ছ ধরে ভেলার মতো ভেসে যাবার পরে তট পেলেন, কিন্তু তাতে দুস্তর পঙ্ক। তপস্যায় কৃশ হয়েছিলেন বলেই তাঁকে টেনে এক রমণীয় বনে নিয়ে গেল। মৃগীর পুচ্ছ স্পর্শ

করে রাজার হর্ষ হল এবং মনে কামের সঞ্চার হতেই তিনি তার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করতে লাগলেন। মৃগী তা বুঝতে পেরে রাজাকে বললেন, আপনি কম্পিত হাতে আমার পৃষ্ঠদেশ কেন স্পর্শ করছেন? আপনার মন অস্থানে সঙ্গত হয় নি, আমি আপনার অগম্যা নই। কিন্তু লোল আপনার সঙ্গমে আমার ব্যাঘাত করছে।

এই কথা শুনেই রাজা কৌতূহলান্বিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? কেমন করে তুমি মানুষের মতো কথা বলছ? লোলই বা কে? মৃগী বলল, রাজা, আমি আপনার স্ত্রী ছিলাম, দৃঢ়ধন্বার কন্যা উৎপলাবতী। আপনার রাণীদের মধ্যে আমিই প্রধান ছিলাম। রাজা বললেন, তুমি এমন কী করেছিলে যার জন্য তোমার এই রূপ হল? মৃগী বলল, পিতার গৃহে আমি সখীদের সঙ্গে অরণ্যে বিহার করতে গিয়ে এক মৃগকে মৃগীর সঙ্গে সমাগত হতে দেখেছিলাম। নিকটে গিয়ে মৃগীকে তাড়না করতেই সে অন্যত্র চলে যায়। এর জন্য মৃগ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, ধিক্ তোমার দুঃশীলতায়! তাকে মানুষের মতো কথা বলতে দেখে আমি ভয় পেয়ে বললাম, তুমি কে? সে বলল, আমি নির্বৃতি-চক্ষু ঋষির পুত্র সুতপা। মৃগীতে অভিলাষ হওয়াতে মৃগ হয়ে এর অনুগত হয়েছিলাম। এই বিয়োগ ঘটাবার জন্য আমি তোমাকে শাপ দেব। আমি বললাম, না জেনে আমি এই অপরাধ করেছি, আমাকে শাপ দেবেন না। সে বলল, তোমাকে আত্মদান করতে পারলে শাপ দেব না। আমি বললাম, কিন্তু আমি তো মৃগী নই, বনে আপনি অন্য মৃগী পাবেন। এই কথা শুনে সে সক্রোধে বলল, তুমি মৃগী নও বললে! বেশ, তুমি মৃগীই হবে। এই কথায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে তাকে প্রণাম করলে সে তার স্বরূপ ধারণ করল। আমি তাকে বার বার বলতে লাগলাম, আমি বালিকা বলেই এই কথা বলেছি। আপনি প্রসন্ন হোন। পিতা বেঁচে থাকতে আমি কী ভাবে পতি বরণ করতে পারি! আমার কাতরোক্তি শুনে মুনি বলল, আমার কথার অন্যথা হবে না, পরজন্মে

তোমাকে মৃগী হতেই হবে। মহর্ষি সিদ্ধবীর্যের পুত্র লোল তোমার গর্ভে জন্মাবেন। তুমি জাতিস্মর হবে এবং গর্ভ ধারণ করেই স্মৃতি লাভ করে মানুষের মতো কথা বলবে। লোলের জন্মের পরে তোমার মুক্তি। আর এই লোল তাঁর পিতার শত্রু বিনাশ করে পৃথিবী জয় কববেন ও পবে মনু হবেন। এই শাপেই আমি মৃত্যুর পবে মৃগী হয়ে জন্মেছি এবং আপনার সংস্পর্শেই গর্ভ সঞ্চাব হয়েছে। আব এই জন্যই আমি বলছিলাম যে আপনার মন অস্থানে সঙ্গত হয় নি, আমি আপনাব অগম্যা নই। কিন্তু লোল আমাব গর্ভে বিঘ্ন করছে।

তাঁর পুত্র শত্রু জয় করে পৃথিবীতে মনু হবেন শুনে বাজা আহ্লাদিত হলেন। তারপর মৃগী সমস্ত সুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্র প্রসব করলে সকলে আনন্দিত হল। মৃগীও শাপমুক্ত হয়ে পরলোকে গেল। ঋষিরা সমবেত হয়ে তামসী মাতার গর্ভে জন্ম বলে সেই পুত্রেব নাম রাখলেন তামস। বনের মধ্যে পিতা তাকে মানুষ কবে তুললে পুত্র এক দিন জিজ্ঞাসা করল, আপনি ও আমি কে এবং আমার মাতাই বা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে পিতা তাকে বাজ্যচ্যুতি থেকে আবম্ভ করে সব কথা বললেন। তা শুনে তামস সূর্যের উপাসনা কবে যাবতীয় দিব্য অস্ত্র পেলেন। তারপর শত্রু জয় করে পিতাব নিকটে তাদের আনলেন এবং তাঁর আদেশে সবাইকে ছেড়ে দিলেন। বাজাও দেহত্যাগ করে পরলোকে গেলেন।

তারপব রাজা তামস পৃথিবী জয় করে তামস নামের মনু হলেন। নর ক্ষান্তি শান্ত দান্ত জানু জঙ্ঘা প্রভৃতি তামসের পুত্র। তাঁরা সকলেই রাজা হয়েছিলেন।

মনুর বংশে তামস নামে কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। তবে নর নামে একজন রাজা হয়েছিলেন প্রিয়ব্রতের বংশে। তিনি গয়ের পুত্র এবং তাঁর কাল ৫৪৭৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ অর্থাৎ স্বারোচিষ মন্বন্তরে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু পিতার নামের সঙ্গে কোন

মিল নেই বলে তামস মনুর কাহিনী কল্পিত বলেই মনে হয়। বিশেষত জন্মান্তর ও জাতিস্মরতা ঐতিহাসিক ঘটনা হতে পারে না। মনে হয় যে তামস মনুর নামে এই রকমের একটি কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল।

পৃথু

কিন্তু এই মন্বন্তরের প্রথম রাজা যে পৃথু তাতে কোন সংশয় নেই। পৃথুর রাজ্য প্রাপ্তির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাঁর সময়ে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ প্রজারা পৃথুর কাছে এসে বলেছিল, খাদ্যের অভাবে আমরা যাতে বিনষ্ট না হই, তার ব্যবস্থা করুন। পৃথু কিছুক্ষণ চিন্তা করেই বুঝতে পারলেন যে পৃথিবী ওষধির বীজ গ্রাস করেছেন বলেই শস্য উৎপন্ন হচ্ছে না। তিনি পৃথিবীকে বিনাশ করবার জন্য ধনুতে বাণ যোজনা করলেন। তাই দেখে পৃথিবী সভয়ে বললেন, সৃষ্টিকর্তা ধান প্রভৃতি যে সব ওষধি সৃষ্টি করেছিলেন, দুষ্টরা তা ভোগ করেছিল। চোরের ভয়ে আমি সে সব গ্রাস করেছি। আমি যাতে আবার তা দিতে পারি, তার জন্য আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ষার পর যাতে আমার সর্বত্র বৃষ্টির জল থাকতে পারে, তার জন্য আমাকে সমতল করুন। এই কথা শুনে পৃথু পৃথিবী থেকে ধান্যাদি ঔষধি দোহনের ব্যবস্থা করলেন। তিনি পর্বতের শৃঙ্গ চূর্ণ করে পৃথিবীকে সমতল করেছিলেন এবং সস্নেহে তাকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন। নানা স্থানে তিনি পুর ও গ্রাম স্থাপন করেন।

এই বর্ণনা শ্রীমদ্‌ভাগবতের। এই গ্রন্থে আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। এ কথাও আছে যে পৃথু ব্রহ্মাবর্তে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে মনস্থ করেছিলেন। সেই যজ্ঞে দেবতারা এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ইন্দ্র তাঁর সমৃদ্ধি সহ্য করতে না পেরে বিঘ্ন উৎপাদন করলেন। পৃথুকে হতমান করবার জন্য ইন্দ্র যজ্ঞের শেষ অশ্বটি অলক্ষ্যে অপহরণ

করে পলায়ন করলেন। তিনি পাষণ্ড বেশ ধারণ করে যখন শূন্য মার্গে পলায়ন করছিলেন, তখন অত্রি মুনি তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন। পৃথুর পুত্রকে তা দেখাতেই তিনি ইন্দ্রের পিছনে ধাবিত হলেন। কিন্তু ইন্দ্রকে জটাজুটধারী দেখে ধর্মের মূর্তি মনে করে বাণ নিক্ষেপ করলেন না। তাই দেখে অত্রি বললেন, যজ্ঞ-বিনাশকারী দেবাধম ইন্দ্রকে তুমি বধ কর। ভয়ে ইন্দ্র সেই পাষণ্ড বেশ ত্যাগ করে যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়ে দিলেন। এই ঘটনায় ঋষিরা পৃথুর পুত্রের নাম দিলেন বিজিতাশ্ব।

এর পরেও ইন্দ্র অন্ধকার সৃষ্টি করে পুনরায় সেই অশ্বটি অপহরণ করলেন। অত্রির প্ররোচনায় বিজিতাশ্ব এবারে বাণ নিক্ষেপে উদ্যত হতেই ইন্দ্র অশ্বটি ফিরিয়ে দিয়ে ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন। অশ্ব নিয়ে বিজিতাশ্ব যজ্ঞ স্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে অজ্ঞ লোকেরা ইন্দ্রের পাষণ্ড বেশ গ্রহণ করেছে। বুদ্ধির বিভ্রমে তারা সেই উপধর্মকেই ধর্ম মনে করে তাতে আসক্ত হয়েছে। পৃথু এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে শক্র বধের জন্য ধনুতে বাণ যোজনা করলেন। ঋষিরা বললেন, যজ্ঞ স্থলে যজ্ঞের পশু ছাড়া আর কাউকে বধ করা বিধেয় নয়। ইন্দ্রকে আমরা মন্ত্র বলে এখানে এনে যজ্ঞে আহুতি দেব। এই বলে ঋত্বিকরা হোম করতে প্রবৃত্ত হতেই ব্রহ্মা এসে বললেন, আপনারা যাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছেন, তিনি আপনাদের বধ্য নন। ইন্দ্র ভগবানের অবতার এবং যজ্ঞ নামে অভিহিত। দেবতারা তাঁরই দেহ স্বরূপ। ব্রহ্মার এই কথায় পৃথু শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ইচ্ছা ত্যাগ করে ইন্দ্রের সঙ্গে মৈত্রী করলেন। যজ্ঞে সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু এসে বললেন, ইন্দ্র তোমার যজ্ঞে বিঘ্ন করেছেন ঠিকই, কিন্তু এখন তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। তাঁকে তোমার ক্ষমা করাই উচিত। প্রজাপালন রাজার ধর্ম, তিনি তাঁদের পরলোকে অর্জিত পুণ্যের ষষ্ঠাংশ লাভ করেন। কিন্তু যে রাজা প্রজাকে রক্ষা না করে শুধু কর গ্রহণ করেন, প্রজারা তাঁর পুণ্য হরণ করেন এবং রাজাই প্রজাদের পাপের ভাগী হন। তুমি রাজধর্ম পালন করছ, অচিরে সনৎ কুমার প্রভৃতি ঋষিরা তোমার কাছে

আসবেন। তোমার গুণে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি যে কোন বর নিতে পার। পৃথু বললেন, আমি আপনার কাছে কোন ভোগ্য বস্তু চাইব না। আপনার কীর্তি শোনবার জন্য আমাকে অযুত কাল দিন। ইন্দ্র লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য পৃথুর চরণ স্পর্শ করলে তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর সকলে স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

পৃথু গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগে বাস করে বিষয় ভোগ করতে লাগলেন। কালক্রমে এক দিন একটি মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হলেন। সেই যজ্ঞে দেবতা ও ঋষিরা সমাগত হয়ে সভ্য হলেন। তিনি তাঁদের অর্চনা করে বললেন, আপনাদের স্বধর্মে স্থাপন করাই আমার কর্তব্য। তাই বলছি, হরিতে মতি রেখেই ধর্মের অনুষ্ঠান করবেন। এই কথা শুনে সমবেত সকলেই সাধুবাদ দিলেন, বললেন, বেণ পুত্রের প্রভাবে নরক থেকে নিস্তার পেলেন। এই সময়ে সনকাদি চারজন ঋষি আকাশ থেকে অবতরণ করে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন।

পৃথুর পত্নী অর্চির গর্ভে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল। তাদের নাম বিজিতাশ্ব ধূম্রকেশ হর্যক্ষ দ্রবিণ ও বৃক। প্রজার মনোরঞ্জন করে পৃথু রাজা নাম সার্থক করেছিলেন। এক দিন নিজেকে বয়োবৃদ্ধ মনে করে পুত্রের হাতে পৃথিবীর ভার দিয়ে সস্ত্রীক তপোবনে গেলেন এবং বাণ প্রস্থে কঠোর তপস্যায় রত হয়ে দেহত্যাগ করলেন। তাঁর পত্নী অর্চি তাঁকে অনুগমন করে বনে এসেছিলেন। তিনি স্বামীকে চিতায় তুলে কালোচিত কৃত্য সম্পন্ন করে নিজেও আগুনে প্রবেশ করলেন।

এই বিবরণ পড়ে মনে হয় যে পৃথু শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন এবং এই নিয়েই তাঁর বিবাদ হয়েছিল ইলাবৃত বর্ষের রাজা ইন্দ্রের সঙ্গে। পৃথুর প্রজাদের বৈদিক ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট করে ইন্দ্র তাঁর প্রতিপত্তি খর্ব করতে চেয়েছিলেন। বিষ্ণুর মধ্যস্থতায় এই বিবাদ মেটে এবং বিষ্ণুকে পৃথু মেনে নেন।

এর থেকে অনুমান করলে অন্যায় হবে না যে ইলাবৃত বর্ষ থেকে ভাবতে প্রথম এসেছিলেন স্বায়ম্ভুব মনু এবং তাঁর নামেই তাঁর আত্মীয় পরিজন অনুচর ও বংশধরদের নাম হয়েছিল মানব বা মানুষ। তাঁরা এতকাল ইলাবৃত বর্ষের রাজা ইন্দ্রকেই তাঁদের প্রকৃত রাজা বলে মেনে আসছিলেন এবং যজ্ঞাদিতে তাঁকে এবং দেবতা নামে পরিচিত ইলাবৃত বর্ষবাসীকে নিমন্ত্রণ করে যজ্ঞেব ভাগ বা কর দিতেন। এই ভাবেই এক হাজার বছর অতীত হয়েছিল এবং ঠিক এক হাজার বছর পবেই বাজত্ব কবছিলেন অঙ্গ। অঙ্গের রাজত্বকালেই সার্বভৌমত্ব নিয়ে বিবাদ বাধবার উপক্রম হয়েছিল এবং এই ভয়েই হয়তো অঙ্গ গৃহত্যাগ করেন। যুবরাজ বেণ বোধহয় ইন্দ্রের আধিপত্য অস্বীকার করবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং কোন মধ্য পথ অবলম্বনে বাজী হচ্ছিলেন না। তাই ভীরু অঙ্গের মধ্য রাতে সকলের অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। বেণ রাজা হয়েই তাঁর আদেশ জারি করেন। প্রথম বিবাদ ইন্দ্রের সঙ্গে হয় নি, হয়েছিল তাঁর সমর্থক মুনি ঋষি ও অমাত্যদের সঙ্গে। তাঁরাই ষড়যন্ত্র করে বেণকে হত্যা করেন এবং পৃথু নামের এক সেনাপতিকে নির্বাচন কবে বাজপদে অভিষিক্ত করেন। পৃথু খুবই বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ছিলেন বলে প্রথমে তিনি তাঁর রাজ্যের কৃষি বাণিজ্য পথঘাট গ্রাম-নগর প্রভৃতি উন্নয়ন করে দেশের অবস্থা সমৃদ্ধিশালী করেন। তারপর নিজের শক্তি সংহত করে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। এই যজ্ঞেই বিবাদ হল ইন্দ্রের সঙ্গে এবং ইন্দ্র পরাভূত হলেন। পৃথু আর ইন্দ্রের অধীন সামন্ত রাজা রইলেন না বটে, কিন্তু বিষ্ণুর অধীনতা রয়েই গেল। তিনি যে সেকালের একজন শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন, তাতে কোন সংশয় নেই। পরবর্তী কালে বিষ্ণুর অধীনতাও যে অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছিল, তা হিরণ্যকশিপুর কাহিনী থেকে জানা যাবে।

বলা বাহুল্য যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এ একটি সঙ্কটময়

কাল। কতকটা সঠিক ভাবেই বলা যেতে পারে যে বেণ রাজা হয়েছিলেন ৪৯১৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। তিনি কতকাল রাজত্ব করতে পেরেছিলেন তা অনুমান করা সম্ভব নয়। রাজা হবার পরই তিনি নিহত হয়েছিলেন, না কিছু কাল রাজত্ব করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা জানা যায় না। তবে রাজা হবার পর তিনি রাজ্যের সর্বত্র বিচরণ করে বেড়াতেন, এ কথা পুরাণেই আছে। তিনি নির্বোধ ছিলেন না এবং সহসা তাঁকে হত্যা করা সম্ভব হয় নি, এ কথা অনুমান করা যেতে পারে।

ঠিক এই ভাবেই অনুমান করা যেতে পারে যে বেণের মৃত্যুর ঠিক পরেই পৃথু রাজা হন নি। প্রথমে নিষাদ জাতি আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং অরাজকতা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এ কথা পুরাণের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। চোরের উপদ্রব ও খাদ্যের অভাবে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এ রকম অবস্থা অল্প দিনে হয় না। তাই পৃথু যে দীর্ঘকাল পরে রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন অথবা স্বয়ং রাজ্য অধিকার করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তবে তিনি মৃত বেণ রাজারই সেনাদলে ছিলেন বলেই পুরাণে বলা হয়েছে যে বেণের বাহু মন্থন করে পৃথুকে পাওয়া গিয়েছিল। বেণের মাতা সুনীথা পুত্রের মৃতদেহ মন্ত্রবলে রক্ষা করছিলেন, এই কথার অর্থ তিনিই পুত্রের অরক্ষিত রাজ্য পরিচালনা করছিলেন। এর জন্যই মনে হয় যে বেণ অকৃতদার ছিলেন, অথবা অপুত্রক অবস্থায় নিহত হন। তাই রাজ মাতার উপরেই রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায়।

মহা প্লাবন ও প্রচেতা

এই সব কথা বিশদ ভাবে জানার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই ঘটনার কিছু দিন পর থেকেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে একটা দীর্ঘকালের অন্ধকার যুগ পাওয়া যায়। এই অন্ধকার যুগ শুধু

ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতে অর্থাৎ জম্বু দ্বীপ বা এশিয়া মহাদেশের সর্বত্র এই অন্ধকার যুগের কথা নানা ভাবে জানা যায়। কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে একটা মহা প্লাবনে এই পৃথিবী নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং এই জল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। সমস্ত নিম্নভূমি ভেসে গিয়েছিল, তারপর পৃথিবী জেগে উঠেছিল ধীরে ধীরে বহু বৎসর ধরে। হয়তো কয়েক শো বৎসর সময় লেগেছিল। এই সময়ের ভীষণ অভিজ্ঞতার কথা সমগ্র এশিয়ার গল্পে কাহিনীতে রূপকথায় ও পুরাণে ছড়িয়ে আছে। মৎস্য অবতার, বরাহ অবতার, নোয়ার নৌকা প্রভৃতি কাহিনী রচিত হয়েছে সমস্ত দেশের ভাষায়। পুরাণের বর্ণনা থেকে সেই ঘটনার কাল নির্ণয় সম্ভব কিনা, তার চেষ্টা করে দেখতে হবে। এই কথা মনে রেখেই আমরা পৃথুব পরবর্তী ঘটনা বিচার করে দেখব।

বিষ্ণু পুরাণে পৃথুর মৃত্যুর কথা নেই। বেণ রাজা ও পৃথু রাজার উপাখ্যানের পরে প্রচেতাদের তপস্যা। পৃথুর দুই পুত্রের নাম অন্তর্ধান ও পালী। অন্তর্ধানের স্ত্রী শিখণ্ডিনী, হবির্ধানের মাতা। হবির্ধানের স্ত্রী ধিষণা আগ্নেয়ী অর্থাৎ অগ্নির কন্যা। তাঁদের ছয় পুত্রের মধ্যে প্রাচীনবর্হিঃ রাজা হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে প্রাচীনাগ্রকুশে পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়েছিল। তিনি মহা তপস্যার পর সমুদ্র তনয়া সবর্ণাকে বিবাহ করেন। এই সামুদ্রী সবর্ণার গর্ভে তাঁদের প্রচেতা নামে দশ পুত্র জন্মে। তাঁরা এক সঙ্গে সমুদ্র সলিল বাসী হয়ে দশ হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন।

পরাশর এই পর্যন্ত বলতেই মৈত্রেয় প্রশ্ন করলেন, প্রচেতারা জলের মধ্যে কেন তপস্যা করলেন তা বলুন।

পরাশর জলের মধ্যে তপস্যা করার কারণ বললেন না, বললেন তপস্যা কেন করেছিলেন সেই কথা। রাজা প্রাচীনবর্হিঃ তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন প্রজাপতি আমাকে প্রজা বৃদ্ধি করতে বলেছেন, আমি তাতে সম্মত হয়েছি। তাই আমার প্রীতির জন্য তোমরা

প্রজা বৃদ্ধি কর। প্রচেতারা বললেন, কেমন করে আমরা প্রজাবৃদ্ধি করব তা বলুন। রাজা বললেন, বিষ্ণুর আরাধনা করলেই প্রজা বৃদ্ধি হবে। এই কথাতেই প্রচেতারা সমুদ্রের জলে মগ্ন ও সমাহিত হয়ে দশ হাজার বৎসর তপস্যা করেছিলেন। তারপর তাঁরা বিষ্ণুর দর্শন পেয়েছিলেন এবং অভিলষিত বর লাভ করে জল থেকে নির্গমন করেছিলেন।

পরাশর বললেন, প্রচেতারা যখন তপস্যায় রত ছিলেন, তখন অরক্ষ্যমান পৃথিবী মহীরুহে আবৃত হয় এবং তাতে প্রজা ক্ষয় হয়। বাতাস বইতে পারে নি, আকাশ আবৃত হয়েছিল বৃক্ষে এবং প্রজারা দশ হাজার বৎসর কর্মে অক্ষম হয়েছিল। জল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে প্রচেতারা এই দেখে ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরা তাঁদের মুখ থেকে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করলেন। বায়ু ঐ সব বৃক্ষকে উন্মূলিত ও শোষিত ও অগ্নি তাদের দগ্ধ করল। এই ঘোর বৃক্ষ সংক্ষয় দেখে বৃক্ষের রাজা সোম প্রচেতাদের নিকটে এসে বললেন, তোমরা কোপ সংবরণ করে আমার কথা শোন। বৃক্ষদের সঙ্গে আমি তোমাদের সন্ধি করে দেব। ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই আমি তাদের সুন্দরী কন্যা মারিষাকে আমার সুধাময় কিরণে বর্ধিত করেছিলাম। বৃক্ষ-কন্যা মারিষা তোমাদের ভার্যা হয়ে বংশ বৃদ্ধি করবেন। তোমাদের ও আমার অর্ধতেজে তাঁর গর্ভে দক্ষ প্রজাপতির জন্ম হবে। তিনি আমার সৌম্যাংশ ও তোমাদের তেজে অগ্নি সম হয়ে প্রজা বৃদ্ধি করবেন।

মারিষার জন্মের কথাও সোম বললেন। পুরাকালে কণ্ডু নামে এক বেদ্‌বিদ মুনি সুরম্য গোমতীর তীরে পরম তপস্যা করছিলেন। সুরেন্দ্র প্রম্লোচা নামে এক শুচিস্মিতা অপ্সরাকে তাঁর ক্ষোভ উৎপাদনের জন্য নিযুক্ত করেন। প্রম্লোচা তাই করেছিলেন। কণ্ডু বিষয়াসক্ত মানসে তাঁর সঙ্গে কয়েক শো বৎসর মন্দর পর্বতের দ্রোণীতে বাস করেন। তারপর সেই অপ্সরা মুনিকে বললেন, এইবারে আমি স্বর্গে ফিরে যেতে চাই, আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে

অনুজ্ঞা দিন। কিন্তু তাঁর প্রতি আসক্তচিত্ত মুনি বললেন, ভদ্রে, তুমি আর কিছু দিন থাকো। এই কথায় প্রম্লোচা মুনির সঙ্গে আরও কয়েক বৎসর বিষয় ভোগ করলেন। তারপর বললেন, এইবারে অনুজ্ঞা দিন, আমি ত্রিদিবালয়ে ফিরে যাই। কিন্তু মুনি এবারেও বললেন, থাকো। পুনরায় আরও কয়েক শো বৎসব গত হবার পর শুভ্রাননা অপ্সরা প্রণয়স্মিত বাক্যে বললেন, আমি এখন স্বর্গে যাই। এই কথা শুনে মুনি সেই আয়তনয়নাকে আলিঙ্গন করে বললেন, তুমি তো চিরকালেব জন্যেই যাবে। আর ক্ষণকাল থাকো। শাপের ভয়ে ভীত সেই অপ্সরা পুনরায় মুনিব সঙ্গে কিছু কম দুশো বৎসর বাস করলেন। প্রম্লোচা যতবারই যাবার অনুমতি চান, ততবারই কণ্ডু বলেন থাকো। এক দিন মুনি তাঁর পর্ণ কুটির থেকে ত্বরায় নির্গত হলে অপ্সবা বললেন, কোথায় যাচ্ছেন? মুনি বললেন, দিবস শেষ হল, আমি সন্ধ্যা-উপাসনা করব, নতুবা আমার ক্রিয়া লোপ হবে। এই কথা শুনে অপ্সরা আনন্দে হেসে বললেন, আপনার দিন কি আজ শেষ হল! বহু বৎসরের পব আপনার দিন শেষ হল শুনে কে না বিস্মিত হয়! মুনি বললেন, তুমি যে আজই প্রাতে এই নদী তীবে আমার আশ্রমে প্রবেশ করেছ, আমি তা দেখেছি। আর এখন সন্ধ্যা উপস্থিত, পরিণাম হয়েছে দিবসের। তবে এই উপহাস করছ কেন! সত্য বিবরণ বল তো। প্রম্লোচা বললেন, আমি আজ প্রত্যুষে এসেছি, এ কথা সত্য নয়। এ মিথ্যা। আমার এখানে আসার পর কয়েক শো বৎসর গত হয়েছে। এই কথায় ভীত হয়ে বিপ্র আয়তনয়না প্রম্লোচাকে বললেন, বল, আমি কতকাল তোমার সঙ্গে আনন্দ করলাম? প্রম্লোচা বললেন, নয় শো সাতাশি বৎসর ছয় মাস তিন দিন। ঋষি আশ্চর্য হয়ে বললেন, তুমি কি সত্য বলছ, না উপহাস করছ আমাকে? আমার তো মনে হচ্ছে আমি এখানে তোমার সঙ্গে এক দিন ছিলাম। প্রম্লোচা বললেন, আমি আপনাকে মিথ্যা বলব কেমন করে? বিশেষ ভাবে, আপনি

আজ নিত্য কর্ম করবার জন্য আমার নিকটে সত্য কথা জানতে চাইছেন। মুনি তাঁর কথা শুনে নিজের নিন্দা করে বললেন, ধিক্ আমাকে! আমার সমস্ত তপস্যা নষ্ট হল, ব্রহ্মবিদের ধন হৃত হল, বিবেকও গেল। মোহ সৃষ্টি করবার জন্য কে এই নারীকে নির্মাণ করেছে! জরা মৃত্যু শোক মোহ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এই ছয় ঊর্মি অতিক্রমকারী ব্রহ্ম আমার আত্মজয়ের দ্বারাই জ্ঞেয়। যে মহাগ্রহ কাম আমার সেই বুদ্ধি হরণ করল তাকে ধিক্। নরকের পথ আসক্তি আমার বেদবিদ্যা লাভের ব্রত অপহরণ করল। তারপর অপ্সরাকে বললেন, তুমি পাপ, ভাবচেষ্টায় আমার ক্ষোভ সৃষ্টি করে তুমি দেবরাজের কার্য সাধন করেছ। কিন্তু আমি আমার ক্রোধের আগুনে তোমাকে ভস্ম করব না, কারণ আমি সাপ্তপদী মৈত্রী করে তোমার সঙ্গে বাস করেছি। আর তোমারই বা দোষ কী যে তোমার উপরে আমি কুপিত হব! দোষ আমার, আমিই জিতেন্দ্রিয় নই। তুমি ইন্দ্রের প্রিয় কাজ করবাব জন্য আমার তপস্যা নষ্ট করেছ। তুমি মহা মোহের আধার বলে ঘৃণিত। তোমাকে ধিক্। তোমার যেখানে খুশি তুমি চলে যাও।

সোম বললেন, ঋষি সেই অপ্সরাকে এই কথা বলতেই তিনি স্বেদাক্ত হলেন। তিনি যখন ভয়ে কাঁপছেন ও স্বেদাক্ত হচ্ছেন, তখন মুনি বললেন, তুমি যাও, চলে যাও। ভৎ´সিতা অপ্সরা আশ্রম থেকে বেরিয়ে আকাশ পথে যেতে যেতে তরু পল্লবে তাঁর স্বেদ মার্জনা করলেন। তিনি অরুণ পল্লবে তাঁর ঘর্মাক্ত গাত্র মুছতে মুছতে বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে চলে গেলেন। ঋষি তাঁর দেহে যে গর্ভ সঞ্চার করেছিলেন, তা তাঁর অঙ্গ থেকে রোমকূপ দিয়ে ঘর্ম রূপে নির্গত হয়ে গেল। সেই গর্ভ ধারণ করল বৃক্ষরা এবং বায়ু তা একত্রিত করল। আর আমি আমার সুধাময় কিরণে আপ্যায়িত করে তাকে ধীরে ধীরে বর্ধিত করলাম। বৃক্ষের অগ্রভাগ থেকে উৎপন্ন সেই কন্যারই নাম মারিষা। তিনি কণ্ডুর অপত্য, বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন প্রম্লোচার

কন্যা এবং আমার ও বায়ুর সন্তান। বৃক্ষরা তোমাকে এই কন্যা সম্প্রদান করবে, তোমরা কোপ প্রশমিত কর।

সোম বললেন, মারিষা পূর্বে যা ছিলেন, তাও তোমাদের বলছি। সেই বিবরণ বললে তোমাদের কাজ গৌরবজনক ফলপ্রদ হবে। পতির মৃত্যুর পর এই অপুত্রক রাজমহিষী ভক্তি সহকারে বিষ্ণুর সন্তোষ বিধান করেছিলেন। আরাধিত বিষ্ণু তাঁর প্রত্যক্ষ হয়ে বললেন, বর নাও। তিনি বললেন, হে জগৎপতি, বাল্যবৈধব্য হেতু আমি বৃথা জন্মা, বিফলা ও মন্দভাগ্য। তোমার প্রসাদে আমার জন্মে জন্মে যেন শ্লাঘ্য পতি হয়। আমি যেন অযোনিজা ও রূপ সম্পদে প্রিয়দর্শনা হয়ে জন্ম গ্রহণ করি এবং প্রজাপতির মতো আমার একটি পুত্র হোক। দেবেশ হৃষীকেশ সেই প্রণামনম্র রমণীকে তুলে বললেন, এক জন্মেই তোমার দশ পতি হবেন এবং প্রজাপতির গুণযুক্ত পুত্রলাভ করবে। তার বংশ এই জগতের সবার উপরে কর্তৃত্ব লাভ করবে এবং তার সন্ততি ত্রিলোক পূর্ণ করবে। আমার প্রসাদে তুমি অযোনিজা রূপগুণান্বিতা হয়ে জন্মাবে। বিষ্ণু এই বর দিয়ে অন্তর্ধান হলেন এবং সেই মারিষাই তোমাদের পত্নী হচ্ছেন।

সোমের কথায় প্রচেতারা কোপ সংবরণ করে বৃক্ষদের নিকট থেকে মারিষাকে ধর্মানুসারে পত্নী রূপে গ্রহণ করলেন। মারিষার গর্ভে মহাযোগী দক্ষ প্রজাপতির জন্ম হল। ইনিই পূর্বে ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন। সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য দক্ষ বহু পুত্র উৎপাদন করেন। তিনি মনের দ্বারা চর অচর দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি সৃষ্টি করার পর ষাট কন্যা সৃজন করেন। তিনি ধর্মকে দশ ও কশ্যপকে তেরোটি কন্যা দিয়েছিলেন। কাল পরিবর্তনে নিযুক্ত সাতাশটি কন্যা ইন্দুকে দিলেন। এই সব কন্যা থেকেই দেব দৈত্য নাগ গো পক্ষী গন্ধর্ব অপ্সরা ও দানবাদির জন্ম। তারপর থেকেই প্রজারা মৈথুনসম্ভব হতে লাগল। পূর্বে সংকল্প দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা এবং তপস্বী সিদ্ধগণের তপস্যায় প্রজাসৃষ্টি হত।

মৈত্রেয় বললেন, দেব দানব গন্ধর্ব সর্প ও যক্ষদের উৎপত্তির কথা আমাকে সবিস্তারে বলুন।

পরাশর বললেন, দক্ষ প্রথমে মন থেকে দেব ঋষি গন্ধর্ব অসুর ও সর্পের সৃষ্টি করেন। কিন্তু তাঁর মানসী প্রজারা যখন পুত্র পৌত্রাদি-ক্রমে বর্ধিত হল না, তখন তিনি বিবেচনা করে সৃষ্টির জন্য মৈথুন ধর্মে প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন এবং বীরণ প্রজাপতির কন্যা তপস্বিনী অসিক্নীকে বিবাহ করলেন। তার পর তিনি তাঁর গর্ভে পাঁচ হাজার পুত্র উৎপাদন করলেন। প্রজাবৃদ্ধি বিষয়ে উৎসুক দেখে দেবর্ষি নারদ তাদের বললেন, এই পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত না জেনে তোমরা কী রূপে প্রজা সৃষ্টি করবে? এই কথা শুনেই তারা চারিদিকে চলে গেল। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে আর ফেরে না, তেমনি তারাও আর ফিরে এল না। হর্যশ্ব নামের এই পুত্ররা নিরুদ্দেশ হলে দক্ষ আরও হাজার হাজার পুত্রের জন্ম দিলেন। তাদের নাম শবলাশ্ব। দেবর্ষি নারদ তাদেরও সন্তান বৃদ্ধিতে ইচ্ছুক দেখে আগের মতো বোঝালেন। তারা পরস্পরকে বলল, মহামুনি ঠিক বলেছেন। ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই যে আমাদের উচিত, তাতে সংশয় নেই। পৃথিবীর প্রমাণ জেনে অথবা তার পরিমাণ নিরূপণ করেই আমরা প্রজা সৃষ্টি করব। এই স্থির করে তারাও সেই মার্গের দিকে চলে গেল, আর ফিরল না। এই পুত্ররাও নষ্ট হয়েছে জেনে দক্ষ প্রজাপতি ক্রুদ্ধ হয়ে নারদকে শাপ দেন। তার পর ষাট কন্যার জন্ম দেন। এদের দশটি ধর্মকে, তেরোটি কশ্যপকে ও সাতাশটি সোমকে দান করেন। বাকি দশটি কন্যার চারটি অরিষ্টনেমিকে এবং বহুপুত্র আঙ্গিরস ও কৃশাশ্বকে দুটি করে কন্যা দান করেন।

এই কাহিনী আছে বিষ্ণু পুরাণের প্রথমাংশের পঞ্চদশ অধ্যায়ে। এই প্রসঙ্গেই দক্ষ কন্যাদের নাম ও তাঁদের বংশাবলীও আছে। কশ্যপের পত্নী অদিতি দ্বাদশ আদিত্যের জননী। তাঁদের নাম বিষ্ণু, শক্র বা ইন্দ্র, অর্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ,

অংশ ও ভব। দিতির গর্ভে কশ্যপের দুই দুর্জয় পুত্র হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষর জন্ম হয়, সিংহিকা নামে এক কন্যাও জন্মে। এই ভাবে দানবেরা দনুর পুত্র, পক্ষীরা বিনতার, নাগরা কদ্রুর, গো সুরভির, সারমেয়াদি সরমার পুত্র।

আপাত দৃষ্টিতে প্রচেতাদের তপস্যা ও কণ্ডু মুনির কাহিনী কল্পিত বলে মনে হয়। কিন্তু এর মধ্যে যে একটি বিরাট প্রাকৃতিক বিপ্লবের কথা লুকিয়ে আছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পুরাণকার একটি সুন্দর রূপকের সাহায্যে এই ঘটনাটির বিষয়ে বলতে চেয়েছেন।

পৃথু রাজার মৃত্যু সম্বন্ধে বিষ্ণু পুরাণে কিছু বলা হয় নি। তাঁর পুত্রের নাম অন্তর্ধান। এই নামটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মনে হয় যে এই নামটি পৃথু বংশের অন্তর্ধানের বিষয়ে একটি ইঙ্গিত করছে। অন্তর্ধানের পুত্র হবির্ধান। হবির অর্থ ঘৃত। এই শব্দটিও বিশেষ অর্থবহ। হয়তো খাদ্যের অভাবের কথা হবির্ধান শব্দ দিয়ে বলা হয়েছে। এইরূপ মনে করার কারণ এই যে হবির্ধানের পুত্র প্রাচীন-বর্হির আমলে সমস্ত দেশ বর্হি বা কুশে আবৃত হয়ে গিয়েছিল। এটি অরাজক অবস্থারই পরিচয় দেয়। হবির্ধানের স্ত্রী আগ্নেয়ী বা অগ্নির কন্যা এবং প্রাচীনবর্হি সমুদ্রের কন্যা সবর্ণাকে বিবাহ করেন। এই সামুদ্রী সবর্ণার গর্ভে প্রচেতা নামে যে পুত্রদের জন্ম হয় তাঁরা সমুদ্রের জলে নিমগ্ন হয়ে দশ হাজার বছর তপস্যা করেন। এই বর্ণনা থেকে স্বাভাবিক কারণেই অনুমান হয় যে প্রথমে অগ্নিতে দেশ দগ্ধ হয় এবং পরে সমুদ্রের জলে সব কিছু ডুবে যায়। দশ হাজার বছর তপস্যা করে অর্থাৎ দীর্ঘকাল পরে প্রচেতারা জল থেকে উঠে আসেন।

এই কালের পরিমাপ বোঝাবার জন্যই কণ্ডু মুনির উপাখ্যান। কণ্ডু মুনির যা এক দিন বলে মনে হয়েছে, তার হিসাব রেখেছেন স্বর্গের অপ্সরা প্রম্লোচা। নির্ভুল হিসাব, নশো সাতাশি বছর ছয় মাস তিন দিন। পৃথু রাজা যে সূত ও মাগধ নিয়োগ করেছিলেন, তারাই এই নির্ভুল হিসাবটি রেখেছিল। প্রাচীনবর্হির পর এই

বংশের প্রচেতারা রাজত্ব করতে ফিরে এলেন প্রায় হাজার বছর পরে। সমস্ত দেশ তখন অরণ্যে আবৃত। বৃক্ষে ঢেকে গেছে আকাশ, বাতাস বইতে পারে না। প্রজা নেই। প্রজা ক্ষয় হয়েছে, কর্মে অক্ষম হয়েছে তারা। প্রচেতারা ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্নি সংযোগ করে বৃক্ষ দগ্ধ করতে লাগলেন এবং অরণ্য দগ্ধ করে তাঁরা নূতন বসতি স্থাপন করলেন। তাঁদের পুত্র দক্ষ যে কন্যাদের জন্ম দিলেন, তাঁরাই হলেন নানা জাতির জননী। আদিত্য দৈত্য দানব ও নাগরা একই পিতার পুত্র। তাদের বংশ বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছিল। বিনতার পুত্র অরুণ ও গরুড় নিশ্চয়ই পক্ষী ছিলেন না এবং গোমাতা সুরভিও ছিলেন না চতুষ্পদ গো জাতির জননী।

আরও কতগুলি প্রশ্ন এসে পড়ে। অদিতির জ্যেষ্ঠপুত্র বিষ্ণু একটি নাম। প্রচেতারা যে বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন, ইনি সেই বিষ্ণু হতে পারেন না।' তেমনি ব্রহ্মার মানস পুত্র দক্ষ ও প্রাচেতস দক্ষ এক ব্যক্তি নন। প্রচেতারাও হয়তো একটি জাতি, কিংবা একই বংশে তাঁদের জন্ম। এঁদেরই মধ্যে একজন মারিষাকে বিবাহ করে দক্ষের জন্ম দেন। তার পর দক্ষের হাজার হাজার পুত্র হয়। পুরাণে এই সহস্র শব্দের অর্থ বহু। মনে হয় যে নারদের উপদেশে দক্ষের পাঁচটি পুত্র নিরুদ্দেশ হয়। তারপর আরও যারা জন্মগ্রহণ করে, তারাও একই পথ অবলম্বন করে।

এই ভাবে দক্ষের ষাট কন্যাও অতিশয়োক্তি। ধর্ম নামে কোন ব্যক্তি যদি প্রথম দক্ষের কন্যাদের বিবাহ করে থাকেন, তবে দ্বিতীয় দক্ষের কন্যাদের তিনি বিবাহ করেন নি। আর তা যদি করে থাকেন, তবে প্রথম দক্ষের চব্বিশটি কন্যা ছিল না। থাকা সম্ভবও নয়। মনে হয় ধর্ম নামে কোন ব্যক্তি দক্ষের একটি কন্যা বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের পুত্র নর ও নারায়ণ সেকালের বিখ্যাত ঋষি হয়েছিলেন। তাঁরা তপস্যা করেছিলেন বদরিকাশ্রমে এবং সেখানে তাঁদের নামে দুটি পর্বত এখনও আছে। দক্ষের রোহিণী নামের

কোন একটি বা একাধিক কন্যাকে সোম নামে কোন ব্যক্তি বিবাহ করেছিলেন। পরবর্তী কালে এই সোম যখন দেবতায় পরিণত হন এবং আকাশের চন্দ্রকেও সোম বলা আরম্ভ হয়, তখন থেকেই জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের সাতাশটি নক্ষত্রও চন্দ্রের স্ত্রী রূপে কল্পিত হয় এবং সকলকেই দক্ষেব কন্যা বলে ধরে নেওয়া হয়। এই ভাবেই দক্ষের কন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পৃথুব পুত্র বিজিতাশ্বের সম্বন্ধে কিছু তথ্য বেশি পাওয়া যায়। বিজিতাশ্ব রাজা হয়ে হর্যক্ষকে পূর্ব দিকের, ধূম্রকেশকে দক্ষিণ দিকের, বৃককে পশ্চিম দিকের এবং দ্রবিণকে উত্তর দিকের আধিপত্য প্রদান করেছিলেন। ইন্দ্রের নিকটে তিনি অন্তর্ধান বিদ্যা লাভ করায় তাঁর নাম অন্তর্ধান হয়। পত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে তাঁর তিন পুত্র জন্মে। বশিষ্ঠের শাপে পাবক পবমান ও শুচি এই তিনজন অগ্নিই তাঁর পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন। নভস্বতী নামে অন্য পত্নীর গর্ভে তাঁর হবির্ধান নামে আর এক পুত্র জন্মে। কর আদায় দণ্ড বিধান ও শুল্ক গ্রহণ প্রভৃতি রাজার বৃত্তি পীড়াদায়ক মনে করে অন্তর্ধান যজ্ঞের স্থলে রাজ বৃত্তি ত্যাগ করেন। হরির অর্চনা করে তিনি বিষ্ণুলোক লাভ করেন।

হবির্ধানের পত্নী হবির্ধানীর গর্ভে বর্হিষদ গয় শুক্ল কৃষ্ণ সত্য ও জিতব্রত নামে ছয়টি পুত্রের জন্ম হয়। বর্হিষদ ক্রিয়াকাণ্ড ও যোগ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। এইজন্য লোকে তাঁকে প্রাচীনবর্হিও বলত। ব্রহ্মার আদেশে তিনি সমুদ্র কন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করেছিলেন। এঁর গর্ভে প্রাচীনবর্হির দশটি পুত্র জন্মে। তাঁদের নাম প্রচেতা। পিতা তাঁদের প্রজা সৃষ্টি করতে বললে তাঁরা সমুদ্রে প্রবেশ করে দশ হাজার বছর তপস্যা করেন।

এই দুই পুরাণের কয়েকটি শব্দ বিশেষ ভাবে প্রণিধানের যোগ্য। পৃথুর পুত্রের নাম অন্তর্ধান, অথবা বিজিতাশ্ব নামের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রের নিকটে অন্তর্ধান বিদ্যা শিক্ষা করার পর এই নাম

পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্য ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এর পর দুই পুরাণে একটু অসঙ্গতি আছে। বিষ্ণু পুরাণের মতে অন্তর্ধানের স্ত্রী শিখণ্ডিনী ও পুত্র হবির্ধান; কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে অন্তর্ধানের স্ত্রী শিখণ্ডিনী, অগ্নি তাঁদের তিন পুত্র হয়ে জন্মে ছিলেন। নভস্বতী নামে আর এক পত্নীর গর্ভে হবির্ধানের জন্ম। রাজার বৃত্তি পীড়াদায়ক মনে করে অন্তর্ধান রাজবৃত্তি ত্যাগ করেন। বিষ্ণু পুরাণে হবির্ধানের পত্নীর নাম আগ্নেয়ী বা অগ্নির কন্যা ধিষণা। এঁর ছয় পুত্রের নাম প্রাচীনবর্হি শুক্র গয় কৃষ্ণ ব্রজ ও অজিন। প্রাচীনবর্হির রাজত্বকালে প্রাচীনাগ্র কুশে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। তিনি মহা তপস্যার পর সমুদ্রের কন্যা সবর্ণাকে বিবাহ করেন। প্রচেতারা তাঁদের পুত্র। শ্রীমদ্‌ভাগবতের সঙ্গে নামের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকলেও ঘটনা একই রকম। প্রচেতারা সলিলবাসী হয়ে দশ হাজার বৎসর তপস্যা করেছিলেন।

দেখা যাচ্ছে যে পৃথুর পরে তাঁর পুত্র বিজিতাশ্বের নাম অন্তর্ধান হয়েছিল। তাঁর সময়ে বা তাঁর পুত্র হবির্ধানের সময়ে অগ্নির কন্যা বা অগ্নির তিন পুত্রের উল্লেখ কোন অগ্নি কাণ্ডের নির্দেশ করে। বর্হি শব্দের অর্থ কুশ এবং প্রাচীনবর্হি শব্দে মনে হয় যে দেশ পুরাতন কুশে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। হবি অর্থ ঘৃত, যজ্ঞে এই হবির ব্যবহার। শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে হবির্ধানের জ্যেষ্ঠপুত্র বর্হিষদ ক্রিয়াকাণ্ড ও যোগ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন বলে লোকে তাঁকে প্রাচীনবর্হিও বলে। তাঁর পুত্র প্রচেতারা যখন সমুদ্রে তপস্যারত, তখন নিকটস্থ এক সরোবর থেকে অনুচর সহ রুদ্র উঠে তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন, হরির আরাধনা কর, তিনি তুষ্ট হলে তোমরা সবই লাভ করবে। এর পর প্রচেতারা জলের মধ্যে সেই স্তোত্র জপ করতে করতে দশ হাজার বছর কাটিয়ে দিলেন। এই সময়েই নারদ কর্মে আসক্ত প্রাচীনবর্হির নিকটে এসে বললেন, এই কর্মের দ্বারা তুমি কী রকম মঙ্গল চাইছ? এই কর্মে তোমার তো দুঃখ

নিবৃত্তি বা সুখ লাভ হবে না! রাজা বললেন, কর্মে বিভ্রান্ত হয়ে আমি পরম মঙ্গলকে জানতে পারি নি। আমি যাতে কর্ম থেকে মুক্ত হতে পারি, আপনি সেই উপদেশ দিন। নারদ বললেন, যজ্ঞে তুমি যে হাজার হাজার জীবের প্রাণ সংহার করেছ, তোমার মৃত্যুর পর তারা শৃঙ্গ দিয়ে তোমাকে ছিন্নভিন্ন করবে। তারপর তিনি অধ্যাত্ম জ্ঞানের উপদেশ দিয়ে ও তা ব্যাখ্যা করে হরির ভজনা করতে বলে প্রস্থান করলেন। প্রাচীনবর্হি তাঁর মন্ত্রীদের বললেন, আমার পুত্রদের প্রজা সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে বোলো। বলে তপস্যার জন্য কপিলাশ্রমে গেলেন।

কপিলাশ্রম সমুদ্রতীরে বলে পরিচিত। তাই কপিলাশ্রমে যাওয়াও তাৎপর্যপূর্ণ। এই সব উক্তি বিচার করে কতকটা নিশ্চিত ভাবেই বলা চলে যে একাধিক প্লাবন ও অগ্নিকাণ্ডে কিংবা আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতে সব কিছু বিপর্যস্ত হয়েছিল এবং ৪৮৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পর থেকে ৩৯০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত ইতিহাসের একটা বিরাট অন্ধকার যুগ। কণ্ডু মুনির কাহিনী দিয়েই পুরাণকার এই অন্ধকার যুগের কথা বলেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রৈবত মন্বন্তর

(৪৫২৮ থেকে ৪১৭১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)

রেবতী ও রৈবত, রৈবত ও রেবতী

রেবতী ও রৈবত

বলা বাহুল্য যে এই মন্বন্তরের সম্পূর্ণ কাল অন্ধকার যুগের অন্তর্গত। এই সময়ের কোন রাজার নাম পুরাণে পাওয়া যায় না। কোন ঘটনারও উল্লেখ নেই।

এই মন্বন্তরের নাম রৈবত কেন হল, তা মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে। মার্কণ্ডেয় বলেছেন, পঞ্চম মনু রৈবত নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর উৎপত্তির কথাও তিনি বলেছেন।

ঋতবাক নামে এক ঋষি ছিলেন। রেবতী নক্ষত্রের অন্তে তাঁর এক পুত্র জন্মে। তিনি তাব জাতকর্মাদি ক্রিয়া করলেন এবং উপনয়নও দিলেন। কিন্তু পুত্র অসচ্চরিত্র হয়ে উঠল। তার জন্মের পর থেকেই ঋষির দীর্ঘস্থায়ী রোগ হল, তাঁর পত্নীও কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে কষ্টভোগ করতে লাগলেন। এই সময়েই তাঁর পুত্র অন্য এক মুনি পুত্রের স্ত্রীকে পরিগ্রহ করল। ঋতবাক বিষণ্ন মনে বলতে লাগলেন, পুত্র না হওয়া মানুষের ভাল, কুপুত্র অমঙ্গলের কারণ। তারা পিতা মাতার আয়াস উৎপাদন করে এবং স্বর্গস্থিত পিতৃপুরুষদের অধঃপাতিত করে। কুপুত্র সুহৃদের দৈন্য, বিপক্ষের হর্ষ ও পিতা মাতার অকাল জরা উপস্থিত করে। তারপর তিনি গর্গকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যথা বিধানে ব্রত পালন করে বেদ গ্রহণের পর দার পরিগ্রহ করেছি। পুন্নাম নরকের ভয়ে পুত্রের জন্মদান করেছি, কাম চরিতার্থের জন্য নয়। তবু এই পুত্র নিজের

দোষে, না আমাব দোষে, এই রকম দুঃশীল হল? গর্গ বললেন, তোমার এই পুত্র রেবতীর অন্তে জন্মেছেন। সেই দূষিত সময়ে জন্মের জন্য এই রকম হযেছে। ঋতবাক বললেন, তবে এখনই রেবতীর পতন হোক। এই শাপ দিতেই সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দেখল, রেবতী নক্ষত্র কুমুদ পর্বতেব সকল দিকে সহসা পতিত হয়ে সমস্ত বন কন্দর ও নির্ঝব উদ্ভাসিত কবে তুলল। এব পরেই কুমুদ পর্বতের নাম হল রৈবতক এবং পৃথিবীতে এই স্থান অতি রমণীয় হল। সেই নক্ষত্রের যে কান্তি পঙ্কজিনী রূপে প্রাদুর্ভূত হল, তা থেকে এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ কবল। তাকে দেখে মহর্ষি প্রমোচ তার নাম রাখলেন রেবতী। মহর্ষিব আশ্রম ছিল নিকটে। তিনি তাকে পালন করতে লাগলেন।

সেই কন্যা যৌবনে পদার্পণ কবে আবও রূপবতী হলে ঋষি তার বিবাহেব কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু বহুকাল চিন্তা কবেও যখন কোন বর পেলেন না, তখন অগ্নিশালায় প্রবেশ করে অগ্নিকে প্রশ্ন করলেন। অগ্নি বললেন, দুর্গম নামে মহাবল প্রিয়ভাষী ও ধার্মিক রাজা তার পতি হবেন।

রাজা দুর্গম মৃগয়ার জন্য আশ্রমের নিকট এসেছিলেন। তিনি প্রিয়ব্রতের বংশে বিক্রমশীলেব পুত্র, কালিন্দী তাঁর মা। আশ্রমে ঋষিকে দেখতে না পেয়ে রেবতীকেই তিনি প্রিয়া সম্বোধন করে প্রশ্ন করলেন, মুনি কোথায়? তাঁকে আমি প্রণাম করতে চাই। ঋষি অগ্নিশালা থেকে রাজার প্রিয়া সম্ভাষণ ও কথা শুনে সত্বর বেরিয়ে এসে রাজা দুর্গমকে দেখতে পেলেন। দেখেই শিষ্য গৌতমকে বললেন, তুমি শীঘ্র রাজার জন্য অর্ঘ্য আনো। রাজা অনেক কাল পরে এসেছেন, তার ওপর আমার জামাতা। তাই আমার অর্ঘ্য দানের যোগ্য পাত্র।

কী জন্য তাঁকে জামাতা বলা হল, রাজা তাই ভাবতে লাগলেন। কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে মৌনী হয়েই অর্ঘ্য গ্রহণ

করলেন। তারপর আসন গ্রহণ করলে ঋষি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সকলের মঙ্গল তো? তোমার এই পত্নী কুশলে আছেন, আমি অন্য পত্নীদের কথা জানতে চাইছি। রাজা বললেন, আপনার প্রসাদে সবই কুশল। কিন্তু এই বনে আমার পত্নী কে, তাই জানবার কৌতূহল হচ্ছে। ঋষি বললেন, ত্রিভুবনের সেরা সুন্দরী রেবতী যে তোমার স্ত্রী, তা কি তুমি জানো না? রাজা তাঁর সমস্ত স্ত্রীর নাম জানিয়ে বললেন, রেবতী কে? ঋষি বললেন, তুমি যাকে এইমাত্র প্রিয়া বলে সম্বোধন করলে, তাকে কি ভুলে গেলে? রাজা বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমার মনে কোন দুষ্ট ভাব নেই, আপনি রুষ্ট হবেন না। ঋষি বললেন, সত্যিই তোমার কোন দুষ্ট ভাব নেই। অগ্নির প্রেরণায় তুমি এই কথা বলেছ। আমি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কে এই কন্যার পতি হবেন? অগ্নি বলেছেন, আজই তুমি এর পতি হবে। তাই আমি তোমাকে কন্যাদান করছি, তুমি গ্রহণ কর।

রাজা মৌন হয়ে রইলেন এবং ঋষি কন্যার বৈবাহিক বিধি সাধনে উদ্যত হলেন। কিন্তু কন্যা অবনত হয়ে বলল, আপনি যদি আমার প্রতি প্রীতিমান হয়ে থাকেন, তবে রেবতী নক্ষত্রে আমার বিবাহ দিন। ঋষি বললেন, চন্দ্রের সঙ্গে অবস্থিত রেবতী নক্ষত্রের পতন হয়েছে। তোমার বিবাহের অন্যান্য অনেক নক্ষত্র আছে। কন্যা বলল, সেই নক্ষত্র ছাড়া কাল বিফল বলে আমার মনে হচ্ছে। ঋষি বললেন, ঋতবাক নামে বিখ্যাত তপস্বী রেবতীর উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে নিপাতিত করেছেন। এদিকে আমিও রাজার নিকটে প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমাকে সম্প্রদান করব। তাই তুমি এই বিবাহে অমত করলে আমার সঙ্কট উপস্থিত হবে। কন্যা বলল, আমার পিতা কি ঋতবাক ঋষির মতো তপস্যা করেন নি? আমি কি কোন অধম ব্রাহ্মণের কন্যা? ঋষি বললেন, তুমি সামান্য তপস্বীর কন্যা নও, তুমি আমার কন্যা। আমি দেবতাদের সৃষ্টি করতে পারি।

কন্যা বলল, তবে আপনি রেবতীকে পুনরায় অন্তরিক্ষে সমারোহিত করে সেই নক্ষত্রে আমার বিবাহ দিচ্ছেন না কেন? ঋষি বললেন, তাই হবে। তোমার জন্য আমি রেবতীকে পুনরায় চন্দ্রমার্গে আরোপিত করব। বলে মহর্ষি প্রমোচ তপস্যার প্রভাবে রেবতী নক্ষত্রকে পুনরায় পূর্বের ন্যায় চন্দ্রের সঙ্গে সংযোজিত করে বিধান অনুসারে মন্ত্রপাঠ করে কন্যার বিবাহ দিলেন। তারপর প্রীত হয়ে জামাতাকে বললেন, তোমাকে কীরূপ যৌতুক দেব বল। দুর্লভ হলেও তা তোমাকে দেব। রাজা বললেন, আমি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে জন্মেছি। আপনার প্রসাদে আমি এমন পুত্র চাই যে মনু হবে। ঋষি বললেন, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। মনু হয়ে তোমার পুত্র সমগ্র পৃথিবী ভোগ করবে।

রাজা তখন রেবতীকে নিয়ে নিজের পুরে ফিরে গেলেন। রেবতীর গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হল, তিনিই রৈবত মনু। তিনি মানব ধর্ম বেদবিদ্যা অর্থশাস্ত্র ও যাবতীয় শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করলেন। তিনি একশো যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বলবন্ধু মহাবীর্য সুষষ্টব্য ও সত্যবাক্য রৈবত মনুর পুত্র।

পুবাণে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে দুর্গম নামে কোন রাজার নাম নেই। তাঁর পিতা বিক্রমশীলের নামেরও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই কাহিনীও কাল্পনিক বলে মনে হয়। বিশেষ করে নক্ষত্রের পতন ও তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পনা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

রৈবত ও রেবতী

রৈবত ও রেবতী নাম যে পুরাণে নেই, এ কথা ঠিক নয়। বিষ্ণুপুরাণে রেবতীর উপাখ্যান আছে। শর্যাতির পুত্রের নাম আনর্ত। আনর্তের পুত্র রেবত কুশস্থলী নামে পুরীতে বাস করতেন। রেবতের একশো পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ককুদ্মী। ককুদ্মীর কন্যা রেবতী। এই কন্যা কার উপযুক্ত এ কথা জানবার জন্য রৈবত ককুদ্মী

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মার কথায় তিনি বলরামকে তাঁর কন্যা দান করেছিলেন।

এই ঘটনা অনেক পরবর্তী কালের। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে আনর্তের পৌত্র রৈবত এবং বলরামের স্ত্রী রেবতীর মধ্যে প্রায় দু হাজার বৎসরের ব্যবধান বোঝাবার জন্য একটি রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মার সভায় গান শুনতে এই দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। এর কারণ একটিই হতে পারে। বিষ্ণু পুরাণেই এর সূত্র আছে। বলা হয়েছে যে রৈবত ককুদ্মী যে সময়ে ব্রহ্মলোকে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে পুণ্যজন নামের রাক্ষসরা কুশস্থলী ধ্বংস করে। রাজার একশো ভাই রাক্ষসদের ভয়ে নানা দেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে এই বংশের সকলেই প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিলেন এবং সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন বলেই ব্রহ্মার সভায় গন্ধর্বদেব গানের কথা বলা হয়েছে। রেবতী এই বংশেরই কন্যা এবং তাঁর পিতার নাম রৈবতও হতে পারে।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে এই ঘটনার সঙ্গে মন্বন্তরের অধিপতি রৈবতের কোন সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণ মন্বন্তর কালই অন্ধকার যুগ। তাই এই মন্বন্তরের কোন ইতিহাস পুরাণে পাওয়া যায় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চাক্ষুষ মন্বন্তর

(৪১৭১ থেকে ৩৮১৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)

চাক্ষুষ, দক্ষ প্রজাপতি ও তাঁর কন্যাবংশ

চাক্ষুষ

উত্তানপাদের বংশে চক্ষু নামে একজন রাজা হয়েছিলেন ৫০১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। তাঁর পুত্র মনুও রাজা হয়েছিলেন। পুরাণে ইনি চাক্ষুষ মনু নামে পরিচিত। কিন্তু এঁর নামে মন্বন্তরের নাম হয় নি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে যে পূর্ব জন্মে পরমেষ্ঠির চক্ষু থেকে যাঁর জন্ম হয়েছিল, পরজন্মেও তাঁর চাক্ষুষ নাম হয়েছিল। রাজর্ষি অনমিত্রের স্ত্রী ভদ্রা এক জাতিস্মর পুত্র প্রসব করেন। তাঁকে কোলে নিয়ে মা যখন আদর করছিলেন, তখন শিশু হাসছিল। মা বললেন, অকালে তোমার বোধোদয় হয়েছে দেখে আমি ভয় পাচ্ছি। পুত্র বলল, তুমি দেখছ না, সামনের ঐ বিড়ালী আমাকে খেতে চাইছে। আর জাতহারিণীও অন্তর্হিত হয়ে আছে। অথচ তুমি আমাকে নিয়ে এমন আনন্দ করছ দেখেই আমার হাসি পাচ্ছে। তোমরা সবাই স্বার্থ নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছ। ওরা এখনই আমাকে উপভোগ করতে চায়, আর তুমি ক্রমে ক্রমে আমাকে উপভোগ করবে। অথচ আমি কে তা তুমি জান না। মা বললেন, আমি কোন ফলের আশায় তোমাকে আদর করি নি, নৈসর্গিক প্রীতিতেই এ রকম করেছি। তোমার যদি এতে আনন্দ না হয়, তবে ভবিষ্যতে আমার যে স্বার্থ-লাভের সম্ভাবনা আছে তা ত্যাগ করলাম। এই বলে তিনি পুত্রকে ত্যাগ করে সূতিকা গৃহ থেকে বেরিয়ে গেলেন। মা ত্যাগ করা মাত্র জাতহারিণী তাকে হরণ করে রাজা বিক্রান্তের রাণীর শয্যার পাশে

রেখে তাঁর পুত্রকে হরণ করল এবং তাকেও অন্য গৃহে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাকে রেখে অন্য এক পুত্রকে ভক্ষণ করল। জাতহারিণীরা এই ভাবে একটির পর একটি শিশুকে হরণ করে পরস্পর পরিবর্তনের পরে তৃতীয়টি ভক্ষণ করে।

রাজা বিক্রান্ত পরম আহ্লাদে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারের পর তার নামকরণ করলেন আনন্দ। উপনয়ন সংস্কারের পর গুরু তাকে বললেন, প্রথমে মাকে বন্দনা ও অভিনন্দন কর। আনন্দ গুরুর কথায় হেসে বলল, জননী অথবা পালনী, কোন্ মায়ের বন্দনা করব ? গুরু বললেন, রাজা বিক্রান্তের প্রধান রাণী জারূথের কন্যা হৈমিনী তোমার জননী, তুমি তাঁর বন্দনা কর। আনন্দ বলল, বিশাল গ্রাম-বাসী বোধের পুত্র চৈত্র এঁর গর্ভে জন্মেছে। গুরু বললেন, চৈত্র কে আর তুমি কোথায় জন্মেছ এবং কোথা থেকে কেন এখানে এসেছ ? আনন্দ বলল, আমার জন্ম অবনীপতি ক্ষত্রিয়ের গৃহে তাঁর পত্নী গিরি-ভদ্রার গর্ভে। জাতহারিণী আমাকে এখানে এনে হৈমিনীর পুত্রকে বোধের গৃহে রেখে তাঁর পুত্রকে ভক্ষণ করেছে। এবারে আপনি বলুন, আমি কোন্ মায়ের বন্দনা করব! গুরু বললেন, বৎস, আমি ভেবে কিছু স্থির করতে পারছি না। আনন্দ বলল, সংসারই এই রকম। কেউ কারও পুত্র বা বান্ধব নয়। জন্মের পরে যে সম্বন্ধ হয়, মৃত্যু তা বিনাশ করে। আমি এখন তপস্যা করব, অতএব রাজার পুত্রকে আপনি বিশাল গ্রাম থেকে আনুন। এই কথা শুনে রাজা রাণী ও বন্ধুরা বিস্ময়াবিষ্ট হলেন এবং আনন্দকে বনে যাবার অনুমতি দিলেন। তারপর চৈত্রকে এনে রাজযোগ্য করে পালন করলেন।

এ দিকে আনন্দ বালক বয়সেই মহাবনে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়ে মুক্তির অন্তরায় ক্ষয় করতে লাগল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাকে বললেন, বৎস, কেন তুমি তপস্যা করছ ? আনন্দ বলল, মুক্তির অন্তরায় স্বরূপ কর্মের ক্ষয় ও আত্মশুদ্ধির জন্য তপস্যা করছি। ব্রহ্মা বললেন, কর্মবান ব্যক্তির সে অধিকার নেই, সে মুক্তি লাভের যোগ্য হতে পারে

না। তোমাকে ষষ্ঠ মনু হতে হবে। তাই তপস্যায় তোমার প্রয়োজন নেই, মনুর কাজ করলেই তোমার মুক্তি হবে। ব্রহ্মার এই কথায় আনন্দ তপস্যায় বিরত হয়ে মনুর কাজ করতে রাজী হযে প্রস্থান করল।

ব্রহ্মা তাঁকে চাক্ষুষ নামে সম্বোধন করেছিলেন। তাতেই তিনি তাঁব পূর্ব নামে প্রখ্যাত হলেন। রাজা উগ্রেব কন্যা বিদর্ভার সঙ্গে তাঁব ।ববাহ হল। উরু পুরু শতদ্যুম্ন প্রভৃতি চাক্ষুষ মনুর পুত্র। সকলেই পৃথিবী পালন করেছিলেন।

চাক্ষুষ মনুব কাহিনীও কল্পিত বলে মনে হয়। এ নামের কোন বাজা রাজত্ব কবেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাজা চক্ষুর পুত্র মনু রাজা হয়েছিলেন ঠিকই, তিনি চাক্ষুষ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ঔত্তমি মন্বন্তবের মানুষ। তাঁর রাজত্বকাল ৭৯৯১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এব জন্যই বলা হয়েছে যে এ ঘটনা পরজন্মের অর্থাৎ যে চাক্ষুষের নামে মন্বন্তর তিনি অন্য লোক এবং তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীব সমর্থন পুবাণে নেই। এই কাহিনীর মধ্যে সেকালে প্রচলিত কিছু সংস্কার ছাড়া আর কোন সত্য পাওয়া যায় না।

দক্ষ প্রজাপতি ও তাঁর কন্যাবংশ

এইখানে প্রাচীনবর্হি ও প্রচেতাদের নিয়ে পুনরায় কিছু আলোচনার অবকাশ আছে। সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে এঁরা তামস মন্বন্তরে বিদ্যমান ছিলেন এবং প্রচেতারা দশ হাজার বছর অর্থাৎ দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। এই কালই ইতিহাসের অন্ধকার যুগ। কণ্ডু মুনির কাহিনী অবতারণা করে বলা হয়েছে যে এই কালের পরিমাণ নয় শো সাতাশি বৎসর। প্রচেতারা নিশ্চয়ই তত দিন তপস্যারত ছিলেন না। তাঁরা নিশ্চয়ই এর পূর্বে বর্তমান ছিলেন না, ছিলেন পরে। পরে থাকলেই মারিষা নামের কন্যাকে বিবাহ করে দক্ষের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই কথা

মেনে নিলে প্রচেতাদের পিতা প্রাচীনবর্হিও যে অন্ধকার যুগের পরেই বর্তমান ছিলেন, তা মেনে নিতে হয়। অর্থাৎ অন্তর্ধান নামে বিখ্যাত পৃথুর পুত্র বিজিতাশ্ব তাঁর পুত্র হবির্ধানকে রেখে অন্তর্ধান হয়েছিলেন। এই ঘটনার নয় শো সাতাশি বৎসর পরে এই বংশেরই একজন প্রাচীনবর্হি নামে আবিষ্কৃত হলেন। দেশ তখন প্রাচীনবর্হিতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল বলেই হয়তো রাজাকে প্রাচীনবর্হি বলা হয়েছে। পুরাণে আছে যে হবির্ধানের পুত্রের নাম ছিল বর্হিষদ, তিনি ক্রিয়া কাণ্ড ও যোগ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন এবং লোকে তাঁকেই প্রাচীনবর্হি বলত। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে হবি বর্হি এবং ক্রিয়াকাণ্ড ও যোগের সঙ্গে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। হবির অর্থ ঘৃত, তার প্রয়োজন যজ্ঞে। বর্হি কুশকে বলে, বৈদিক ক্রিয়া কর্মে কুশের প্রয়োজন। এই শব্দগুলির ব্যবহার দেখে সহজেই অনুমান করা চলে যে পুরাণকার রূপকের ছলে বলতে চেয়েছেন যে রাজা বিজিতাশ্ব অন্তর্ধান হবার পর তাঁর বংশধররা যাগ যজ্ঞ বা তপস্যা করেই দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন। দেশে অগ্ন্যুৎপাত অগ্নিকাণ্ড বা জলপ্লাবনে সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নয় শো সাতাশি বৎসরের কোন সংবাদ রাখা সম্ভব হয় নি। তার পর অন্তর্ধানের এক বংশধর সমুদ্রতীরবাসী কন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করেছিলেন। তিনিই প্রাচীনবর্হি নামে পরিচিত এবং প্রচেতারা তাঁরই পুত্র। প্রচেতা নামের এই দশজন পিতার আদেশে প্রজা সৃষ্টি করতে গিয়ে সমুদ্রের তীরে কন্যা অন্বেষণ করেছিলেন দীর্ঘকাল। এই ঘটনাই তাঁদের তপস্যা নামে অভিহিত। ব্যর্থ হয়ে তাঁরা ভাবলেন যে দিগন্ত বিস্তৃত অরণ্য ধ্বংস করে অগ্রসর হলে বোধ হয় লোকালয় পাওয়া যাবে এবং বিবাহযোগ্য কোন কন্যাও পাওয়া যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা অরণ্য ধ্বংস করতে আরম্ভ করেই সংবাদ পেলেন মারিষা নামের এক অরণ্যবাসী কন্যার। দশজন প্রচেতা একটি কন্যাকেই বিবাহ করলেন। জন্ম হল দক্ষের।

ইনি দ্বিতীয় দক্ষ। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মার পুত্র হয়েও মহাদেবকে অবজ্ঞা করার জন্য প্রথম দক্ষ প্রচেতাদের পুত্র রূপে মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে এই দক্ষই প্রজা সৃষ্টি করেন। কর্মের অনুষ্ঠানে দক্ষতার জন্যই এঁর দক্ষ নাম হয়।

দক্ষ প্রজাপতির কাল সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। রাজা বৃহদ্বল যে কৃষ্ণের সমসাময়িক, এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে পুরাণে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৪১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। তাঁর জন্ম ইক্ষ্বাকু বংশে, ইক্ষ্বাকুর পর ৯৩ পর্যায়ে। ইক্ষ্বাকুর পিতা বৈবস্বত মনু ছিলেন দক্ষ প্রজাপতির কন্যা অদিতির পৌত্র। অর্থাৎ দক্ষ আরও ৪ পুরুষ পূর্বে। এই ৯৭ পুরুষ গড়ে ২৫ বৎসরের হলে বৃহদ্বলের ২৪২৫ বৎসর পূর্বে দক্ষ বিদ্যমান ছিলেন। কৃষ্ণের ন্যায় বৃহদ্বলেরও জন্ম ১৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ধরলে দক্ষের জন্ম ৩৮৮৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে।

কল্পের হিসাবে আমরা পাই যে বৈবস্বত মনুর কাল আরম্ভ ৩৮১৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে। দক্ষ বৈবস্বতের তিন পুরুষ অর্থাৎ ৭৫ বৎসর পূর্বে ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর কাল ৩৮৮৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। বৃহদ্বলের জন্ম কাল যখন নিশ্চিত ভাবে জানা নেই, তখন বৈবস্বত মনুর কাল থেকে গণনা করে দক্ষের কাল ৩৮৮৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ ধরাই যুক্তিসঙ্গত। এর পর থেকেই এ দেশে জনসংখ্যা অব্যাহত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

যাঁরা পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁরা জানেন যে সারা বিশ্বে এক সময়ে যে প্রবল বন্যায় দেশ ও মানুষ ভেসে গিয়েছিল, সেই প্লাবন হয়েছিল নিশ্চিত ভাবে ৩৮৮৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের অনেক আগে। ভারতের যে সভ্যতা সিন্ধু উপত্যকা থেকে চারিদিকে বিস্তৃত হয়েছিল, তা চাপা পড়েছিল এই সময়ের বন্যায়। সেখানকার মানুষ কীভাবে কেমন করে কোথায় আশ্রয় নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিল তা জানবার উপায় নেই। ইলাবৃত বর্ষ থেকে দেবতা জাতির মানুষ কাশ্মীরের পথে ভারতে আসত। তারা যাদের দেখেছিল, তাদের

দস্যু নামে অভিহিত করেছে। কখনও বলেছে দাস। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, হঠিয়ে দিয়েছে তাদের। ঋগ্বেদের মন্ত্রে এই দস্যুদের কথা আছে। পুরাণ যখন রচিত হয়েছে, তখন তারা মিশে গেছে আর্য নামে পরিচিত দেবতা জাতির সঙ্গে। তাই পুরাণে দস্যুদের কোন কাহিনী নেই, আছে শুধু নিজেদেরই কাহিনী। বেদ রচনার কাল অনেক পরবর্তী যুগে। বেদের ঋষিরা তাই সিন্ধু সভ্যতার কথা কিছুই জানতেন না।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রচেতাদের আরও কিছু কথা আছে। দক্ষের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পরে প্রচেতাদের বিবেক জ্ঞান জাগ্রত হল। তাঁরা তখন সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন এবং পশ্চিম দিকে সমুদ্রের উপকূলে জাজলি ঋষির সিদ্ধাশ্রমে এসে সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। একদিন দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখে তাঁরা তাঁকে প্রণাম করে বললেন, শিব ও বিষ্ণু আমাদের যে তত্ত্বজ্ঞান দিয়েছিলেন, সংসারে আসক্ত হয়ে আমরা তা ভুলে গেছি। আমরা যাতে এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে পারি তার উপদেশ দিন। নারদ বললেন, যার দ্বারা হরির আরাধনা হয়, মানুষের সেই জন্ম কর্ম আয়ু মন ও বাক্যই সার্থক। হরিই সর্বভূতের আত্মা, আর জীবের হৃদয়স্থ আত্মা সবারই প্রিয়। হরির অর্চনাতেই সমস্ত দেবতার পূজা হয়। হৃদয় থেকে সমস্ত কামনা বাসনা দূর হলেই হরি আর তাকে ত্যাগ করেন না। ভক্তির বসেই ভগবান তৃপ্ত হন। নারদ এই উপদেশ দিলে প্রচেতারা এই ভাবে ধ্যান করে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হলেন।

বিষ্ণু পুরাণে পরাশর বলেছেন, দক্ষই পূর্বে ব্রহ্মার পুত্র হয়েছিলেন। সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য তিনি বহু পুত্র উৎপাদন করেন। ব্রহ্মার আদেশে তিনি মনের দ্বারা চর অচর দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি সৃষ্টি করবার পর ষাট কন্যা সৃজন করেন। এই কন্যার দশটি ধর্মকে, তেরটি কশ্যপকে ও সাতাশটি সোমকে দিয়েছিলেন। এই কন্যারাই দেব দৈত্য নাগ গো পক্ষী গন্ধর্ব অপ্সরা ও দানবাদির জননী। এর পর

থেকেই প্রজারা মৈথুন-সম্ভব হল। এর আগে সংকল্প দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা এবং তপস্বীদের তপোবিশেষে প্রজা সৃষ্টি হত।

পরাশরের এই কথা শুনে মৈত্রেয় বললেন, আমি শুনেছিলাম যে ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষের জন্ম হয়। তিনিই আবার প্রচেতাদের পুত্র হলেন কী করে? আমার আর এক সংশয় হল, যিনি সোমের দৌহিত্র, তিনিই আবার তাঁর শ্বশুর হলেন কী ভাবে?

এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে না পেরে পরাশর গোঁজামিল দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রাণীদের মধ্যে উৎপত্তি ও বিনাশ নিত্য, মানে প্রবাহ রূপে অবিচ্ছিন্ন। তাই দিব্য চক্ষু ঋষিরা এ বিষয়ে মোহিত হন না। দক্ষাদি ঋষিরা যুগে যুগে উৎপন্ন হন ও পুনরায় লীন হন। কে বড় আর ছোট কে, এ বিচার পুরাকালে ছিল না। তপস্যার প্রভাবেই লোকে বড় হত।

মৈত্রেয় মেনে নিয়েছিলেন এই কথা। বলেন নি যে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ ও প্রচেতাদের পুত্র দক্ষ এক ব্যক্তি নন। এই দুজনের কালের ব্যবধান দু হাজার বৎসরেরও বেশি। যে দক্ষের জন্ম ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ থেকে তিনি প্রথম দক্ষ। দ্বিতীয় দক্ষ প্রচেতাদের পুত্র। আবার যে সোম প্রচেতাদের বিবাহ দিয়েছিলেন কন্যাসমা মারিষার সঙ্গে, তিনি অন্য ব্যক্তি। হয়তো এই বংশের আর একজন সোমের সঙ্গে দ্বিতীয় দক্ষ তাঁর কন্যাদের বিবাহ দিয়েছিলেন। এই সোমই পরবর্তী কালে দেবতায় পরিণত হয়েছেন এবং তারপর আকাশের চন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছেন। কশ্যপেরও এক পুত্র বিবস্বান দক্ষ দুহিতা অদিতির গর্ভে জন্মে ঠিক একই ভাবে প্রথমে দেবতা ও পরে আকাশের সূর্য হয়েছেন। কালক্রমে লোক আকাশের চন্দ্র ও সূর্যকে সোম ও বিবস্বানও বলেছে। অর্থাৎ যিনি চন্দ্র তিনিই সোম, যিনি সূর্য তিনিই বিবস্বান। মানুষই স্থান পেয়েছেন আকাশে। এই ভাবে সোম নামের কোন ব্যক্তি আকাশের চন্দ্রে পরিণত হবার পর দক্ষের কন্যারা হয়েছেন নক্ষত্র। দক্ষের কটি কন্যাকে সোম

বিবাহ করেছিলেন, তা ভুলে গিয়ে বলা হল যে দক্ষ তাঁর সাতাশটি কন্যা চন্দ্রের হাতে দিয়েছিলেন। দক্ষ রোহিনীকে বেশি ভাল-বাসতেন বলে একটি কাহিনীও রচিত হল এই নিয়ে।

এইভাবেই বলা হয়েছে যে কশ্যপ দক্ষের তেরোটি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের নাম অদিতি দিতি কালা অরিষ্টা সুরমা সুরভি বিনতা তাম্রা ক্রোধবশা ইরা কদ্রু ও মুনি। পূর্বের মন্বন্তরে তুষিত নামে যে দ্বাদশ দেবতা ছিলেন, তাঁরাই স্থির করেছিলেন যে বৈবস্বত মন্বন্তরে তাঁরা অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন এবং তাই করেছিলেন। অদিতির এই দ্বাদশ পুত্রের নাম বিষ্ণু শক্র অর্যমা ধাতা ত্বষ্টা পূষা বিবস্বান সবিতা মিত্র বরুণ অংশ ও ভব। এঁরা দ্বাদশ আদিত্য নামে পরিচিত।

বিষ্ণুপুরাণে কশ্যপের অন্যান্য পত্নীদের কথাও আছে। দিতির গর্ভের দুই দুর্জয় পুত্র হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ এবং সিংহিকা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। অপর পত্নী দনুর পুত্রদের নাম দ্বিমূর্ধা শম্বর অয়োমুখ শঙ্কুশিরা কপিল একচক্র মহাবাহু তারক মহাবল স্বর্ভানু বৃষপর্বা পুলোমা ও বিপ্রচিত্তি। কশ্যপ বৈশ্বানরের দুই কন্যা পুলোমা ও কালকাকেও বিবাহ করেছিলেন। এঁদের গর্ভে ষাট হাজার সন্তান জন্মে। তারা পৌলমা ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ।

কশ্যপের স্ত্রী তাম্রার শুকী শ্যেণী ভাসী সুগ্রীবী শুচি ও গৃধ্রী নামে ছয় কন্যা জন্মে। অন্য বিনতার দুই পুত্র গরুড় ও অরুণ। খেচর ও সর্পরা সুরসার পুত্র। কদ্রুর গর্ভেও অনেক সর্পের জন্ম হয়। তাদের মধ্যে প্রধান শেষ বাসুকী তক্ষক শঙ্খ শ্বেত মহাপদ্ম কম্বল অশ্বতর এলাপত্র নাগ কর্কোটক ও ধনঞ্জয়। ক্রোধবশার বংশ ক্রোধবশ, তারা দংষ্ট্রাযুক্ত ও মাংসাশী। পক্ষীরাও এই বংশে উৎপন্ন হয়েছে। ক্রোধা পিশাচদের, সুরভী গো মহিষদের, ইরা বৃক্ষলতাদি, খসা যক্ষ রক্ষদের, মুনি অপ্সরাদের এবং অরিষ্টা গন্ধর্বদের প্রসব করেন। এই সৃষ্টি স্বারোচিষ মন্বন্তরের এবং স্থাবর জঙ্গম কশ্যপের বংশ বলে কীর্তিত।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে দ্বিতীয় দক্ষের বংশ বিস্তারের বিবরণ সবিস্তারে আছে। দক্ষের সৃষ্ট প্রজাতেই ত্রিলোক পূর্ণ হয়েছে। প্রথমে তিনি আকাশ ভূমি ও জল নিবাসী দেবতা অসুর ও মানুষ মন দিয়ে সৃষ্টি করেন। কিন্তু প্রজা বৃদ্ধি হতে না দেখে বিন্ধ্য পর্বতের সমাপে অঘমর্ষণ তীর্থে গিয়ে তপস্যা আরম্ভ করেন। এতে হরি তুষ্ট হয়ে তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, তুমি পঞ্চজন প্রজাপতির কন্যা অসিক্লিকে পত্নী রূপে গ্রহণ কর এবং রতি ধর্মে আসক্ত হয়ে প্রজা সৃষ্টি কর। এই ভাবে তোমাব পববর্তী প্রজারাও আমার মায়ায় স্ত্রী পুরুষের মিলনেই বৃদ্ধি লাভ করবে। প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণুর মায়ায় শক্তিশালী হযে পঞ্চজনের কন্যা অসিক্লিকে নিজের পত্নী রূপে গ্রহণ করে হর্যশ্ব নামে অযুত পুত্রের জন্ম দিলেন। এই কাহিনী আগেই বলা হয়েছে। হর্যশ্ব ও সবলাশ্ব নামের পুত্ররা নারদের উপদেশে বিবাগী হয়ে যাবার পব প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার অনুরোধে ষাটজন কন্যার জন্ম দিলেন। তাদের মধ্যে দশটি ধর্মকে, তেরোটি কশ্যপকে, সাতাশটি চন্দ্রকে, দুটি ভূত নামের মুনিকে, দুটি অঙ্গিরাকে দুটি কৃশাশ্বকে ও অবশিষ্ট চারটি তার্ক্ষ্য নামে কশ্যপকে সম্প্রদান কবেন।

ধর্মকে যে দশটি কন্যা দান কবেছিলেন, তাদের নাম ভানু লম্বা ককুদ যামি বিশ্বা সাধ্যা মরুত্বতী বসু মুহূর্তা ও সংকল্পা। ভানুর পুত্র দেব ঋষভ ও তাঁর পুত্র ইন্দ্রসেন। লম্বার পুত্র বিদ্যোত ও তাঁর পুত্র মেঘগণ। ককুদের পুত্র সঙ্কট, তাঁর পুত্র কীকট এবং এঁর থেকেই ভূতলস্থ দুর্গাভিমানী দেবতাদের উৎপত্তি হয়েছিল। যামির পুত্র স্বর্গ ও তাঁর পুত্র নন্দী। বিশ্বার পুত্র বিশ্বদেবগণ নিঃসন্তান। সাধ্যার পুত্র সাধ্যগণ ও তাঁর পুত্র অর্থ সিদ্ধি। মরুত্বতীর মরুত্বান ও জয়ন্ত নামে দুই পুত্র, জয়ন্ত বাসুদেবের অংশ। মুহূর্তকালের অধিষ্ঠাতা দেবতারা মুহূর্তার পুত্র। সংকল্পার পুত্র সঙ্কল্প ও তাঁর পুত্র কাম। বসুর পুত্র অষ্ট বসু।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে প্রথম দক্ষের ও দ্বিতীয় দক্ষের কন্যাদের নাম এক নয় এবং ধর্মের নর ও নারায়ণ নামে কোন পুত্রের নাম উল্লেখ করা হয় নি।

অষ্ট বসুর নাম দ্রোণ প্রাণ ধ্রুব অর্ক অগ্নি দোষ বাস্তু ও বিভাবসু। দ্রোণের পত্নী অভিমতীর গর্ভে হর্ষ শোক ও ভয় প্রভৃতি সন্তানদের জন্ম। প্রাণের স্ত্রী ঊর্জস্বতীর সহ আয়ু ও পুরোজব নামে তিন পুত্র। পুরাভিমানী দেবতারা ধ্রুবের স্ত্রী ধরণির সন্তান। অর্কের স্ত্রী চামলা তর্ষ প্রভৃতি পুত্রদের জন্ম দেন। দ্রবণিক প্রভৃতির জন্ম অগ্নির স্ত্রী ধারার গর্ভে। কৃত্তিকার পুত্র স্কন্দও অগ্নির পুত্র রূপে প্রসিদ্ধ, স্কন্দ থেকেই বিশাখ প্রভৃতির জন্ম হয়েছিল। দোষের স্ত্রী শর্বরীর পুত্র শিশুমার হরির অংশ। বসুর স্ত্রী আঙ্গিরসীর গর্ভে শিল্পাচার্য বিশ্বকর্মার জন্ম। বিশ্বকর্মার পুত্র চাক্ষুষ মনু। বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ চাক্ষুষ মনুর পুত্র। বিভাবসুর স্ত্রী উষা ব্যুষ্ট রোচিষ ও আতপ নামে তিন পুত্রের জন্ম দেন। আতপের পুত্র পঞ্চযাম। এই দিবসাভিমানী দেবতার প্রেরণায় প্রাণীরা দিনে কর্মরত থাকে।

অষ্টবসুর সন্তান সন্ততির নামেও কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ ধর্মের পত্নী বিশ্বা ও সাধ্যার পুত্র বলা হয়েছিল। এখানে তারা চাক্ষুষ মনুর পুত্র এবং চাক্ষুষ মনু-শিল্পাচার্য বিশ্বকর্মার পুত্র। আরও দেখা যাচ্ছে যে ধারা অগ্নির স্ত্রী এবং কৃত্তিকার পুত্র স্কন্দও অগ্নির পুত্র রূপে প্রসিদ্ধ। কৃত্তিকা চন্দ্রের স্ত্রী। নানা রকমের উপাখ্যান থেকে এই সব সংগৃহীত হয়েছে।

ভূতের স্ত্রী স্বরূপ কোটি কোটি রুদ্রের জন্ম দেন। এঁরা একাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত। এঁদের পার্ষদ প্রেত ও বিনায়করা ভূতের অন্য স্ত্রীর সন্তান।

অঙ্গিরার দুই পত্নীর নাম স্বধা ও সতী। স্বধার পুত্র পিতৃগণ এবং সতী অথর্বাঙ্গিরস নামে বেদকে পুত্র রূপে লাভ করেন। কৃশাশ্বের

দুই পত্নী অর্চি ও ধিষণা। অর্চির গর্ভে ধূমকেতু এবং ধিষণার গর্ভে বেদশিরা দেবল বয়ুন ও মনুর জন্ম হয়েছে।

তার্ক্ষ্য নামধারী কশ্যপের চার পত্নীর নাম বিনতা কদ্রু পতঙ্গী ও যামিনী। পতঙ্গী পক্ষীদের ও যামিনী শলভ বা ফড়িংদের জননী। বিনতা বিষ্ণুর বাহন গরুড় ও সূর্যের সারথি অরুণের জন্ম দেন এবং কদ্রু অসংখ্য সর্প প্রসব করেন।

কৃত্তিকা প্রভৃতি তারকারা চন্দ্রের পত্নী হলেও দক্ষের অভিশাপে চন্দ্র ক্ষয়রোগগ্রস্ত হওয়াতে তাঁদের কোন সন্তান হয় নি।

কশ্যপের পত্নীদের নাম অদিতি দিতি দনু কাষ্ঠা অরিষ্টা সুরসা ইলা মুনি ক্রোধবশা তাম্রা সুরভি সরমা তিমি। তিমি থেকে জলজন্তু ও সরমা থেকে বাঘ সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর উৎপত্তি হয়েছে। সুরভির সন্তান গো মহিষাদি দুই খুরের চতুষ্পদ প্রাণী, শ্যেন গৃধ্র প্রভৃতি তাম্রার সন্তান এবং মুনির গর্ভে অপ্সরাদির সৃষ্টি হয়েছে। স্কন্দ শূক প্রভৃতি সর্প ক্রোধবশার সন্তান, ইলা বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদের জননী এবং রাক্ষসরা সুরসার গর্ভে উৎপন্ন হয়েছে। অরিষ্টা গন্ধর্বদের জননী, কাষ্ঠার সন্তান এক খুরের চতুষ্পদরা। দনুর পুত্রের সংখ্যা একষট্টি, তাদের মধ্যে প্রধান হল দ্বিমূর্ধা শম্বর অরিষ্ট হয়গ্রীব বিভাবসু অয়োমুখ শঙ্কুশিরা স্বর্ভানু কপিল অরুণ পুলোমা বৃষপর্বা একচক্র অনুতাপন ধূম্রকেশ বিরূপাক্ষ বিপ্রচিত্তি ও দুর্জয়। স্বর্ভানুর কন্যা সুপ্রভাকে নমুচি ও বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে নহুষের পুত্র যযাতি বিবাহ করেন।

অদিতির পুত্রদের নাম বিবস্বান অর্যমা পূষা ত্বষ্টা সবিতা ভগ ধাতা বিধাতা বরুণ মিত্র শক্র ও উরুক্রম। বিবস্বানের স্ত্রী সংজ্ঞা শ্রাদ্ধদেব মনু এবং যম ও যমী নামে যমজ সন্তান প্রসব করেন। তারপর তিনিই ঘোটকী রূপে অশ্বিনীকুমার যুগলের জন্ম দিয়েছিলেন। ছায়া বিবস্বানের ঔরসে শনি ও সাবর্ণি মনু নামে দুই পুত্র ও তপতী নামে এক কন্যা লাভ করেন। তপতী সংবরণকে পতি রূপে বরণ করেন।

দৈত্যদের কনিষ্ঠা ভগিনী রচনা ত্বষ্টার পত্নী। তাঁর গর্ভে ত্বষ্টার সন্নিবেশ ও বিশ্বরূপ নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের বর্ণনায় একটি সম্পূর্ণ নূতন তথ্য পাওয়া যায়। তার্ক্ষ্য নামধারী এক কশ্যপ দক্ষের যে চারটি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, তাঁদের নাম বিনতা কদ্রু পতঙ্গী ও যামিনী এবং কশ্যপের পত্নীদের নাম অদিতি দিতি দনু কাষ্ঠা অরিষ্ঠা সুরসা ইলা মুনি ক্রোধবশা তাম্রা সুরভি সরমা ও তিমি। সাধারণ ভাবে বিনতা ও কদ্রুও কশ্যপের পত্নী বলে স্বীকৃত। কশ্যপ ও তার্ক্ষ্য নামধারী কশ্যপের কী পার্থক্য তা জানা যায় না। কশ্যপ মরীচির পুত্র। তার্ক্ষ্যও এই বংশজাত কিনা তা জানা সম্ভব নয়। শুধু এই সন্দেহ হয় যে, কশ্যপ নামে হয়তো একাধিক ব্যক্তি ছিলেন, কশ্যপ গোত্রীয় বলে হয়তো তাঁরাও কশ্যপ নামে অভিহিত হতেন। কশ্যপের পত্নীদের নাম নিয়েও মতান্তর আছে দেখা যায়।

আর একটি কথা এই যে মানুষ পিতা মাতার সন্তান পশু পক্ষী বা উদ্ভিদ হতে পারে না। এ সমস্তই কল্পিত হয়েছে। দক্ষ প্রজাপতিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, এই কথা বোঝাবার জন্যই এই অদ্ভুত কল্পনা। কিন্তু কশ্যপের পত্নীরাই যে সমাজে এক একটি জাতির সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে অদিতির পুত্ররা আদিত্য বা দেবতা বলে পরিচিত হয়েছেন, দিতির সন্তানরা দৈত্য, দনুর পুত্ররা দানব এবং সুরসার পুত্ররাই বোধ হয় রাক্ষস। এই ভাবে অরিষ্টার পুত্ররা গন্ধর্ব ও মুনির কন্যারা অপ্সরা হয়েছে। কদ্রুর সন্তানরা নাগ জাতি এবং বিনতার পুত্র গরুড় বা অরুণ পক্ষী নয়, তারাও মানুষ।

বিষ্ণু পুরাণে শক্র অদিতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনিই ইলাবৃত বর্ষ অধিকার করে ইন্দ্র পদ লাভ করেছিলেন এবং ইন্দ্র নামেই পরিচিত। শক্র নাম পুরাণে বিশেষ প্রচলিত হয় নি। তেমনি উরুক্রম নামও। অদিতির কনিষ্ঠ পুত্র উরুক্রম বামন নামে বিখ্যাত। তিনিই বলির

নিকট ত্রিপাদ ভূমি চেয়ে তাঁকে বন্ধন করেছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিবস্বান অদিতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি অন্তরীক্ষে অর্থাৎ হিমালয় ও ইলাবৃত বর্ষের মাঝখানে গন্ধর্বদের রাজা হয়েছিলেন। বিবস্বানেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রাদ্ধদেব মনু। ইনিই বৈবস্বত মনু নামে পরবর্তী মন্বন্তরের অধিপতি হয়েছিলেন। বিবস্বানের অন্য এক পুত্রের নাম সাবর্ণি মনু। বৈবস্বতের পর তাঁর মন্বন্তর হবার কথা ছিল। কিন্তু মন্বন্তর গণনা পরিত্যক্ত হয়েছিল বলে বৈবস্বতের পর আর কোন মন্বন্তর চালু হয় নি।

এই প্রসঙ্গে ধর্ম যুগের কথা বলাও আবশ্যক। কল্পের আরম্ভে যে কৃত বা সত্য যুগের আরম্ভ হয়েছিল, তা দু হাজার বৎসর পর শেষ হয়ে ত্রেতা যুগের আরম্ভ হয়। অর্থাৎ ত্রেতা যুগের আরম্ভ কাল (৫৯৫৮—২০০০=) ৩৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে দক্ষ প্রজাপতির কাল ৩৮৮৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এই হিসাবে স্বীকার করতে হয় যে মহাপ্লাবনের পর অন্ধকার যুগের অবসানে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে ত্রেতা যুগের আরম্ভে। প্রাচীনবর্হি ও প্রচেতারা ত্রেতা যুগেরই মানুষ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বৈবস্বত মন্বন্তর

(৬৮১৪ থেকে ৩৪৫৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)

সূর্য ও বিবস্বান, সূর্য ও চন্দ্র বংশ, ভবিষ্য মনু

সূর্য ও বিবস্বান

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মার্কণ্ডেয় মৈত্রেয়কে বলছেন, সম্প্রতি যে মনুর আবির্ভাব হয়েছে, তার নাম বৈবস্বত মনু। এই বারে এই মন্বন্তরের কথা বলছি।

এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে মার্কণ্ডেয় নিজে এই মন্বন্তরের মানুষ। এই সময়েই তিনি মৈত্রেয়কে ভারতের ইতিহাস বলেছিলেন। তার পর এই সব কাহিনী মুখে মুখে চলে এসেছে। লিপিবদ্ধ হবার তারিখ জানা নেই, তা জানবার খুব একটা প্রয়োজনও নেই। শুধু এইটুকু মনে রাখলেই চলবে যে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে এই পুরাণ রচিত হয়েছে এবং এর জন্য কিছু ঐতিহাসিক তথ্য বিকৃত হবার ও পরবর্তীকালের ঘটনা সংযোজিত হবার সম্ভাবনা আছে।

মার্কণ্ডেয় বলেছেন, বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্যের পত্নী। বিশ্বকর্মা বসুর পুত্র এবং সূর্য বা বিবস্বান অদিতির পুত্র। বিবস্বান তখনও আকাশের সূর্য ছিলেন না, এই কথা মনে রাখতে হবে। সংজ্ঞার গর্ভে মনুর জন্ম এবং বিবস্বানের পুত্র বলেই তাঁর নাম বৈবস্বত। মার্কণ্ডেয় বলেছেন, সূর্যের দৃষ্টিপাতেই সংজ্ঞা দু চোখ নিমীলিত করতেন বলে ক্রুদ্ধ হয়ে সূর্য বলেন, আমাকে দেখলেই তুমি সর্বদা নেত্র সংযম কর, তাই তুমি প্রজা সংযমন যমকে প্রসব করবে। এই কথায় ভয় পেয়ে সংজ্ঞা চপল দৃষ্টিতে তাকালেন। তাই দেখে সূর্য বললেন, এখন তুমি বিলোল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছ, তোমার কন্যা হবে একটি চঞ্চল

স্বভাবের নদী। এই পাপের ফলেই সংজ্ঞার যম ও যমুনা নামে পুত্র ও কন্যার জন্ম হয়। সংজ্ঞাও অতি কষ্টে সূর্যের তেজ সহ্য করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এই তেজ সহ্য করতে না পেরে পিতার আশ্রয় গ্রহণই প্রশস্ত মনে করলেন। তখন তিনি নিজের দেহকে ছায়া রূপে নির্মাণ করে তাকে বললেন, তুমি এই গৃহে থাকবে এবং পুত্রদের প্রতি আমার মতোই ব্যবহার করবে। সূর্যকে আমার কথা বলবে না, বলবে তুমিই সংজ্ঞা। ছায়া বলল, সূর্য আমার কেশাকর্ষণ বা আমাকে শাপ না দেওয়া পর্যন্ত তোমার আদেশ পালন করব।

এব পব সংজ্ঞা পিতাব গৃহে চলে এলেন। পিতা বহু মানে তাঁর পূজা করলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে বললেন, তোমাকে দেখলে আমার অনেক দিন মুহূর্তের অর্ধেক বলে মনে হয়। কিন্তু বেশি দিন পিতার গৃহে থাকা ভাল দেখায় না, তুমি স্বামীর গৃহে যাও। আমাকে দেখবার জন্য আবার এসো। পিতাব আজ্ঞায় সংজ্ঞা 'যে আজ্ঞা' বলে উত্তর করুতে গিয়ে বড়বা অর্থাৎ অশ্বরূপ ধারণ করে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হলেন।

এ দিকে দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে সূর্যের দুই পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হল। কিন্তু ছায়া নিজের সন্তানদের মতো সংজ্ঞার সন্তানদের প্রতি বাৎসল্য প্রকাশ করতেন না। মনু তা ক্ষমা করলেও যম তা পারলেন না, ক্রুদ্ধ হয়ে মাকে পদাঘাত করবেন বলে পা তুললেও সামলে নিলেন। কিন্তু তা দেখে ছায়া বললেন, আমাকে পদাঘাতে উদ্যত হয়েছিলে বলে তোমার এই পা পতিত হবে। মায়ের এই শাপে ভীত হয়ে যম পিতাকে গিয়ে বললেন, বাৎসল্য ত্যাগ করে মা শাপ দেন, এ রকম কেউ দেখে নি। মনু বলে, উনি আমাদের মা নন। এখন আমারও তাই মনে হচ্ছে।

পুত্রের এই কথা শুনে সূর্য ছায়াকে ডেকে বললেন, সংজ্ঞা কোথায় গেছেন? ছায়া বললেন, আমিই বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা, আপনার পত্নী ও এই সন্তানদের জননী। সূর্য বার বার প্রশ্ন করার পরেও

ছায়া যখন সত্য কথা বললেন না, তখন তিনি শাপ দিতে উদ্যত হলেন। তাই দেখে ছায়া সব কথা স্বীকার করলেন। সূর্য বিশ্বকর্মার গৃহে এসে সংজ্ঞার কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং সেখানে এসেছিলেন জেনে সমাধিস্থ হয়ে দেখলেন যে স্বামীর শুভাকার ও সৌম্য মূর্তি হোক, এর জন্য সংজ্ঞা বড়বার রূপ ধারণ করে উত্তর কুরুতে তপস্যা করছেন। সূর্য তাঁর তপস্যার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বিশ্বকর্মাকে বললেন, আজ আপনি আমার তেজের ক্ষয় করে দিন। সূর্যের কথায় বিশ্বকর্মা তাঁর তেজ ক্ষয় করে তাই দিয়ে দেবতাদের অস্ত্র নির্মাণ করে দিলেন।

তারপর সূর্য অশ্ব রূপ ধারণ করে উত্তর কুরুতে গিয়ে সংজ্ঞাকে দেখলেন। সংজ্ঞা তাঁকে পর পুরুষ ভেবে পৃষ্ঠ রক্ষণ করে সামনে এলেন। তাঁদের নাসায় নাসায় যোগে সূর্যের বীর্যে সংজ্ঞার মুখ থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও রেবন্তের জন্ম হল। তখন সূর্য তাঁর স্বরূপ দেখালেন। সে রূপের তুলনা নেই। আহ্লাদিত হয়ে সংজ্ঞাও তাঁর নিজের রূপ ধারণ করলেন এবং সূর্য তাঁকে নিজের গৃহে ফিরিয়ে আনলেন।

সূর্যের প্রথম পুত্র বৈবস্বত মনু মন্বন্তরের অধিপতি হলেন। দ্বিতীয় পুত্র যম ধর্ম দৃষ্টি হয়েছিলেন। পিতা এই বলে তাঁর মায়ের শাপান্ত করলেন, কৃমিরা এঁর পায়ের মাংস খেয়ে পৃথিবীতে পতিত হবে। তিনি ধর্ম দৃষ্টি ও শত্রুমিত্রে সমদর্শী হয়েছিলেন বলে পিতা তাঁকে যমের পদে নিযুক্ত করলেন। যমুনা নদী হলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেব বৈদ্য পদে প্রতিষ্ঠিত ও রেবন্ত গুহ্যকদের আধিপত্যে নিযুক্ত হলেন। ছায়ার প্রথম পুত্র মনুর তুল্য ভাবাপন্ন বলে তিনি সাবর্ণি সংজ্ঞা পেলেন। বলি ইন্দ্র পদ পেলে সাবর্ণি মনু হবেন। শনি গ্রহদের মধ্যে নিয়োজিত হলেন এবং তপতী নামের কন্যা সংবরণের পুত্র কুরুকে জন্ম দিলেন।

আদিত্য বসু রুদ্র সাধ্য বিশ্বদেব মরুৎ ভৃগু ও অঙ্গিরা বৈবস্বত

মন্বন্তরের দেবতা। আদিত্য রুদ্র ও মরুৎ কশ্যপের পুত্র, সাধ্য বসু ও বিশ্বদেবরা ধর্মের পুত্র। উর্জস্বী এঁদের ইন্দ্র। অত্রি বশিষ্ঠ গৌতম ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র কৌশিক ও জমদগ্নি এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। ইক্ষ্বাকু নাভগ ধৃষ্ট শর্যাতি নরিষ্যন্ত দিষ্ট করুষ পৃষধ্র ও বসুমান এই নয়জন বৈবস্বত মনুর পুত্র।

এর আগে বলা হয় নি যে প্রতি মন্বন্তরের দেবতা ভিন্ন এবং সপ্তর্ষিরাও ভিন্ন। এর থেকেই জানা যায় যে প্রতি মন্বন্তরে দেবতা ও ঋষিরা বদলেছেন। তাঁরা চিরজীবী নন বলে এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তিনশো পঞ্চান্ন বৎসরের মন্বন্তরে এঁরা এক সঙ্গে নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিলেন না। দেবতাদের নাম দেখে মনে হয় যে প্রয়োজন মতো দেবতা নির্বাচন করা হত, কিন্তু ঋষির সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল। সাতজন ঋষিকে এক মন্বন্তর দেখতে হলে এক একজনকে পঞ্চাশ বৎসর ঋষিত্ব করতে হত। অনুমান করলে অন্যায় হবে না যে প্রতি রাজার আমলে একজন দেবতা ও একজন ঋষি নির্বাচিত হতেন পরবর্তী কালের নবরত্ন সভার রত্নের মতো। তাঁরা সারা জীবনের জন্য নির্বাচিত হতেন এবং দীর্ঘায়ু ছিলেন বলেই গড়ে পনেরা-জন রাজার আমলে সাতজন ঋষিতেই কাজ চলে যেত। রাজারা পঞ্চাশোর্ধ্বে বাণপ্রস্থে যেতেন এবং দেবতা ও ঋষিরা স্বস্থানে থেকেই তাঁদের কাজ করতেন। ইন্দ্রের সভায় নির্বাচিত দেবর্ষি বোধহয় নারদ নামে অভিহিত হতেন। ইন্দ্রের মতো নারদও একটি পদের নাম। এছাড়া আর কিছু হতে পারে কিনা, তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

মার্কণ্ডেয় বললেন, সাবর্ণি হবেন অষ্টম মনু। দেবতাদের ইন্দ্র হবেন বলি। ইনি এখনও নিয়ম বন্ধনে বদ্ধ হয়ে পাতালে বাস করছেন।

বলির নাম উল্লেখ থেকে আরও স্পষ্ট হচ্ছে যে মার্কণ্ডেয় যখন এই কথা বলছেন, তখন সাবর্ণি মনুর কাল আরম্ভ হয় নি এবং বলি বামনের ছলনায় বদ্ধ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গেই মার্কণ্ডেয় বলেছেন যে

স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্র বংশের সুরথ পৃথিবীর রাজা হয়েছিলেন। রাজ্যচ্যুত হয়ে সুরথ মেধস ঋষির উপদেশে দেবীর পূজা করে বর লাভ করেছিলেন যে তিনি দেহাবসানে সূর্যের পুত্র হয়ে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে সাবর্ণিক নামে মনু হবেন। দেবীর বরেই সুরথ সূর্যের পুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করে সাবর্ণি মনু হয়েছিলেন।

পুরাণের মতে সাবর্ণি মনুর কাল আরম্ভ হবার কথা ৩৪৫৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে। তার আগেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের আখ্যান ভাগ রচিত হয়েছে। দৈত্যরাজ বলির বন্ধনের কাল নির্ণয় কঠিন কাজ নয়। তাঁর জন্ম হিরণ্যকশিপুর বংশে তৃতীয় পুরুষে, তিনি হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের পৌত্র। হিরণ্যকশিপু বিবস্বানের ভাই ও তাঁর সমসাময়িক। কাজেই এক পুরুষে গড়ে পঁচিশ বছর ধরে বলির কাল পাওয়া যায় ৩৭৬৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ এবং তাঁর বন্ধনের কাল আরও পঁচিশ বৎসর পরে। এই হিসাবে মার্কণ্ডেয় পুরাণের রচনা কাল পাওয়া যায় ৩৭৬৪ থেকে ৩৪৫৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে।

ক্রৌষ্টুকি বললেন, সূর্যের স্বরূপ ও কেন তিনি কশ্যপের পুত্র হলেন তা শোনবার ইচ্ছা হচ্ছে।

এই কথার উত্তরে মার্কণ্ডেয় বললেন, এই সংসার অন্ধকারে বিলীন হলে এক অণ্ড উদ্ভূত হয়। তার ক্ষরণ নেই এবং তা সকলের আদি কারণ। পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং তার অন্তরে থেকে তা বিদারিত করেন। এই ব্রহ্মাই জগতের স্রষ্টা। তাঁর মুখ থেকে ওম্ শব্দের উৎপত্তি হয়, তা থেকে প্রথমে ভূ, পরে ভুবঃ ও স্বঃ উদ্ভূত হয়। এই তিনই সূর্যের স্বরূপ এবং ওম্ থেকেই তাঁর সূক্ষ্ম রূপ আবির্ভূত হয়েছে। তারপর তা থেকে মহ জন তপ ও সত্য ইত্যাদি ভেদে স্থূল ও স্থূলতর সপ্ত মূর্তির আবির্ভাব হয়েছে। এই সব রূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। আমি যে ওম্ স্বরূপ পরম সূক্ষ্ম রূপের কথা বললাম, তাই সবার আদি ও অন্ত স্বরূপ। এই রূপের কোন আকার নেই। ইনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম এবং এটিই তাঁর বপু।

সেই অণ্ড বিভিন্ন হলে ব্রহ্মার প্রথম মুখ থেকে ঋক্‌, পরে দক্ষিণ মুখ থেকে যজুঃ ও পশ্চিম মুখ থেকে সাম আবির্ভূত হয়। তারপর উত্তর মুখ থেকে অথর্ব প্রকটিত হয়। আদি তেজ ওমের সঙ্গে এই সব মিলিত হতেই অন্ধকাব বিনষ্ট হয় এবং সংসার সুনির্মল হয়ে অধঃ উর্ধ্ব ও তির্যক স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তারপর সেই ছন্দোময় তেজ মণ্ডলীভূত হযে পবম তেজেব সঙ্গে এক হয়ে যায়। এই ভাবেই আদিতে উদ্ভূত হন বলেই তাঁব নাম হয় আদিত্য। এই অব্যয়াত্মক তেজই বিশ্বের কাবণ। ঋক্‌ যজু সাম সংজ্ঞার ত্রয়ীই প্রাতে মধ্যাহ্নে ও অপবাহ্নে তাপ প্রদান করেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি কালে ঋঙ্ময়, বিষ্ণু স্থিতি কালে যজুর্ময় ও রুদ্র অন্তকালে সামময় হয়ে থাকেন। এই জন্যই ভাস্কব বেদাত্মা, বেদ সংস্থিত ও বেদবিদ্যাময় পরম পুরুষ এবং তিনিই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়েব হেতু। রজ ও সত্ত্বাদি গুণ আশ্রয় কবে তিনিই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি বেদমূর্তি ও অখিল মর্ত্যমূর্তি, আবার অমূর্তিও। তিনি আদি ও বিশ্বের আশ্রয়, তিনি জ্যোতি স্বরূপ। তিনি বেদান্তগম্য ও পরাৎপব। তাই দেবতারা সর্বদা তাঁব স্তব করেন।

সূর্যেব তেজে উর্ধ্ব ও অধ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পিতামহ চিন্তা করতে লাগলেন, আমি সৃষ্টি করলেই সূর্যের তেজে তা বিনাশ পাবে। জল ছাড়া বিশ্বেব সৃষ্টি সম্ভব নয়। এই ভেবে ব্রহ্মা তন্ময় হয়ে সূর্যের স্তব কবতে লাগলেন, তুমি সকলের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার। আমি সৃষ্টি কবতে উদ্যত হয়েছি, কিন্তু তোমার তেজ তাতে বিঘ্ন করছে। তাই তুমি তোমাব তেজ উপসংহরণ কর। এই স্তবে সূর্য তাঁর তেজ সংহরণ করে স্বল্প মাত্র তেজ ধারণ করলেন। তখন ব্রহ্মা কল্পান্তরে যে রকম সৃষ্টি করেছিলেন, সেই রকম দেবতা অসুর মানুষ পশু বৃক্ষ লতা ও নরক সৃষ্টি করলেন।

সেই সময়ে তাঁর মরীচি নামে যে পুত্র উদ্ভূত হলেন, কশ্যপ তাঁরই পুত্র। দক্ষের তেরোটি কন্যা তাঁর স্ত্রী। তাঁর দেব দৈত্য ও উরগাদি

বহু পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। অদিতি দেবতাদের, দিতি দৈত্যদের ও দনু দানবদের জন্মদান করেন। বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণ, যক্ষ রাক্ষস ও পক্ষীরা জন্মাল। কদ্রু নাগ ও মুনি গন্ধর্ব প্রসব করলেন। ক্রোধা থেকে কুলা ও রিষ্টা থেকে অপ্সরার জন্ম হল। ইরার গর্ভে ঐরাবত প্রভৃতি উৎপন্ন হল। তাম্রা শ্যেণী প্রভৃতি কন্যার জন্ম দিলেন। ইলার গর্ভে পাদপের জন্ম হল এবং প্রধা প্রসব করলেন পতগ।

কশ্যপের পুত্রদের মধ্যে দেবতারাই প্রধান। ব্রহ্মা তাঁদের যজ্ঞভাগ ভাগী ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর করলেন। তাঁদের বৈমাত্র দৈত্য ও দানবরা মিলিত হয়ে তাঁদের বিঘ্ন করতে লাগল। রাক্ষসরাও তাতে যোগদান করল। এর জন্য উভয় পক্ষে দারুণ যুদ্ধ হল। দেবমানের এক হাজার বৎসর যুদ্ধের পর দেবতাদের পরাজয় হল। দৈত্য ও দানবরা জয়ী হয়ে আরও প্রবল হয়ে উঠল। অদিতি তাঁর পুত্রদের দুরবস্থা দেখে নিয়ম বন্ধন ও আহার সংযম করে একাগ্র হৃদয়ে সূর্যের স্তব করতে লাগলেন, তুমি তেজস্বীদের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার। এই ভাবে বহুকাল অহর্নিশ স্তব করবার পর অদিতি দেখলেন যে রাশীকৃত তেজ এক সঙ্গে আকাশ ও পৃথিবী আশ্রয় করে দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে বিরাজ করছে। তিনি ভীত হয়ে বললেন, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, তুমি প্রসন্ন হও। ভক্তের প্রতি অনুকম্পা কর, রক্ষা কর আমার পুত্রদের।

সূর্য তখন তাঁর তেজমণ্ডল থেকে আবির্ভূত হয়ে তপ্ত তাম্রের মতো কলেবরে অদিতির নয়ন গোচরে এলেন। অদিতি তাঁকে প্রণাম করতেই সূর্য বললেন, বর প্রার্থনা কর। অদিতি নতজানু হয়ে তাঁকে বললেন, দৈত্য ও দানবরা আমার পুত্রদের ত্রিভুবন ও যজ্ঞভাগ হরণ করছে। তুমি নিজের অংশে তাদের ভাই হয়ে শত্রু নাশ কর। সূর্য বললেন, আমি তোমার গর্ভে সহস্রাংশে জন্ম নিয়ে তোমার পুত্রদের শত্রু বিনাশ করব। বলেই অন্তর্হিত হলেন।

তারপর সূর্যের সৌষুম্ন নামে কর অদিতির উদরে অবতরণ করলে

তিনি কৃচ্ছ্রসাধন করে সেই দিব্য গর্ভ বহন করতে লাগলেন। তাই দেখে কশ্যপ কিঞ্চিৎ কুপিত হয়ে বললেন, তুমি উপবাস করে এই গর্ভাণ্ডকে মারবে নাকি! অদিতি বললেন, একে আমি মারিত অর্থাৎ মারি নি, এ বিপক্ষের মৃত্যুর নিমিত্ত হবে। বলে অদিতি ক্রুদ্ধ হয়ে সেই গর্ভ ত্যাগ করলে তা তেজে প্রজ্বলিত হতে লাগল। তাই দেখে কশ্যপ স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন। তাতে সূর্য সেই গর্ভাণ্ড থেকে প্রকট হয়ে নিজের তেজে চারি দিক পরিব্যাপ্ত করলেন। দৈববাণী হল, তুমি এই অণ্ডকে মারিত অর্থাৎ মেরে ফেললে বলায় তোমারএই পুত্রের নাম হবে মার্তণ্ড। ইনি জগতে সূর্যের কাজ করবেন এবং অসুরদের সংহার করবেন।

এই কথা শুনে ইন্দ্র অসুরদের যুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং সেই যুদ্ধে মার্কণ্ডের দৃষ্টিপাত মাত্র তাঁর তেজে অসুররা ভস্মীভূত হল। প্রজাপতি বিশ্বকর্মা সূর্যকে প্রসন্ন করে তাঁর কন্যা সংজ্ঞাকে সম্প্রদান করলেন। তার পরের কাহিনী আগেই বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই অংশে সূর্যের রূপ সৌম করার কথা একটু বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে। ছায়ার নিকটে সব কথা জেনে সূর্য ক্রুদ্ধ হয়ে শ্বশুরের নিকটে এসেছিলেন। তাঁকে সব দগ্ধ করতে উদ্যত দেখে বিশ্বকর্মা বললেন, তোমার তেজ দুঃসহ হয়ে উঠেছিল দেখেই সংজ্ঞা তোমার তেজহীন স্নিগ্ধ রূপের জন্য কঠোর তপস্যা করছে। সেখানে গেলেই তুমি তা দেখতে পাবে। ব্রহ্মার কথা আমার মনে পড়ছে, যদি তুমি চাও তো আমি তোমার রূপ কমনীয় করে দিতে পারি।

সূর্যের রূপ পূর্বে মণ্ডলাকার ছিল। সেই জন্য তিনি বিশ্বকর্মাকে বললেন, তাই করুন। বিশ্বকর্মা এই আজ্ঞা পেয়ে সূর্যকে শাক দ্বীপে ভ্রমি যন্ত্রে আরোপিত করে তেজ ক্ষয় করতে উদ্যত হলেন। তাতে পৃথিবী আকাশে উঠলেন এবং গ্রহ চন্দ্র ও তারাদের সঙ্গে আকাশ আকুল হয়ে উঠল। সমুদ্রের জল বিক্ষিপ্ত ও পাহাড় বিদীর্ণ হল।

সূর্য সবেগে ভ্রমণ করাতে আকাশ পাতাল ও পৃথিবী বিভ্রান্ত হয়ে উঠল। দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিরা ব্রহ্মার সঙ্গে স্তব করতে লাগলেন, তুমি জগতের নাথ, সকলের শান্তি বিধান কর। এই সময়ে ইন্দ্রও এসে বললেন, তোমার জয় হোক। বিশ্বকর্মা ধীরে ধীরে সূর্যের তেজ কুঁদে চেঁচে ফেলতে লাগলেন। পনের ভাগ তেজ চেঁচে ফেলাতে তাঁর শরীর কান্তিময় হল এবং সেই উদ্বৃত্ত তেজে বিশ্বকর্মা দেবতাদের জন্য অস্ত্র নির্মাণ করে দিলেন।

এই কাহিনী মানুষের দিবি আরোহণের একটি চমৎকার উদাহরণ। অদিতির প্রথম পুত্র আদিত্য বিবস্বানকে এই কাহিনী দিয়ে আকাশের সূর্যে পরিণত করা হয়েছে। এক হাজার বৎসর যুদ্ধের পরে দৈত্যরা জয়ী হয়েছিল। তাই অদিতি সূর্যকে পুত্র রূপে চেয়েছিলেন এবং সূর্য মার্তণ্ড নামে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে দৈত্যদের ভস্ম করেছিলেন, এমন কথা অন্য কোন পুরাণে নেই। অদিতির আয়ু এক হাজার বৎসর হতে পারে না, অদিতির পুত্র ইন্দ্রও এক হাজার বৎসর পর জীবিত থাকতে পারেন না। সমগ্র কাহিনীটিই যে কল্পিত এবং বিবস্বানকে সূর্যের সঙ্গে একীভূত করার উদ্দেশ্যে রচিত তাতে কোন সন্দহ নেই। ৩৮৩৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বিবস্বান মার্কণ্ডেয় পুরাণ রচনা কালে অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পর ও সাড়ে তিনশো বৎসরের মধ্যেই আকাশের সূর্যে পরিণত হলেন। এমন দ্রুত দিবি আরোহণ এ যুগে সম্ভব নয়।

বাস্তব দৃষ্টিতে বিবস্বানের কাহিনী কিছু অন্য রকম মনে হয়। তাঁর তেজ দেহের উত্তাপ নয়, মেজাজ। তিনি ক্রোধী ছিলেন বলেই বোধ হয় তেজের কথা বলা হয়েছে। সংজ্ঞা তিনটি সন্তানের জন্ম দেবার পরে এই মেজাজ সহ্য করতে না পেরেই স্বামীকে ত্যাগ করে পিতৃগৃহে চলে এসেছিলেন। সূর্যের সেবার জন্য যাঁকে রেখে এসেছিলেন, তিনি ছায়া নামের কোন রমণী। শুচিতা রক্ষার জন্য বলা হয়েছে যে তিনি সংজ্ঞারই ছায়া এবং সূর্য তাঁকে চিনতে না পেরে আরও তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। এর পর বিশ্বকর্মা তাঁর

কন্যাকে স্বামী গৃহে পাঠাতে চাইলে সংজ্ঞা তপস্যার নামে উত্তর কুরুতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সূর্য তাঁর অন্বেষণে সেখানে গিয়ে কোন তৃতীয় রমণীতে আসক্ত হয়েছিলেন। অশ্ব রূপে তাঁদের মিলনের কথা থেকে সন্দেহ হয় যে এই তৃতীয় রমণী কোন অশ্ব পালক জাতিরা কন্যা। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও রেবন্ত এই কন্যার সন্তান। সমাজে এঁরা সম্মানের স্থান পান নি। অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেব বৈদ্য হয়েও ইন্দ্রের নিকটে সোম পানের অধিকারে বঞ্চিত হয়েছিলেন। রেবন্ত হয়েছিলেন গুহ্যকদের অধিপতি। এঁরা কুবেরের অনুচর, এঁদের আবাস পিশাচলোকের উপরে ও গন্ধর্বলোকের নিচে। বিবস্বান ছিলেন গন্ধর্ব জাতির অধিপতি এবং তিনিই রেবন্তকে এই পদ দিয়েছিলেন।

সূর্য ও চন্দ্র বংশ

বিবস্বান সূর্যে পরিণত হয়েছিলেন এবং তাঁর বংশই পুরাণে সূর্য বংশ নামে পরিচিত। এই ভাবেই সোম নামে জনৈক ব্যক্তি দক্ষের একাধিক কন্যাকে বিবাহ করে এক সময়ে আকাশের চন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন। সিদ্ধির পৌরাণিক নাম সোম। সোম পানে বা সিদ্ধির শরবত পান করে মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। এই আনন্দ চন্দ্রালোকের মতো স্নিগ্ধ। তাই দক্ষের জামাতা সোম প্রথমে চন্দ্রের দেবতা রূপে ও পরে আকাশের চন্দ্রে রূপান্তরিত হলেন। সাতাশটি নক্ষত্র তাঁর পত্নী হল। ইনি দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করেছিলেন। বুধ তাঁদের সন্তান। এই বুধ বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার গর্ভে যে পুত্রের জন্ম দেন, তাঁর নাম পুরূরবা। বুধ চন্দ্রের পুত্র বলে বুধের বংশই চন্দ্রবংশ নামে পুরাণে বিখ্যাত। সূর্য ও চন্দ্র বংশের রাজাদের ইতিহাসই এ দেশের প্রাচীন ইতিহাস।

ভবিষ্য মনু

পুরাণকার বোধহয় কিছু দিন থেকে মন্বন্তরের গণনায় অসুবিধা বোধ করছিলেন। ত্রেতা যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং চোখের সামনে যে সব ঘটনা ঘটছে তার হিসাব তিনশো পঞ্চান্ন বৎসরের মন্বন্তর দিয়ে রা এর জন্য আরও ছোট কালের প্রয়োজন এবং পাঁচ বৎসরের যুগ নিতান্তই ছোট। তাঁরা অঙ্ক কষে দেখলেন যে পিতৃমানে কল্পারম্ভ থেকে তেরোটি যুগ অতীত হবার পর বৈবস্বত মনুর কাল আরম্ভ হয়েছে। এই পিতৃযুগ দু হাজার মাসের। এই রকম তিরিশটি পিতৃযুগে এক কল্প হবে। .ও বুঝলেন যে এই রকম মানের একটি যুগের ব্যবহার করলে ঘটনার কাল আরও নির্দিষ্ট করা সম্ভব হবে। এই ধারণা নিয়েই তাঁরা বৈবস্বত মন্বন্তরেই মনু গণনা পরিত্যাগ করলেন। বললেন, বৈবস্বতের পর সূর্যের অন্য পুত্র সাবর্ণি হবেন অষ্টম মনু। এর পর মনু হবেন দক্ষের পুত্র সাবর্ণ, তারপর একে একে ব্রহ্মপুত্র সাবর্ণ ধর্মপুত্র সাবর্ণ, রুদ্রপুত্র সাবর্ণ। রোচ্য হবেন ত্রয়োদশ মনু এবং চতুর্দশ বা শেষ মনু হবেন ভৌত্য। এঁদের পিতা রুচি ও ভূতিকে নিয়ে দুটি কাহিনীও কল্পিত হয়েছে। এঁরা সবাই ভবিষ্য মনু। অর্থাৎ সময় এলে মনু হবেন বলে নির্বাচিত হয়ে আছেন।

এর অর্থ খুবই স্পষ্ট। কল্পকে চতুর্দশ ভাগে ভাগ করে এক একটি নামের সন্ধান করা হয়েছে। প্রথম মনু স্বায়ম্ভুব ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাঁর পরে যাঁরা মনু হয়েছেন, তাঁরা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, কিংবদন্তীর নায়ক অথবা সম্পূর্ণ কল্পিত।

বৈবস্বত মনু ইতিহাসে বিখ্যাত। তিনি সূর্য বংশের প্রথম রাজা, তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকু থেকেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ। চন্দ্র বংশের জননী ইলা বৈবস্বতের কন্যা ও ইক্ষ্বাকুর ভগিনী। বৈবস্বতের পুত্র কন্যাই ভারতবর্ষের ছোট বড় সমস্ত রাজ্যে রাজত্ব করেছেন। আধুনিক কালেও অনেক দেশীয় রাজ্যের রাজা নিজেদের সূর্য বা চন্দ্রবংশজাত বলে গৌরব বোধ করতেন। পুরাণে এই দুই বংশের

সমস্ত রাজাদের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের কালও কতকটা সঠিক ভাবেই নির্ণয় করা সম্ভব। ইতিহাস রচনার শৈলী অবলম্বন করলে মন্বন্তর কাল অনুযায়ী বর্ণনা পূর্বেই ত্যাগ করা উচিত ছিল। মনু থেকে পৃথু পর্যন্ত কাল ভারতেব প্রাচীন যুগ এবং পৃথুর পর থেকে দক্ষের পূর্ব পর্যন্ত অন্ধকার যুগ। তারপরেই ত্রেতা যুগের আরম্ভ এবং এই যুগের প্রথম ও প্রধানতম ঘটনা দেবাসুরের দ্বন্দ্ব। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই দ্বন্দ্বের কথাই সবিস্তারে বর্ণিত হবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দেবাসুরের দ্বন্দ্ব

৩৯৫৮ থেকে ৩৭৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ

হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, বিরোচন, বৃহস্পতি ও শুক্র, বিশ্বরূপ, বৃত্র, নহুষ ও বলি

ঋগ্বেদে অসুর শব্দ বলবান বা প্রাণবান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অবেস্তায় অসুর শব্দে বোঝায় The Lifegiver and the Omnicient বা God। ঋগ্বেদেও এই অর্থে অসুর শব্দের ব্যবহার আছে—অসুরঃ সর্বেষাং প্রাণদঃ ॥ ঋগ্বেদ।১। ৩৫।৭॥ কিন্তু পুরাণে অসুর শব্দে শুধু সুর বিরোধী দৈত্যাদি বোঝায়। যাঁরা দেবতাদের শত্রু, তাঁরাই অসুর। এই অর্থে দৈত্য দানব রাক্ষস এঁরাও অসুর। তাই দেবাসুরের দ্বন্দ্বে দেবতা ও দৈত্য প্রভৃতির বিরোধের ইতিহাসই বর্ণিত হবে।

দেবতা বিরোধী কারা তা বুঝতে হলে দক্ষ প্রজাপতির কথা থেকেই আরম্ভ করতে হবে। তাঁর পূর্বে মানুষের সমাজে যে একটি মাত্র জাতি ছিল, তাতে কোন সংশয় নেই। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে কেউ রাজা হয়েছেন, কেউ ঋষি। কন্যাদের বিবাহ হয়েছে তপস্বীদের সঙ্গে। বেণ রাজার মৃত্যুর পরে অরাজকতার কালে দস্যুরা প্রজাদের ধন অপহরণ করেছে। কিন্তু তারা অন্য কোন জাতি নয়, তারাও একই সমাজের মানুষ। অভাবের তাড়নাতেই হয়তো দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেছে। বৃত্তি দিয়ে বর্ণ সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু জাতি সৃষ্টি হয় না। পুরাণে সর্বপ্রথম জাতির জন্ম দিলেন দক্ষের কন্যারা। কশ্যপ যে কন্যাদের বিবাহ করেছিলেন, শুধু তাঁরাই হলেন নূতন নূতন জাতির জননী। দক্ষের অন্য কন্যারা এই কাজে সমর্থ হলেন না। সোমের

সঙ্গে যে কন্যাদের বিবাহ হয়েছিল, তাঁদের কোন সন্তান হয় নি। অন্য কন্যাদের সন্তানসন্ততি পুরাতন জাতিরই অন্তর্গত রয়ে গেল।

অদিতি দক্ষের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন বলে মনে হয়। বিষ্ণু পুরাণের মতে অদিতির বারোটি পুত্রের নাম বিষ্ণু শক্র অর্যমা ধাতা ত্বষ্টা পূষা বিবস্বান সবিতা মিত্র বরুণ অংশ ও ভগ। এই উক্তি অনুযায়ী বিষ্ণু প্রথম, শক্র বা ইন্দ্র দ্বিতীয় এবং বিবস্বান সপ্তম পুত্র। অদিতির পুত্র বলে এঁরা আদিত্য। দ্বাদশ আদিত্য। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে অর্যমা পূষা বিবস্বান সবিতা ও মিত্র এই পাঁচটি সূর্যেরই নামান্তর। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে এই পুত্ররা মানুষ ছিলেন এবং অদিতির গর্ভজাত বলে আদিত্য নামে পরিচিত হয়েছিলেন। আদিত্য সূর্যকেও বলে এবং সপ্তম পুত্র বিবস্বান আকাশের সূর্যে পরিণত হয়েছেন। তাঁরই বংশ সূর্য বংশ নামে অভিহিত হয়েছে। ঋগ্বেদে অদিতির আট পুত্রের জন্ম কথা আছে॥ ঋগ্বেদ। ১০।৭২।৮॥ এদের মধ্যে মার্তণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করে অদিতি স্বর্গে গিয়েছিলেন। ঋগ্বেদের ২।২৭।১ মন্ত্রে ছয়জন ও ৯।১১৪।৩ মন্ত্রে সাতজন আদিত্যের বর্ণনা আছে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষ্ণু রাজা হয়েছিলেন ক্ষীর সাগর তীরে। তিনি যে প্রবল ও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তার প্রমাণ পুরাণের নানা কাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পুত্র শক্র রাজা হয়েছিলেন ইলাবৃত বর্ষে। এই রাজপদের নাম ইন্দ্র। তাই পুরাণে আমরা দীর্ঘকাল ধরে ইন্দ্রের নামের উল্লেখ দেখি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বিষ্ণু ও ইন্দ্র হয়েছেন বলেই ধারণা হয়। বিপদে পড়লেই ইন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্য নিতেন। বিভিন্ন সময়ে এই বিষ্ণুর নাম দেখেও সন্দেহ হয় যে ইন্দ্রের ন্যায় বিষ্ণুও একটি শক্তিশালী সম্রাটের নাম বা উপাধি। কিছু দিন পূর্বে যেমন জার কাইজার বা বিক্রমাদিত্য রাজাদের উপাধি ছিল, ইন্দ্র ও বিষ্ণুও তেমনি রাজাদের

উপাধি। বিষ্ণু আদি রাজা বা সম্রাট, শক্র প্রথম ইন্দ্র। বরুণ হলেন জলাধিপতি, কোন সমুদ্রের ধারে তাঁর রাজত্ব ছিল, পুরীর নাম বিভাবরী।

এর পর দক্ষের দ্বিতীয় কন্যা দিতি। তিনিও কশ্যপের পত্নী। দিতির গর্ভে দুই দুর্জয় পুত্র হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয় এবং সিংহিকা নামে এক কন্যা। দক্ষের তৃতীয়া কন্যা দনু বহু পুত্রের জননী। এই পুত্রদের মধ্যে প্রধান দ্বিমূর্ধা শম্বর অয়োমুখ শঙ্কুশিরা কপিল একচক্র তারক স্বর্ভানু বৃষপর্বা পুলোমা ও বিপ্রচিত্তি। বিপ্রচিত্তি রাজা হয়েছিলেন এবং হিরণ্যকশিপুর কন্যা সিংহিকাকে বিবাহ করেন। নমুচি ইল্বল বাতাপি প্রভৃতি এঁদেরই পুত্র। অদিতির পুত্র শক্র বা ইন্দ্র বিবাহ করেছিলেন পুলোমার কন্যা শচীকে এবং ত্বষ্টা হিরণ্যকশিপুর কন্যা রমা বা রচনাকে বিবাহ করেছিলেন। পুরূরবার পুত্র আয়ু দানব স্বর্ভানুর কন্যা প্রভাকে বিবাহ করেছিলেন এবং নহুষ তাঁদের পুত্র। নহুষের পুত্র যযাতি বিবাহ করেছিলেন বৃষপর্বার সুন্দরী কন্যা শর্মিষ্ঠাকে। এই সব বৈবাহিক সম্বন্ধ থেকে জানা যায় যে সেকালে এক পরিবারের অন্তর্গত ভগিনী ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ প্রচলিত ছিল। এক পিতার কন্যা হলেও বাধা ছিল না। তবে সহোদর ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ঋগ্বেদে যম ও যমীর কথোপকথন এর প্রমাণ। এ ছাড়াও দক্ষ কন্যারা আরও কতকগুলি জাতির জননী। যক্ষ ও রাক্ষসরা খসার সন্তান. অরিষ্টা গন্ধর্বদের জননী এবং মুনি অপ্সরাদের।

একটি আশ্চর্যের কথা এই যে অসুর বলতে দৈত্য ও দানবদের বোঝায়। রাক্ষসরাও অনেক সময়ে তাদের সঙ্গে থাকত, কিন্তু যক্ষরা কোন পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করত না। গন্ধর্ব ও অপ্সরারাও কোন পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ না করলেও তারা দেবতাদের সমর্থক ছিল। মানুষ জাতির রাজারাও অসুরবিরোধী ছিলেন, প্রয়োজন হলে তাঁরা দেবতাদের সাহায্য করতে যেতেন। দেবতারাও অসুর দমনে সাহায্য

চাইতেন সূর্য ও চন্দ্র বংশের রাজাদের। পুরূরবা ইন্দ্রকে সাহায্য করেছেন, নহুষ ইন্দ্রের অবর্তমানে ইলাবৃত বর্ষের রাজা হয়ে বসে ছিলেন। দেবতারাই তাঁকে নির্বাচন করেন। এই পক্ষপাতিত্বের কারণ অনুসন্ধান করার সার্থকতা আছে। দেখা গেছে যে প্রয়োজন হলেই দৈত্য ও দানবরা দলবদ্ধ হয়েছে দেবতাদের বিরুদ্ধে, দেবতারা সাহায্য প্রার্থনা করেছে মানুষের। কিন্তু নাগ গন্ধর্ব অপ্সরা এবং অন্যান্য জাতিরা এই বিবাদে বা যুদ্ধে বিরত থেকেছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে কশ্যপ নিজেই এই বিদ্বেষের বীজ বপন করেছিলেন। অদিতির পুত্র বিষ্ণু শত্রু বরুণ ও বিবস্বান এক একটি রাজ্যের রাজা হলেন, কিন্তু দৈত্য হিরণ্যকশিপুরা এবং দানব ভ্রাতারা এই বণ্টনের সময় কিছুই পেলেন না। অথচ এঁরা কম শক্তিশালী ছিলেন না। বাহুবলে এঁরা বার বার ইন্দ্রের রাজ্য অধিকার করেছেন এবং দেবতারা চক্রান্ত করে ছলে ও কৌশলে রাজ্য উদ্ধার করেছেন। কশ্যপ এই ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ না করেই পরোক্ষ ভাবে পুত্রদের বিরোধে লিপ্ত হবার সুযোগ দিয়েছেন। মনে হয়, তিনি অদিতির প্রীতির জন্য দেবতাদের পক্ষে ছিলেন বলেই ন্যায় বিচার করেন নি।

আর একটি বিষয় জানতে হবে। সেটি হল এই কশ্যপ কোথায় বাস করতেন? ভারতবর্ষে, না ইলাবৃত বর্ষে? অনুমান করা হয় যে ক্ষীর সমুদ্র বর্তমান কাস্পিয়ান সাগরের নাম। তারই তীরে বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুর রাজ্য, ইলাবৃত বর্ষ ইন্দ্রের রাজ্য এবং বিবস্বান অন্তরীক্ষে অর্থাৎ হিমালয়ে রাজত্ব করছেন। বরুণের সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। বিবস্বানের পর তাঁর পুত্র বৈবস্বত মনুর বংশধররা ভারতবর্ষের নানা স্থানে রাজত্ব করেছেন। চন্দ্রবংশের প্রথম রাজা পুরূরবা রাজা হয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানপুরে বা বর্তমান মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত পৈথানে। মনে হয় যে কশ্যপ ছিলেন ইলাবৃত বর্ষ বাসী এবং তাঁর পুত্ররা এইখানেই বাস করতেন। যাঁরা রাজত্ব

পেয়েছিলেন, তাঁরা সরে গিয়েছিলেন, অন্তরা রয়ে গিয়েছিলেন ইলাবৃত বর্ষেই। তাই এই রাজ্যের অধিকার নিয়েই বার বার বিবাদ বেধেছে। দৈত্য ও দানবরা হীনবল হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত এইখানেই বাস করেছেন বলে মনে হয়। তার পর তাঁরা পাতালে নির্বাসিত হয়েছিলেন। পাতাল অর্থে দক্ষিণ ভারত। এই পাতালের অন্তর্গত সপ্ত পাতাল ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে অনুমান করা হয়। অনেকে মনে করেন যে দক্ষের জন্মের পূর্বে বিশ্বে যে মহা প্লাবন এসেছিল, তাতে এই দেশের অনেক কিছুই ওলটপালট হয়ে যায়। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে কয়েকটি দ্বীপ জেগে ওঠে সমুদ্র থেকে। এরই কোন দ্বীপে হয় তো বরুণের অধিকার ছিল। তাঁর বিভাপুরী পুরী ছিল এখানেই। দৈত্যরা তাঁকে এই পুরী থেকে বিতাড়িত করে। লঙ্কাও এই রকমের একটি দ্বীপ ছিল। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে কিষ্কিন্ধ্যা এবং কাবেরীর দক্ষিণে লঙ্কা। বর্তমানের থর মরুভূমি সমুদ্র ছিল বলেও অনেকে মনে করেন এবং নর্মদার তীরে ভৃগুকচ্ছ ছিল একটি বর্ধিষ্ণু স্থান।

একটি প্রশ্ন সঙ্গত ভাবেই মনে জাগে। সেটি হল, দেবাসুরের দ্বন্দ্বের কথা বর্ণনার সময় পুরাণকার পক্ষপাতিত্ব করেছেন। সকল পুরাণেই দৈত্য দানব ও রাক্ষসরা নিন্দিত হয়েছেন এবং দেবতাদের জয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন গন্ধর্ব অপ্সরা ঋষি ও পিতৃগণ। অনেক ঘটনায় অসুরদের বীরত্ব ও মহানুভবতা প্রকাশ পেয়েছে এবং দেবতাদের ছলনা, কাপুরুষতা ও হীনমন্যতা প্রকাশ পেয়েছে অনেক ঘটনায়। কিন্তু পুরাণ রচয়িতারা সব সময়েই সব কাজে দেবতাদের সমর্থন করেছেন এবং কারণ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন নানান রকমের অবিশ্বাস্য যুক্তি দিয়ে। কেন এই পক্ষপাত?

এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে পুরাণ রচয়িতারা নিজেদের দেবতা জাতির উত্তরাধিকারী ভাবতেন, অর্থাৎ তাঁরা দেবতাদের

নিজেদেরই পূর্বপুরুষ বলে মনে করতেন। দেবতা ও অসুরদের বিবাদ এত দীর্ঘ দিন ধরে এমন একটা তিক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল যে তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে এঁদের পিতা একজন। তিনি কশ্যপ। সবাই এই কশ্যপেরই সন্তান, এ কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা ন্যায় বিচারে অসমর্থ হয়েছেন।

পুরাণে আমরা কয়েকজন অসুরেব সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধের দীর্ঘ বিবরণ পাই। এই সব যুদ্ধের বর্ণনা পড়ে মনে হয় যে দু দলে সেনাপতি বা সেনার সংখ্যা অগণিত। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে তা নয়। দু দলে যে যুদ্ধ হয়েছে, আসলে তা সংঘর্ষ বা দাঙ্গার মতো। অবণ্যে উপজাতিদেব মধ্যে যে রকমের সংঘর্ষের কথা শোনা যায়, এ কতকটা সেই রকম। কয়েকজন অসুর বধের ঘটনা বর্ণনায় পুবাণকার নিজেদের অজ্ঞাতসারেই এ কথা বলে ফেলেছেন। যেমন হিরণ্যাক্ষ বা হিরণ্যকশিপু বধের ঘটনা, বা বৃত্র বধের বর্ণনা। হিরণ্যাক্ষ বা হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছেন বর্মধারী বিষ্ণু এবং ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেছেন যুদ্ধে নয়, মৈত্রীর পর ছলনা করে।

নিজের কথায় এই সব ঘটনার বিবরণ বললে ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক হতে পারে। তাই পুরাণের বর্ণনাই অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত হবে। তবে ঘটনার ধারা উপলব্ধি করবার জন্য যুদ্ধের কাল ও পারস্পরিক সম্পর্ক জানা থাকলে সুবিধা হবে। কয়েকজন প্রধান দৈত্য ও দানবদের নাম ও দেবতাদের সঙ্গে, সম্পর্ক নীচে সাজিয়ে দেওয়া হল। কাল নির্দেশের জন্য বলা যেতে পারে যে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল ৩৮৩৯ থেকে ৩৭৩৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে। হিরণ্যকশিপু থেকে বলি পর্যন্ত চার পুরুষ এই শত বর্ষে অত্যন্ত প্রবল ছিলেন। এই দীর্ঘ কাল একজন বিষ্ণু বা ইন্দ্রের কাল হওয়াও সম্ভব নয়। তবে বৈকুণ্ঠের অধিপতিরা বিষ্ণু নামেই অভিহিত হতেন। তাঁদের হরি ও নারায়ণও বলা হত। কিন্তু ইন্দ্রের কয়েকটি নাম পাওয়া

যায়। অদিতির পুত্র শক্র ইন্দ্র হয়েছিলেন। আর একজন ইন্দ্রের নাম শত ক্রতু। মনে হয় যে জয়ন্ত এঁরই পুত্র এবং ইনিও ইন্দ্র হয়েছিলেন। জয়ন্তী এঁর ভগিনী হতে পারেন। এঁরই কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেছিলেন নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতির অন্য পত্নী শর্মিষ্ঠার পিতা বৃষপর্বা নহুষের সমসাময়িক ছিলেন বলে মনে হয়।
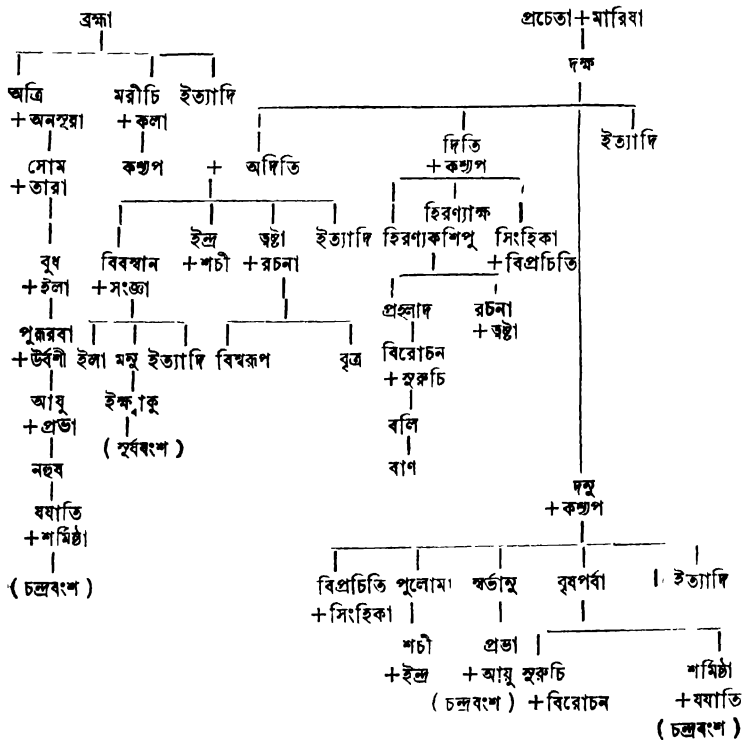
বলা বাহুল্য যে উপরের বংশ তালিকা অসম্পূর্ণ। ব্রহ্মার মানস পুত্রদের বংশলতা এই ভাবে দেখাতে হলে স্থান সঙ্কুলান হবে না এবং আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। পিতা মাতার সঙ্গে পুত্র কন্যাদের

জন্মেরও তারতম্য অনেক সময়ে এত বেশি যে কালের হিসাবে সাজানো সম্ভব নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বিবস্বান ও বুধ সমবয়সী হতে পারেন, কিন্তু বুধ ও ইলার মিলনে পুরূববার জন্ম। আবার বৃষপবাও বিবস্বানের ভ্রাতা। তার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেছেন ইলার বংশে চতুর্থ পুরুষ যযাতি। এ ক্ষেত্রে ধবে নিতে হয় যে ইলা প্রায় বাল্যকালেই পুরূবরার জন্ম দিয়েছিলেন এবং দনুব শেষ বয়সের সন্তান বৃষপর্বা বিবাহ কবেছিলেন প্রায় বৃদ্ধ বযসে এবং শর্মিষ্ঠাও যে বৃষপবার বৃদ্ধ বয়সেব সন্তান তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তাব জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরুচিকে বিবাহ কবেছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রহ্লাদের পুত্র বিবোচন। দেবাসুবেব দ্বন্দ্বে দৈত্য দানবেবা নিহত হবার পরেই তিনি রাজা হয়েছিলেন বলে মনে হয়। বৃত্রবধের পর ইন্দ্র যখন আত্মগোপন কবে অবস্থান করছিলেন, তখন যযাতির পিতা নহুষ ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বৃষপবা এ সুযোগ পান নি। এমন হতে পারে যে বৃষপবা দনুব পুত্র ছিলেন না, তাঁর জন্ম হয়েছিল পরবর্তীকালে দনুরই বংশে। তাই তাঁকে দনুর পুত্র বলা হয়েছে।

এখন আমরা দেবতা ও অসুব বলে যে প্রভেদ জানি, সেকালে তা ছিল না। এদের মধ্যে বিবাহের কোন বাধা ছিল না, বয়সের বাধা ছিল বলেও মনে হয় না।

স্বীকার করা উচিত যে উপরেব বংশ লতায় একটি সন্দেহের অবকাশ আছে। ত্বষ্টা শিল্পাচার্য ছিলেন বলে তাঁকে বিশ্বকর্মা বলা হয়। কিন্তু এই ত্বষ্টা অদিতির পুত্র কিনা তা সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়। কোন পুবাণের মতে তিনি অষ্ট বসুর অন্যতম প্রভাসের পুত্র. দেবগুরু বৃহস্পতির ভগিনী যোগসিদ্ধা তাঁর মা। অন্য মতে তিনি ত্বষ্টার পুত্র, তাঁর মা হিরণ্যকশিপুব কন্যা বমা বা রচনা। তাঁদের দুই পুত্র বিশ্বরূপ বা ত্রিশিরা এবং বৃত্র। বিবস্বানের স্ত্রী সংজ্ঞা তাঁদের কন্যা। শেষোক্ত সম্পর্কই সঠিক বলে মনে হয় এই

কারণে যে অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য আছে। বৃহস্পতিকে অপমান করবার পর ইন্দ্র বিশ্বরূপকে পুরোহিত নির্বাচিত করেছিলেন। তিনি দেব পক্ষের হয়েও মাতৃকুলকে যজ্ঞের ভাগ দিয়েছিলেন বলে ইন্দ্র তাঁকে হত্যা করেন। ত্বষ্টা অদিতির পুত্র ও হিরণ্যকশিপুর কন্যা রচনাকে বিবাহ করে থাকলেই এই সম্পর্ক হতে পারে। অষ্টম বসু প্রভাসের পুত্র বিশ্বকর্মা দৈত্যকুলে বিবাহ করেছিলেন বলে জানা যায় না। তবে ত্বষ্টার নাম বিশ্বকর্মা না হওয়াই সম্ভব। তিনি হয়তো শিল্পাচার্য ছিলেন না। যিনি শিল্পাচার্য বিশ্বকর্মা, তিনি প্রভাসেরই সন্তান এবং এঁরই কন্যা সংজ্ঞার বিবাহ হয়েছিল বিবস্বানের সঙ্গে। এই বিশ্বকর্মার নামও ত্বষ্টা হতে পারে এবং এই জন্যই বোধহয় পরবর্তী কালে দুই ত্বষ্টা এক হয়ে গেছেন নানা স্থানে।

পুরাণে যে সব অসুরের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে অনেককেই ইতিহাসে পাওয়া যায় না। যেমন মধু কৈটভ। বিষ্ণুর সঙ্গে মধু কৈটভের যুদ্ধের কাহিনীটি সম্পূর্ণ কল্পিত বলেই মনে হয়। দেবী মাহাত্ম্যে এর পরের কাহিনী মহিষাসুরের। দৈত্য বংশে এক মহিষের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এ মহিষ দেবী মাহাত্ম্যের মহিষ নয়। এর পর শুম্ভ নিশুম্ভ ও তাদের সেনাপতিদের যুদ্ধ কাহিনী। দৈত্য বংশে সুন্দ নিসুন্দ নাম আছে, কিন্তু শুম্ভ নিশুম্ভের নাম নেই। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে দেবী মাহাত্ম্যে বর্ণিত যুদ্ধের কাহিনী সম্পূর্ণ কল্পিত এবং বাস্তবের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। এমন কি সুরথ নামে কোন রাজার নামও রাজাদের বংশাবলীতে পাওয়া যায় না। যে দুর্গাসুর বা দুর্গমাসুরকে বধ করে দেবীর নাম দুর্গা হয়েছে বা গয়া মাহাত্ম্যের গয়াসুর—এদের নামও দৈত্য বা দানব বংশে খুঁজে পাওয়া যায় না। মন্বন্তর প্রসঙ্গেও এক একজন অসুরের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এঁরা যে দেবতা ও ঋষিদের মতোই কল্পিত, তাতে কোন সংশয় নেই। যাঁরা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক

পুরুষ, তাঁরা হ'লেন হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ বিরোচন বলি প্রভৃতি দৈত্য এবং বিপ্রচিত্তি বৃষপর্বা প্রভৃতি দানব ও বৃত্র প্রভৃতি নামের অসুর। বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষকে বধ করে হিরণ্যকশিপুর শত্রু হয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভেবেছিলেন যে এর পিছনে ইন্দ্রের উস্কানি আছে। তাই হিরণ্যকশিপু তাঁর ভ্রাতাকে বধ করার প্রতিশোধ নিতে ইন্দ্রাদি দেবতাকে স্বর্গচ্যুত করেছিলেন। বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকেও বধ করেন এবং তাঁর পুত্র প্রহ্লাদকে পাতালে অভিষিক্ত করেন। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচনকেও ইন্দ্র ছলনায় বধ করেন। বলি তখনও শিশু। দৈত্যরা তাই হিরণ্যকশিপুর কন্যা রচনার পুত্র বৃত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন বিরোচন হত্যার প্রতিশোধ নিতে। পরাজিত ইন্দ্র বৃত্রের সঙ্গে সন্ধি করে তাঁকেও ছলনা করে বধ করেন। এর পর বলি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে পুনরায় ইন্দ্রকে পরাজিত করে ত্রিলোক অধিকার করেন। এবারে অদিতির কনিষ্ঠ পুত্র বা তাঁর বংশধর বামন উরুক্রম ছলনায় বলিকে বদ্ধ করেন। বলি এই বন্ধন মেনে নিতেই দেবাসুরের দীর্ঘকালের দ্বন্দ্ব শেষ হয়ে যায়। এই বিবাদ বেশি দিনের নয়। এই সব যুদ্ধে বেশি দেবাসুরও হতাহত হয় নি। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে এঁদের সমাজ নিতান্তই ছোট ছিল। বিরোধ একান্ত ভাবেই পারিবারিক। পুরাণে এই দ্বন্দ্বকে অত্যন্ত বড় করে দেখানো হয়েছে।

হিরণ্যাক্ষ

হিরণ্যাক্ষের জন্যই যে বিবাদের সূত্রপাত, তা প্রায় সর্বজন স্বীকৃত। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু যমজ ভাই। হিরণ্যাক্ষই আগে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, পরে হিরণ্যকশিপু। হিন্দু শাস্ত্র মতে মাতৃ গর্ভে যার আগে জন্ম, সে-ই পরে ভূমিষ্ঠ হয় বলে হিরণ্যকশিপুই বড় ভাই। ছোট হিরণ্যাক্ষ। অনুমান করা যায় যে এঁরা ইলাবৃত

বর্ষেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং এঁদের আগে জন্মেছিলেন অদিতির পুত্র শক্র বিষ্ণু ও বিবস্বান। বিষ্ণু ক্ষীরোদ সমুদ্রতীরে নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। বিবস্বান বড় হয়ে ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে অন্তরীক্ষে অর্থাৎ হিমালয় অঞ্চলে চলে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কশ্যপের অন্য পত্নী অরিষ্টার সন্তান গন্ধর্বরাও চলে এসেছিল। বিবস্বান হয়েছিলেন গন্ধর্বদের রাজা। শক্র ইলাবৃত বর্ষেরই রাজা হয়ে বসলেন, তাঁর নাম হল ইন্দ্র। নানা পুরাণের বর্ণনা দেখে মনে হয় যে কাস্পিয়ান সাগরই সেকালের ক্ষীরোদ সমুদ্র। তাঁর রাজধানী বৈকুণ্ঠেই। বর্তমান কালের বাকু কিনা কে জানে! উত্তর তীরের কোন জনপদও হতে পারে। ইন্দ্রের রাজধানী হল অমরাবতীতে। এই শহর মেরুপর্বতের উপরেই ছিল বলে মনে করা হয়। অদিতির আর এক পুত্র বরুণও কোন সমুদ্রের তীরে গিয়ে রাজা হয়ে বসলেন। তিনি হলেন জলাধিপতি। বেশ বোঝা যায় যে অদিতির পুত্ররা একে একে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন, কশ্যপের অন্য পত্নীদের সন্তানরা তাঁরই আশ্রমে রয়ে গেলেন অনাদৃত হয়ে।

বিষ্ণু পুরাণে হিরণ্যাক্ষর কাহিনী নেই। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে এই কাহিনী উদ্ধৃত হচ্ছে। –

অনুজ হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুর খুব প্রিয় পাত্র ছিলেন। হিরণ্যাক্ষ একদিন যুদ্ধ করার জন্য গদা হাতে নিয়ে স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর দুই পায়ে সোনার নূপুর, গলায় বৈজয়ন্তী মালা। দেবতারা তাঁকে দেখে ভয়ে লুকোলেন। কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি গর্জন করে জলক্রীড়ার জন্য জলে প্রবেশ করলেন। সমুদ্রে বিচরণ করতে করতে তিনি বরুণের বিভাবরী পুরীতে পৌঁছে গেলেন। তার পর বরুণকে দেখতে পেয়ে উপহাস করবার জন্য তাঁকে প্রণাম করে বললেন, তুমি দানবদের জয় করে রাজসূয় যজ্ঞ করেছ, এখন আমার সঙ্গে একবার যুদ্ধ কর দেখি! হিরণ্যাক্ষর এই ব্যঙ্গ শুনে বরুণ ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু বাহুবলে সমর্থ হবেন না বলে ক্রোধ সংবরণ করে

বললেন, সম্প্রতি আমরা যুদ্ধাদি কৌতুকে ক্ষান্ত হয়েছি। তোমার মতো রণকৌশলে পণ্ডিতের একমাত্র বিষ্ণুর সঙ্গেই যুদ্ধ করে সন্তোষ হতে পারে। বরুণের কথায় হিরণ্যাক্ষ খুশী হলেন এবং নারদের মুখে বিষ্ণুর গতি জেনে রসাতলে প্রবিষ্ট হলেন। সেখানে একটি বরাহ দেখে বললেন, কী আশ্চর্য! এ যে জলচর বরাহ! তারপর নানা কটূক্তি বর্ষণ করলেন। বিষ্ণু পৃথিবীকে নিয়ে জল থেকে নিঃসৃত হয়ে তাঁকে জলের উপরে স্থাপন করলেন। তারপর হিরণ্যাক্ষর উপহাসের উত্তর দিলেন। দুজনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হল। সেই যুদ্ধ দেখবার জন্য ব্রহ্মা ঋষিপরিবৃত হয়ে এসে বললেন, এর সঙ্গে আপনি খেলা করবেন না, আসুরী বেলায় এই দুর্ধর্ষ দৈত্য বিষম বর্ধিত হবে। দৈত্যকে বধ করুন। এই কথা শুনে বিষ্ণু লাফিয়ে তার উপরে পড়লেন এবং কপোলের নিচে গদার আঘাত করলেন। কিন্তু হিরণ্যাক্ষর গদার আঘাতে তাঁর গদা হস্তচ্যুত হল। তাই দেখে দেবতারা হাহাকার করে উঠলেন। হিরণ্যাক্ষ এই সময়ে প্রহারের উপযুক্ত সময় পেয়েও যুদ্ধের ধর্মরক্ষার জন্য গদাঘাত করলেন না। বিষ্ণু সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করলেন। তিনি হিরণ্যাক্ষর নিক্ষিপ্ত গদা ধরে ফেললেন। হিরণ্যাক্ষ ত্রিশূল নিক্ষেপ করলে তিনি তা সুদর্শন চক্রে কেটে ফেললেন। হিরণ্যাক্ষ এগিয়ে এসে বিষ্ণুর বুকে মুষ্ট্যাঘাত করেই অন্তর্হিত হলেন এবং নানা প্রকার মায়া বিস্তার করলেন। তাই দেখে সবাই ভাবলেন যে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়েছে। আদি বরাহরূপী বিষ্ণু তাঁর সামনের পা দিয়ে হিরণ্যাক্ষর কর্ণমূলে আঘাত করলেন। এক পদাঘাতেই তিনি ভূতলে পড়ে নিহত হলেন। দেবতারা বললেন, এর কী সৌভাগ্য! ভগবানের চরণের আঘাতে এর মৃত্যু হল। এই ভাবে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে আদি বরাহ বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলেন।

এইবারে এই ঘটনাকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখা দরকার। এ কথা খুবই স্পষ্ট যে হিরণ্যাক্ষ স্বর্গরাজ্য অধিকার করতে বা কারও

সঙ্গে শত্রুতা করতে ঘর ছেড়ে বাহির হন নি। শরীর চর্চা করে তাঁর বাহুবল বেড়েছিল, তিনি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজতে বেরিয়েছিলেন বাহুযুদ্ধ বা গদাযুদ্ধ করবার জন্য। এই রকম যুদ্ধে কৌতুক হয় এবং এই কৌতুকের লোভেই তিনি ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু দেবতারা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। হিরণ্যাক্ষ স্বর্গ জয় করতে চান নি, ইন্দ্রের খোঁজ করেন নি। তিনি স্নান করবার জন্য সমুদ্রের তীরে গিয়ে বিভাবরী পুরীতে বরুণকে দেখেছিলেন। সম্পর্কে বড় ভাই বলেই বোধহয় প্রণাম করেছিলেন। কিন্তু বরুণ ভয় পেয়ে বলেছিলেন, যুদ্ধাদি কৌতুক ছেড়ে দিয়েছেন। এই কথাতেই বোঝা যাচ্ছে যে সেকালে যুদ্ধ ছিল ক্রীড়ার মতো কৌতুক। এখনও মল্লযুদ্ধ বক্সিং ক্যারাটে প্রভৃতি ক্রীড়া কৌতুকের অন্তর্ভুক্ত। বরুণ নিজে যুদ্ধ না করে বিষ্ণুকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

বিষ্ণুর পৃথিবী উদ্ধার একটি রূপক। মহা প্লাবনের পরে জলমগ্ন পৃথিবীর কোন্ স্থান বাসের বা কৃষিকর্মের উপযোগী হয়েছে, তাই তিনি খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। মেরু পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিলেন দেবতারা, বিবস্বান্ হিমালয় অঞ্চলে। বিষ্ণু খুঁজছিলেন উচ্চভূমি। তারই নাম পৃথিবী উদ্ধার। তাঁর শিরস্ত্রাণ ছিল বরাহের মুখের মতো। এইজন্য তাঁকে বরাহরূপী বিষ্ণু বলা হয়েছে। এই কাহিনী বরাহ অবতারের কাহিনী। এই শিরস্ত্রাণ পরিহিত বিষ্ণুকে দেখে হিরণ্যাক্ষ তাঁকে বরাহ ভেবে কটূক্তি বর্ষণ করেছিলেন। বিষ্ণু যে বাহুবলে হিরণ্যাক্ষের সমতুল্য ছিলেন না, তা কাহিনীতেই বলা হয়েছে। তাই তিনি সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করেছিলেন। হিরণ্যাক্ষ যুদ্ধের ধর্ম রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু বিষ্ণু ক্রীড়া যুদ্ধে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন এবং অনুমান করলে অন্যায় হবে না যে গদাঘাত বা পদাঘাতে নয়, তিনি তাঁর চক্র ব্যবহার করেছিলেন। বোধহয় পরাজয়ের গ্লানি এড়াতেই হত্যা করেছিলেন একজন নিরীহ মল্লযোদ্ধাকে।

হিরণ্যাক্ষ এই সময়ে যুবক ছিলেন। তাঁর বিবাহ হয়েছিল এবং

কয়েকটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল। বিষ্ণুপুরাণে এই পুত্রদের নাম আছে, কিন্তু আর কোন কথা নেই।

হিরণ্যকশিপু

হিরণ্যকশিপুর কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে খুব যত্ন সহকারে বর্ণিত হয়েছে। প্রিয় পুত্র প্রহ্লাদেব প্রতি পিতার বিদ্বেষ হল কেন, যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি নারদ বলেছিলেন, হরির বিক্রমে হিরণ্যাক্ষ নিহত হলে ভ্রাতার শোকে ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু তাঁর সভায় দানবদের বললেন, সবার প্রতি সমভাবাপন্ন হয়েও হরি দেবতাদের পক্ষপাতি হয়ে আমার প্রিয় ভ্রাতাকে হত্যা করেছে। আমি তাঁব রক্তে ভাইএর তর্পণ করে আমার দুঃখ দূর করব। তাতে বিষ্ণুপ্রাণ দেবতারাও বিনষ্ট হবে। তোমরা ভুবনে গিয়ে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সংহার করতে থাক। তাদের কোন দোষ না থাকলেও বিষ্ণুর আশ্রিত বলেই তাদের বধ কর।

এইটুকু পড়েই মনে হয় যে হিরণ্যকশিপুও কোন স্থানের রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং দনুর পুত্র দানবরা তাঁর রাজ্যে বাস করত। আরও একটি কথা জানা যায় যে হিরণ্যাক্ষ বধের ব্যাপারে দেবতাদের হাত ছিল বলে হিরণ্যকশিপু সন্দেহ করেছিলেন এবং এই ঘটনাব পূর্বে তিনি বিষ্ণুকে সমভাবাপন্ন ভাবতেন। বোঝা যাচ্ছে যে দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যদের বিরোধ আগে থেকে চলে আসছিল বলেই এই সন্দেহ করা হয়েছে এবং দানবরা তা বিশ্বাস করে প্রভুর আদেশে সোৎসাহে অত্যাচার আরম্ভ করে। জনগণ অসহায় হয়ে পড়লে দেবতারা আত্ম-গোপন করে ধরাতলে বিচরণ করতে লাগলেন। একথা শ্রীমদ্ভাগবতের, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিহীন। হিরণ্যকশিপু ভ্রাতার শ্রাদ্ধ তর্পণ করে ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাদের মা এবং নিজের জননী দিতিকে বললেন, আমার ভাইএর জন্য কারও শোক করা উচিত নয়, তার বীরোচিত মৃত্যু হয়েছে। তারপর মাকে সম্বোধন করে বললেন,

আত্মার মৃত্যু নেই, দেহ ধারণ করেই তার জন্ম ও মৃত্যু হয়। মায়ার প্রভাবেই আমাদের বিপরীত ভাবনা এবং তারই জন্য শোক। তারপর তিনি দুটি কাহিনী বললেন। তাঁর কথায় দিতি ও হিরণ্যাক্ষর স্ত্রী শোক ত্যাগ করলেন। হিরণ্যাক্ষর পুত্ররা এই সময়ে নাবালক বা শিশু বলেই মনে হয়।

এর পব হিরণ্যকশিপু নিজে অমর ও অপরাজেয় হবার জন্য মন্দব পর্বতের কন্দরে পাদাঙ্গুষ্ঠের উপরে ভর দিয়ে উর্ধ্ববাহু ও উর্ধ্ব দৃষ্টি হয়ে দারুণ কষ্টসাধ্য তপস্যা করেন। তাঁর তপোবহ্নির তাপে দেবতারা অসহিষ্ণু হয়ে ব্রহ্মাকে এই কথা জানালেন। ব্রহ্মা ঋষিদের নিয়ে হিরণ্য-কশিপুর আশ্রমে এসে দেখলেন যে তিনি বল্মীকাদিতে আবৃত হয়েছেন ও পিপীলিকা তাঁর রক্তমাংস খাচ্ছে। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে ব্রহ্মা বিস্মিত হয়েও সহাস্যে বললেন, তপস্যায় তুমি সিদ্ধ হয়েছ, তোমাব অভিলষিত বর প্রার্থনা কব। নিবম্বু উপবাসে তুমি দিব্য শতবর্ষ প্রাণ ধারণ করে আছ, এই অসাধাবণ তপস্যায় তুমি আমাকে জয় করেছ। বলে ব্রহ্মা তাঁর দেহে কমণ্ডলুর জল ছেটাতেই হিরণ্যকশিপু সেই বল্মীক স্তূপ থেকে বজ্রের মতো সুদৃঢ় অঙ্গ ও তেজ নিয়ে উঠে এলেন। তারপব ব্রহ্মাকে আকাশে দেখে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, যদি আপনি আমার অভিপ্রেত বর দিতে চান তো এই বর দিন যেন আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণীর হাতে আমার মৃত্যু না হয়। গৃহের অভ্যন্তরে বা বাহিরে, দিবসে বা রাত্রিতে, ভূমিতে বা শূন্য আকাশে, আপনার সৃষ্ট কারও দ্বারা, কোন মানুষ বা পশুদ্বারা, প্রাণহীন বা প্রাণবান দেবতা অসুব বা সর্পাদির দ্বারা, বা কোন অস্ত্রশস্ত্রেও যেন আমার মৃত্যু না হয়। যুদ্ধে আমি যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হই। জীবের উপর আপনার একাধিপত্য ও লোকপালদের মহিমা আমাকে দিন। আমার তপস্যার প্রভাব যেন কোনদিন নষ্ট না হয়। হিরণ্যকশিপুকে ব্রহ্মা এই সমস্ত বর দিয়ে প্রস্থান করলেন।

এইখানে শাপ ও বর সম্বন্ধে পৌরাণিক ধারণার কথা বললে

অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পুরাণকার কোন ঘটনা ঘটে যাবার অনেক পরে শাপ ও বরের কথা বলতেন। কিছু মন্দ ঘটলে বলতেন, দেবতা কিংবা ঋষির শাপে এই রকম ঘটল এবং ভাল হলে বলতেন তাঁদের বরে। হিরণ্যকশিপু বুঝেছিলেন যে দেবতাদের সঙ্গে বিবাদ করতে হলে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে এবং তিনি কিছুকাল ধরে নানা শক্তি সঞ্চয় করছিলেন। তারপর যখন তিনি দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গ অধিকার করলেন, তখন পুরাণকার বললেন যে তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে তাঁর প্রার্থিত বর দিয়েছিলেন।

যাই হোক, এক সময় দেখা গেল যে হিরণ্যকশিপু সকলকে পরাজিত করে ইন্দ্রের গৃহে বাস করছেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ছাড়া আর সকলেই তাঁর উপাসনা করছেন। সিদ্ধ বিদ্যাধর গন্ধর্ব ও অপ্সরারা সকলেই তাঁর স্তবগান করছেন এবং সমস্ত যজ্ঞে তিনি হবির ভাগও গ্রহণ করছেন। তাঁর এমন প্রভাব হল যে বিনা বর্ষণেই পৃথিবী শস্য দিত, সাগর ও নদীরাও রত্ন দিতে লাগল। বৃক্ষ সকল ঋতুতেই ফল পুষ্প শোভিত হল। এই ভাবে বহুকাল অতীত হবার পরে তাঁর উগ্র দণ্ডের ফলে সকলের উদ্বেগ হল। তারা হরির শরণ নিলে অশরীরী বাণী শোনা গেল, হিরণ্যকশিপু যখন তাঁর নিজের পুত্র প্রহ্লাদের উপরে অত্যাচার করবে, তখন আমি তাকে বধ করব। এই দৈববাণী শুনে দেবতারা বললেন, আর ভয় নেই, এবারে অসুর মরবে। বলে সবাই স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

কাহিনীর এই অংশ পড়ে বোঝা যায় যে হিন্দুধর্মের ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সবারই পূজনীয় ছিলেন। কিন্তু বিষ্ণু বা হরি নামের কোন ব্যক্তিও ছিলেন এবং হিরণ্যকশিপু সমস্ত যজ্ঞে সেই হরির ভাগ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। পুরাকালের যজ্ঞ একটা সামাজিক উৎসব ছিল, যজ্ঞে ভোজের জন্য বড় বড় পশু বধ করা হত। অশ্বমেধ যজ্ঞই প্রধান ছিল। এই সব যজ্ঞে সবাই নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন এবং দেশের রাজা ছিলেন যজ্ঞপুরুষ। যজ্ঞে মুখ্য ভাগ তাঁর এবং অন্যান্যরাও নির্দিষ্ট

ভাগ পেতেন। এটা ছিল রাজা ও রাজপুরুষদের প্রাপ্য। হিরণ্যকশিপু বিষ্ণু নামে কোন শক্তিশালী রাজাকে বঞ্চিত করেছিলেন এবং দেবতারা তাঁকে এই সংবাদ দিলে বিষ্ণু বললেন, তার পতন আসন্ন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে যে হিরণ্যকশিপুর চারটি পুত্রের মধ্যে প্রহ্লাদ মহান হয়েছিলেন। ঈশ্বরের যেমন সদ্‌গুণ, তেমনি তাঁর মধ্যেও ছিল। দেবতারা অসুরদের শত্রু হয়েও প্রহ্লাদকে সাধন মার্গে আদর্শ বলে স্বীকার করেন। তাঁর বিষ্ণুভক্তি ছিল স্বাভাবিক। তিনি কখনও কাঁদতেন, কখনও হাসতেন, কখনও আনন্দে গান গাইতেন। কখনও বা নির্লজ্জের মতো নৃত্য করতেন। এই রকমের মহাত্মা পুত্রের প্রতিও হিরণ্যকশিপু দ্রোহাচরণ করতে লাগলেন।

অসুররা শুক্রাচার্যকে পুরোহিতের পদে বরণ করেছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ষণ্ড ও অমর্ক হিরণ্যকশিপুর গৃহের নিকটেই থাকতেন। তাঁরা প্রহ্লাদ ও অন্যান্য অসুর বালককে দণ্ড নীতি প্রভৃতি পাঠ্য বিষয় পড়াতেন। একদিন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু পুত্রকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী ভাল লাগে? প্রহ্লাদ বললেন, 'আমি ও আমার' এই অসৎ অভিনিবেশের জন্য মানুষ সর্বদাই উদ্বিগ্ন। তাই আত্মার অধঃপতনের কারণ এই অন্ধকূপের মতো গৃহ ত্যাগ করে বনে গিয়ে হরির আশ্রয় নেওয়াই আমি ভাল মনে করি। পুত্রের এই কথা শুনে হিরণ্যকশিপু হেসে বললেন, শত্রুর বুদ্ধিতে বালকদের বুদ্ধি পরিচালিত হয়। গুরু গৃহে এদের ভাল করে রক্ষা করা দরকার, যাতে শত্রুপক্ষের কেউ ছদ্মবেশে এদের বুদ্ধি বিচলিত না করে। গুরুরা প্রহ্লাদকে স্বগৃহে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি বল তো, কেমন করে তোমার এই বুদ্ধি বিপর্যয় হল? প্রহ্লাদ বললেন, যাঁকে জানতে চেষ্টা করে ব্রহ্মারও মোহ জন্মায়, তিনিই আমাকে এই বুদ্ধি দিয়েছেন। গুরুরা নিরুপায় হয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন, ওরে কে আছিস, বেত আন্ দেখি। এর জন্যই আমাদের অখ্যাতি, তাই একে দণ্ড দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। এই ভাবে তাঁকে ভয় দেখিয়ে গুরু-

পুত্ররা প্রহ্লাদকে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের বিদ্যা পাঠ করালেন। আরও কিছু দিন অতিবাহিত হবার পর তাঁকে নিয়ে হিরণ্যকশিপুর কাছে গেলেন। প্রহ্লাদ তাঁর পিতাকে প্রণাম করতেই তিনি তাঁকে আদর করে কোলে বসিয়ে বললেন, এত দিন গুরুগৃহে থেকে যা শিখেছ, তার থেকে কিছু ভাল কথা আমাকে শোনাও। প্রহ্লাদ বললেন, 'বিষ্ণুতে ভক্তি যদি কেউ শিখে থাকে, তবে তারই ভাল অধ্যয়ন হয়েছে বুঝতে হবে। পুত্রের এই কথা শুনে হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হয়ে গুরুপুত্রকে বললেন, আপনারা কি আমার শাসন অমান্য করে একে এই শিক্ষা দিয়েছেন! গুরু পুত্র বললেন, একে আমরা এই শিক্ষা দিই নি, অন্য কেউও দেয় নি। এ তার স্বাভাবিক বুদ্ধি। হিরণ্যকশিপু তখন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই শিক্ষা তুমি কোথায় পেলে? প্রহ্লাদ বললেন, যারা বিষয়ে আসক্ত, তারা অধ্যাত্ম জ্ঞানগম্য ভগবানকে জানতে পারে না। বেদ থেকেই জানা যায় যে এক দেবতাই সবভূতে আছেন এবং তিনি সর্বব্যাপী। তবু গৃহাসক্ত মানুষের সাধুসঙ্গ না হলে বিষ্ণুর পদস্পর্শ লাভ করে না। এই কথা শুনেই হিরণ্যকশিপু রেগে প্রহ্লাদকে তাঁর কোল থেকে নামিয়ে দিলেন। বললেন, একে দূরে নিয়ে যাও। যে ছেলে পাঁচ বছর বয়সেই নিজের বাপ মাকে ছেড়ে পিতৃব্যহন্তাকে দাসের মতো অর্চনা করে, তাকে বধ করা উচিত। ঔষধের মতো উপকার করলে পরের পুত্রকেও নিজের সন্তানের মতো গ্রহণ করতে হয়, আর নিজের কোন অঙ্গ বিষাক্ত হলে সেই অঙ্গ ছেদন করেই অবশিষ্ট অঙ্গ রক্ষা করতে হয়।

দৈত্যরা এই আদেশ পেয়ে 'মার মার কাট কাট' বলে চিৎকার করে প্রহ্লাদের মর্মস্থলে শূলের আঘাত করতে লাগল। সে আঘাত নিস্ফল হলে হস্তী, সর্প, অভিচার, পর্বত থেকে নিক্ষেপ, মায়াবাজী, গর্তে আবদ্ধ রাখা, অনাহারে রাখা, বিষপ্রদান, হিম ঝড় আগুন জল এবং পাথর চাপা দিয়েও হত্যার চেষ্টা হল। কিন্তু কোন মতেই তাকে হত্যা করতে না পেরে হিরণ্যকশিপু ভাবলেন, এই বালকের

মৃত্যু নেই, কোন ভয়ও নেই। এর সঙ্গে বিরোধের ফলে হয়তো বা আমারই মৃত্যু হবে। এই ভেবে তিনি যখন অধোবদন হয়ে আছেন, তখন ষণ্ড ও অর্মক এই দুই গুরুপুত্র তাঁকে নির্জনে বললেন, আপনি ত্রিলোক বিজয়ী, দিক্‌পাল দেবতারাও আপনার ভয়ে ভীত। আপনি এমন চিন্তান্বিত কেন তা বুঝি না। প্রহ্লাদ এখনও বালক, তার ব্যবহারের দোষ গুণ বিচারের প্রয়োজন নেই। বয়স বাড়লে তার বুদ্ধিও ভাল হবে। গুরু শুক্রাচার্য না ফেরা পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন। গুরুপুত্রদের কথা অনুমোদন করে হিরণ্যকশিপু বললেন, তাই হোক। তত দিন আপনারা একে গৃহস্থের রাজধর্মের বিষয়ে উপদেশ দিন।

এর পর আচার্যরা তাঁকে ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের উপদেশ দিতে লাগলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ এই শিক্ষা ভাল বলে মেনে নিতে পারলেন না। গৃহের কাজে তাঁরা যখন অন্যত্র গেলেন, তখন অন্যান্য সমবয়সী বালকেরা অবসর বুঝে প্রহ্লাদকে ডাকল। তাদের বুদ্ধি দূষিত ছিল না বলে তারা প্রহ্লাদের প্রতি অনুরক্ত ছিল। প্রহ্লাদ তাদের বললেন, মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। অল্পকাল স্থায়ী হলেও এই জন্মে পরমার্থ লাভ সম্ভব। দেহ থাকলেই অদৃষ্ট বশে সুখ দুঃখ লাভ হয়। ইন্দ্রিয় সুখের জন্য চেষ্টা আয়ুক্ষয় করা ছাড়া আর কিছু নয়। শত বৎসর মানুষের আয়ু। ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির আয়ু তার অর্ধেক, তার কারণ নিদ্রায় তার নিরর্থক কাল কাটে। এই সংক্ষিপ্ত জীবনের কুড়ি বৎসর কাটে বাল্য ও কৈশোরের খেলাধূলায়, জরাগ্রস্ত ও অসমর্থ অবস্থায় কাটে শেষ কুড়ি বৎসর। অবশিষ্ট পরমায়ু গৃহাসক্ত মোহে বৃথা নষ্ট হয়। তাই নিজের চেষ্টায় নিজেকে মুক্ত করা যায় না বলে নারায়ণের শরণ নেওয়াই উচিত। দেবর্ষি নারদের নিকটে আমি এই ভাগবত ধর্মের কথা শুনেছি।

দৈত্য বালকেরা বলল, প্রহ্লাদ, আমরা তো দুই গুরুপুত্র ষণ্ড ও অর্মক ছাড়া আর কাউকে জানি না। আমাদের সংশয় হচ্ছে।

বিশ্বাসযোগ্য কোন কথা বলে আমাদের সংশয় দূর কর। প্রহ্লাদ এই কথা শুনে বলতে লাগলেন, তপস্যার জন্য আমার পিতা মন্দর পর্বতে গেলে দেবতারা দানবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করলেন। এই কথা জেনেই দানব দলপতিরা ভয়ে স্ত্রীপুত্র ফেলে পালিয়ে গেলেন। দেবতারা এসে দৈত্য রাজপুরী পর্যন্ত লুণ্ঠন করলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র আমার মাতাকে টেনে নিয়ে চললেন। মা যখন ভয়ে কাতর হয়ে কাঁদছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ সেখানে এসে বললেন, দেবরাজ, ইনি পরস্ত্রী ও সতী, এঁকে ছেড়ে দিন। ইনি অন্তঃসত্ত্বা, যত দিন এঁর সন্তান না হয় তত দিন ইনি আমার গৃহে থাকুন। দেবর্ষির কথায় ইন্দ্র আমার মাকে ছেড়ে দিয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন এবং দেবর্ষি আমার মাকে নিজের আশ্রমে এনে বললেন, তোমার পতি না ফেরা পর্যন্ত তুমি এই আশ্রমেই থাক। আমার মা ঋষির আশ্রমে থেকে তাঁর পরিচর্যা করেছিলেন। আমার জন্য তিনি যে জ্ঞান ও ধর্মের তত্ত্ব উপদেশ দিয়েছিলেন, মা তা ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু ঋষির অনুগ্রহে সেই স্মৃতি আমার আজও আছে। হরি সকল জীবের আত্মা ও ঈশ্বর, তিনি সকলের অন্তর্যামী। তাঁর চিন্তায় আমি যেমন শান্তি পাই, তোমরাও তেমনি শান্তি পাবে। মঙ্গল হবে তোমাদের।

দৈত্য বালকেরা গুরু ষণ্ড ও অর্মকের শিক্ষা পরিহার করে প্রহ্লাদের বিবেচনা গ্রহণ করল। গুরু যখন দেখলেন যে সমস্ত বালকের বুদ্ধিই এক রকম হয়েছে, তখন ভয় পেয়ে রাজার নিকটে গিয়ে সমস্ত জানালেন। রাজা হিরণ্যকশিপু রোষাবিষ্ট হয়ে প্রহ্লাদকে বললেন, তুমি কি আমাদের কুলনাশ করবার জন্য জন্মেছ? কার বলে তুমি আমাদের শাসন লঙ্ঘন করছ?

প্রহ্লাদ বললেন, যাঁর বলে আমি বলবান, তিনি শুধু আমার · নন, আমার আপনার ও সকলেরই বল তিনি, নিজের বলে তিনি স্থাবর জঙ্গম সকলকেই বশীভূত করে রেখেছেন। মনে সম ভাব ধারণ করলে আপনারও আর বিদ্বেষ থাকবে না। উৎপথগামী মন ছাড়া আর শত্রু

নেই। মনের সম ভাবই অনন্তের শ্রেষ্ঠ আরাধনা। যাঁরা জ্ঞানী ও সবার প্রতি সমভাবাপন্ন, তাঁদের আর কল্পিত শত্রু থাকে না।

হিরণ্যকশিপু বললেন, মরবার জন্যই বোধ হয় তুমি এই সব কথা বলছ! তোমার জগদীশ্বর কোথায় আছে বল। তুমি যে বলছ তিনি সর্বত্র আছেন, কই, এই স্তম্ভের মধ্যে তো তাঁকে দেখা যাচ্ছে না? আজ আমি তোমার মাথা কাটছি, দেখি হরি তোমাকে কেমন করে রক্ষা করে! বলে হিরণ্যকশিপু ক্রোধে তর্জন করে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে নেমে সবলে স্তম্ভের উপরে মুষ্ট্যাঘাত করলেন। অমনি সেই স্তম্ভ থেকে ভীষণ শব্দ উত্থিত হল। সেই ধ্বনি শুনে হিরণ্যকশিপু সভার দিকে চেয়ে দেখলেন। কিন্তু যে শব্দ শুনে দানবরা ভীত হয়েছিল, তার কারণ দেখতে পেলেন না। ভগবান ভক্ত প্রহ্লাদের কথা সত্য প্রমাণ করবার জন্য অদ্ভুত এক রূপে স্তম্ভ থেকে বহির্গত হলেন। সে রূপ মৃগের নয়, মানুষেরও নয়। সে কি নৃমৃগেন্দ্র নরসিংহ রূপ! জলন্ত স্বর্ণগোলকের মতো চোখ, জটাকেশরে আবৃত বিশাল মুখ, তীক্ষ্ণদন্ত ও ক্ষুরধার জিহ্বা, শঙ্কুর মতো কান এবং বিদীর্ণ প্রান্তের গণ্ড ভীমদর্শন। দেহ তার গগনস্পর্শী, স্থূল গ্রীবা, প্রশস্ত বক্ষ ও কৃশ উদর। চন্দ্র কিরণ ধবল রোমে আবৃত তার সর্ব দেহ, চারি দিকে প্রসারিত বাহু, তাতে আয়ুধের মতো ভয়ঙ্কর রূপ। এই মূর্তি দেখে হিরণ্যকশিপু বললেন, স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে নানা প্রকার মায়া প্রদর্শনে সক্ষম এই হরিই আমার মৃত্যুর কারণ হবে। এই বলে তিনি গর্জন করে গদা হাতে নৃসিংহকে আক্রমণ করলেন। তাঁর পরাক্রম দেখে দেবতারা ব্যাকুল চিত্তে মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করে রইলেন। হিরণ্যকশিপু খড়্গ চর্ম নিয়ে শ্যেন বেগে উপরে ও নিচে ভ্রমণ করছিলেন। নৃসিংহ তাঁকে ধরতেই তিনি যেন বিবশ হয়ে গেলেন। সভার দ্বারে বাহিরে বা ভিতরে নয়, উরুর উপরে—ভূমিতে বা শূন্যে নয়, নখ দিয়ে—অস্ত্র-শস্ত্রে নয়, দিবা বা রাত্রি নয়– এই রকম সন্ধ্যায় হরি অসুরকে বিদীর্ণ করলেন। তারপর

ক্রোধাবেশে তিনি নৃপাসনে বসলেন। কিন্তু ভয়ে কেউ তাঁর সেবা করতে অগ্রসর হল না।

দেবতাদের বিমানে আকাশ পরিব্যাপ্ত হল। তাঁরা দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন। গন্ধর্বরা গান আরম্ভ করলেন এবং অপ্সরারা নৃত্য করতে লাগলেন। ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র ঋষি চারণ প্রভৃতি বিষ্ণুর পার্ষদরা অনতি-দূরে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পৃথক ভাবে স্তব করতে লাগলেন। তাঁরা দূর থেকেই স্তব করলেন, কাছে যেতে কেউ সাহস পেলেন না। লক্ষ্মীও এই ভয়ংকর মূর্তি দেখে শঙ্কায় সমীপে গেলেন না। তখন ব্রহ্মা প্রহ্লাদকে বললেন, প্রভুর ক্রোধ উপশমের জন্য তুমি নিকটে যাও। 'যথা আজ্ঞা' বলে প্রহ্লাদ নৃসিংহের নিকটে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। নৃসিংহ তাঁর মাথায় হাত রাখতেই প্রহ্লাদ তাঁর স্তব করে বললেন, সকলের ভয় দূর করার জন্য আপনি ক্রোধ ত্যাগ করুন। নৃসিংহ প্রীত হয়ে প্রহ্লাদকে বললেন, তুমি বর নাও। এই বলে নানা রকমের বরের লোভ দেখালেও প্রহ্লাদ কিছুই চাইলেন না। বললেন, স্বভাবতই মানুষ কামনায় আসক্ত। বর দিয়ে আপনি আমাকে কামনার লোভ দেখাবেন না। আপনাকে পেয়েও যে সাংসারিক মঙ্গল চায়, সে আপনার ভৃত্য নয়। তবে বর দিয়ে আপনি যদি সন্তোষ লাভ করেন, তবে এই বর দিন যে আমার হৃদয়ে যেন কামনার অঙ্কুর উদ্‌গত না হয়। ভগবান বললেন, বৎস, তোমার মতো ভক্ত ইহকাল বা পরকালের জন্যেও কিছু চায় না। তবু আমার আজ্ঞা পালন কর। তুমি এই মন্বন্তর কাল এখানে দৈত্য রাজ্য ভোগ কর। পুণ্য আচরণ করে পাপ ক্ষয় কর। প্রহ্লাদ বললেন, আপনার কাছে আমি আর একটি বর চাই। আমার পিতা আপনাকে না জেনে নিন্দা করেছেন। তাঁর ভাইকে হত্যা করেছেন বলে আমার উপরে তিনি অত্যাচার করেছেন। এই পাপ থেকে তাঁকে মুক্তি দিন। ভগবান বললেন, তোমার কুল পাপ মুক্ত হয়েছে। এইবারে তোমার পিতার প্রেত কার্য কর। তারপর পিতার আসনে অধিষ্ঠিত হও।

ভগবানের আজ্ঞানুসারে প্রহ্লাদ তাঁর পিতার পারলৌকিক কর্ম সম্পাদন করলেন। ব্রহ্মা নৃসিংহের স্তব করে বললেন, আমাদের ভাগ্য যে আপনি অসুর বধ করে জনগণের সন্তাপ দূর করলেন। ভগবান বললেন, অসুরদের আপনি এ রকম বর আর দেবেন না। বলে অন্তর্হিত হলেন। এর পর ব্রহ্মা শুক্রাচার্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রহ্লাদকে দৈত্য দানবের আধিপত্য দান করলেন এবং আশীর্বাদ করে ফিরে গেলেন।

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর কথা অন্য রকম ভাবে বলা হয়েছে। হিরণ্যকশিপুর আদেশে দৈত্যরা প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু বিষ্ণু তাঁকে উদ্ধার করলে প্রহ্লাদ তার পিতার নিকটে গিয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করেছিলেন। পিতা তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে বাষ্পার্দ্র নয়নে তাঁকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, তুমি জীবিত আছ বৎস! এর পরই তিনি প্রহ্লাদের প্রতি প্রীতিমান হলেন এবং নিজের অসদ্ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করতে লাগলেন। প্রহ্লাদও তাঁর গুরুর ও পিতার শুশ্রূষা করতে লাগলেন। তারপর বিষ্ণু নৃসিংহ রূপে হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করলে প্রহ্লাদ দৈত্যদের অধিপতি হয়েছিলেন। এই রাজ্যশ্রী লাভে তাঁর কর্মশুদ্ধি হল। পুত্র পৌত্র ও ঐশ্বর্য পেয়ে ভোগের অধিকার ক্ষীণ হওয়ায় পাপপুণ্য বর্জিত হলেন। তারপর তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হলেন।

এই দুটি উপাখ্যান পড়ে বাস্তবে কী ঘটেছিল তা অনুমান করার চেষ্টা করা যেতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে হিরণ্যকশিপুর রাজত্বকালে বিনা বর্ষণে পৃথিবী শস্য দিত এবং বৃক্ষ সকল ঋতুতেই ফল পুষ্প শোভিত হয়েছিল। প্রহ্লাদ বিষ্ণুর ভক্ত হয়েছেন দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর শত্রুরা প্রহ্লাদকে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। পুত্রকে হত্যা করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ ছিল, কিন্তু বাধা ছিল স্নেহের। ছোট ছেলে বলে তাকে ঠিক পথে আনবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে প্রহ্লাদের জন্ম নারদের আশ্রমে

এবং প্রথম শিক্ষাও তাঁরই কাছে। হতে পারে, প্রহ্লাদ বিষ্ণু ভক্তি পেয়েছিলেন নারদের নিকটে। কিন্তু হিরণ্যকশিপু নানা ভাবে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন, এ কথা সত্য হতে পারে না এইজন্য যে যত উপায়ে প্রহ্লাদকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে বলা হয়েছে, তার যে কোন একটিই একজনকে বধ করাব জন্য যথেষ্ট। মনে হয় যে শত্রু পক্ষে যোগ দেবার জন্য হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ত্যাগ করেছিলেন বা নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ পরে অনুতপ্ত হয়ে পিতার নিকটে ফিরে এসেছিলেন এবং পিতাও তাঁকে ক্ষমা করে ঘরে নিয়েছিলেন। এর পর বিষ্ণুপুরাণেব উক্তি থেকে মনে হয় যে অরণ্যে মৃগয়ায় গিয়ে কোন নর বা পুরুষ সিংহের হাতে হিরণ্যকশিপুব মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি দৈত্যদেব অধিপতি হয়েছিলেন দেবতাদের অনুগ্রহে। এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এইজন্য যে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর ব্যাপারে প্রহ্লাদের হাত ছিল। অর্থাৎ প্রহ্লাদ বাজ্যের লোভে তলায় তলায় দেবতাদেব সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিষ্ণুকে ডেকে এনেছিলেন। বিষ্ণু এসেছিলেন এমন কোন শিরস্ত্রাণ অথবা মুখোস পরে যে তাঁকে সিংহ বলে মনে হয়েছিল—উপরের অংশ সিংহের মতো, আর নিচের অংশ মানুষ। এরই নাম নরসিংহ অবতার। দেখা গেছে যে দৈত্যরা কাঠের তৈরি গদা ব্যবহাব করতেন। কিন্তু বিষ্ণু জানতেন ধাতুর ব্যবহার। বিশ্বকর্মা তাঁকে চক্র নির্মাণ করে দিয়েছিলেন এবং শিবকে শূল। বিষ্ণু এই চক্র দিয়ে গদাধারী হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন এবং হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন বাঘ-নখ জাতীয় কোন ধারালো নখের আঘাতে। এই নখ তিনি শিবাজীর মতো গোপন রেখে অতর্কিতে ব্যবহার করেছিলেন। এই সুযোগ করে দেবার জন্যই প্রহ্লাদ হয়তো দেবতাদের সহায়তায় দৈত্যদের অধিপতি হতে পেরেছিলেন। উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট -প্রহ্লাদের সঙ্গে দেবতাদের বিবাদ হবে না। প্রহ্লাদ তাঁদের নিজেদেরই লোক। আর এই জন্যই পুরাণকাররা প্রহ্লাদের যশ গান করেছেন পঞ্চমুখে।

এই ঘটনার অনেক দিন পরে ইন্দ্র বজ্রের অধিকারী হয়েছিলেন। বজ্র বন্দুকের মতো আগ্নেয়াস্ত্র, লোহার বদলে প্রাণীর অস্থি দিয়ে নির্মিত, বারুদ এসেছিল ভদ্রাশ্ববর্ষ অর্থাৎ এ যুগের চীনদেশ থেকে। পুরাণে বজ্র নির্মাণের কথা আছে।

বিরোচন

ইন্দ্র দানব কন্যা শচীকে বিবাহ করে ভেবেছিলেন যে দানবরা দৈত্যদের সহায়তা করতে পারে, কিন্তু নিজেরা দেবতাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করবে না। তাই প্রহ্লাদকে হাত করে ভেবেছিলেন যে কিছু দিন নিশ্চিন্তে বাস করা যাবে। ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণুর হাতে নিহত হবার পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অন্ধককে হিরণ্যকশিপু মহাপ্লাবনের পর সমুদ্র থেকে উত্থিত পাতালের রাজপদে বসিয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর ইন্দ্র স্বর্গ পুনরাধিকার করে প্রহ্লাদকে পাতালে পাঠালেন। অন্ধক আপত্তি না করে প্রহ্লাদকে মেনে নেন।

শোনা যায় যে বজ্রাঙ্গ নামে দিতির আর এক পুত্র ছিল। হিরণ্যকশিপু নিহত হবার পরে বজ্রাঙ্গ ইন্দ্রের কেশাকর্ষণ করে মায়ের কাছে নিয়ে আসেন। কিন্তু ব্রহ্মা ও কশ্যপ এসে ইন্দ্রকে ছেড়ে দিয়ে তাঁকেই ত্রিলোক ভোগ করতে বলেন। কিন্তু বজ্রাঙ্গ রাজ্যাভিলাষী ছিলেন না। তিনি ইন্দ্রকে ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে তপস্যা করতে চলে যান। এঁদেরই পুত্রের নাম তারক। পুরাণে এই তারক একজন বিখ্যাত অসুর।

প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচনকে ছলনা করে বধ করেছিলেন ইন্দ্র। দৈত্য বিরোচন দানব বৃষপর্বার কন্যা সুরুচিকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি ধার্মিক ও দানশীল ছিলেন। তবু কোন দিন শত্রুতাচরণ করতে পারেন ভেবে ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁর কাছে এসে দানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে চেয়েছিলেন বিরোচনের সমুকুট শির। বিরোচন তাই দিয়েছিলেন। এঁর পুত্র বলি তখন শিশু। গুরু শুক্রাচার্য এই শিশুকে সিংহাসনে

বসিয়ে তাঁকে রক্ষার কথা ভাবতে লাগলেন। প্রহ্লাদ তখন বাণপ্রস্থে জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু এই শঠতার প্রতিবাদ করেছিলেন বলে জানা যায় না। দৈত্যরা জানতেন যে ইন্দ্রের প্ররোচনাতেই বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছেন। আর দেবতারাও দৈত্যগুরু শুক্রের মন্ত্রবলের কথা জানতেন। তাই শুক্রের অনুপস্থিতিতেই তাঁরা দৈত্যদের আক্রমণ করতেন। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর সময়ে শুক্র উপস্থিত ছিলেন না বলে মনে হয় না।

বিরোচনকে বধ করবার পরেও দেবতারা যে ক্ষান্ত হন নি, তা দেবী ভাগবতের একটি কাহিনী থেকে জানা যায়। তাঁরা বিষ্ণুর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দৈত্যদের আক্রমণ করলেন। কিন্তু শুক্রকে দেখতে পেয়ে যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। শুক্র দৈত্যদের বললেন, বিষ্ণু তোমাদের সকলকে বধ করবেন। আমার তত মন্ত্রবল নেই যে তাঁর হাত থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারি। তাই আমি মহাদেবের কাছ থেকে মন্ত্র আনতে যাচ্ছি। তোমরা অপেক্ষা কর। দৈত্যরা বললেন, দেবতাদের কাছে পরাজিত হয়ে আমরা তো এখন খুব দুর্বল। আমরা কী করব? শুক্র বললেন, আমি না ফেরা পর্যন্ত তোমরা শান্ত হয়ে তপস্বীর মতো থাক। দেশ কাল ও বল জেনে সময় মতো সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই চার উপায় প্রয়োগ করতে হয়। দুঃসময়ে শত্রুদেরও সেবা করতে হয়, নিজের শক্তির উপচয় হলেই তাদের বিনাশ করবে। এই বলে শুক্র মহাদেবের নিকটে গেলেন এবং দৈত্যরা প্রহ্লাদকে দেবতাদের নিকটে পাঠালেন। প্রহ্লাদ দেবতাদের কাছে গিয়ে বিনীত ভাবে বললেন, আমরা অস্ত্র ত্যাগ করেছি, এখন আমরা বল্কল পরে তপস্যা করব। প্রহ্লাদের কথায় দেবতারা যুদ্ধে বিরত হয়ে গৃহে ফিরে গিয়ে আমোদ প্রমোদে রত হলেন।

এইখানে বলা ভাল যে প্রহ্লাদ যথাসময়ে বিরোচনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে বনে গিয়েছিলেন। তাই তিনি আর দৈত্যদের অধিপতি

ছিলেন না। বিরোচনের মৃত্যুর পর রাজা হয়েছিলেন বলি। হিরণ্যাক্ষর পুত্র অন্ধক এর আগেই নিহত হয়েছিলেন।

বৃহস্পতি ও শুক্র

এদিকে শুক্র কৈলাসে গিয়ে মহাদেবকে প্রণাম করে বললেন, আমি অসুরদের জয়ের জন্য মন্ত্র নিতে আপনার কাছে এসেছি। মহাদেব ভাবলেন যে দেবতাদের রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য। তাই বললেন, তুমি সহস্র বৎসর অধোমুখ হয়ে তুষের ধূম পান করে তপস্যা কর। তবেই আমার কাছে মন্ত্র পাবে। 'তাই করব' বলে শুক্র তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন।

দেবতারা এই দেখে দৈত্যদের আক্রমণ করলেন। দৈত্যরা বললেন, আমরা তো অস্ত্র ত্যাগ করেছি, আমাদের গুরু তপস্যা করতে গেছেন। তোমরাও আমাদের অভয় দিয়েছিলে, এখন আবার আমাদের বিনাশ করতে এসেছ কেন? দেবতারা বললেন, তোমরা তো ছল করে তোমাদের গুরুকে মন্ত্র শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছ! সনাতন ধর্ম হল, ছিদ্র পেলেই শত্রুকে বধ করবে। দেবতাদের এই কথায় দৈত্যরা পালিয়ে গিয়ে শুক্রের মায়ের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু দেবতারা তাঁর আশ্রমেই দৈত্যদের বিনাশ করতে লাগলেন। শুক্রের মা কুপিত হয়ে দেবতাদের নিদ্রাবশ করলেন। এই ব্যাপার দেখে বিষ্ণু ইন্দ্রকে তাঁর শরীরে প্রবেশ করতে বললেন। ইন্দ্র তাই করে জাগ্রত ও নির্ভয় হলেন। শুক্রের মা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তপোবনে তোমাকে আমি বিষ্ণুর সঙ্গে ভক্ষণ করব। দেবতারা তাঁদের দুজনকে অভিভূত দেখে চিৎকার করে উঠলেন। ইন্দ্র বিষ্ণুকে বললেন, এই দুষ্টা আমাদের দগ্ধ করবার আগেই একে বধ করুন। বিষ্ণু তখনই স্ত্রী বধে ঘৃণা ত্যাগ করে সুদর্শন চক্রে শুক্রের মাতার মস্তক ছেদন করলেন। কিন্তু শুক্রের মাতা হলেন ভৃগুর স্ত্রী। বিষ্ণু এঁদেরই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাই বিষ্ণু ও ইন্দ্র দুজনেই মনে মনে অভিশাপের শঙ্কা করতে লাগলেন।

ভৃগু এই স্ত্রী বধ দেখে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে বিষ্ণুকে বললেন, ছি ছি, তুমি এই অকাজ করলে! তুমি অতি দুরাচার, কৃষ্ণ সর্পের মতো খল তোমার ব্যবহার। ইন্দ্রের জন্য তুমি এই কাজ করেছ! কিন্তু ইন্দ্রকে আমি অভিশাপ দেব না, অভিশাপ দেব তোমাকে। তুমি আমাব শাপে বহুবাব মর্ত্যে অবতীর্ণ হও ও পাপের ফল স্বরূপ গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ কর। তাবপর ভৃগু তাঁব স্ত্রীব ছিন্ন মুণ্ড দেহে যোজনা করে মন্ত্রপূত জলে তাঁর জীবন দান কবলেন।

দেবী ভাগবতেব এই কাহিনী থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে বিষ্ণু ইন্দ্রকে অন্যায় ভাবে সাহায্য করার জন্য নিন্দিত হয়েছেন। কী ঘটেছিল তা সঠিক ভাবে বোঝা না গেলেও এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে পুত্র শুক্রেব শিষ্য দৈত্যদেব আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টাব জন্য ভৃগুপত্নীকে নিগৃহীত হতে হয়েছিল এবং বিষ্ণু বা ইন্দ্র এমন কিছু গর্হিত কাজ করেছিলেন যা পুরাণকার অস্বীকাব বা গোপন করতে পারেন নি। এব পবেব ঘটনাও প্রশংসার যোগ্য নয় এবং এ যুগের মানেও নিন্দিত।

দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে যে ইন্দ্রেব মায়া নিদ্রা অপগত হলেও শুক্রেব তপস্যাব কথা চিন্তা করে তাঁব মনে সুখ রইল না। তিনি তাঁর কন্যা জয়ন্তীকে ডেকে বললেন, তোমাকে আমি শুক্রের হাতে অর্পণ করলাম। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে আমার হিতের জন্য তাঁকে বশ কর। পিতার আদেশে জয়ন্তী শুক্রের নিকটে গিয়ে দেখলেন যে তিনি ধূমপান করছেন। জয়ন্তী কদলীপত্রে বীজন করে, নির্মল জল এনে, মধ্যাহ্নে তাঁর মাথার উপরে ছায়া রচনা করে, সুপক্ক ফল কুশ ও কুসুম এনে, পল্লব শয্যা রচনা করে রাখতেন। এই ভাবে বহু বৎসর মুনির পরিচর্যা করলেন। সহস্র বৎসর পূর্ণ হলে মহেশ্বর বর দিতে এসে বললেন, তুমি সকলের অভিভাবক, সমস্ত প্রাণীর অবধ্য, প্রজাদের ঈশ্বর ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হবে। তারপর শুক্র জয়ন্তীকে দেখে বললেন, তুমি কে ও কেন আমার কাছে এসেছ? তোমার সেবায় আমি প্রীত

হয়েছি। তুমি আমার কাছে কী চাও বল। জয়ন্তী বললেন, আপনি তপোবলে আমার মনের ভাব জেনে নিন। শুক্র বললেন, আমি তোমার মনোভাব জানি, তবু বল। জয়ন্তী বললেন, আমি ইন্দ্রের কন্যা, জয়ন্তের ছোট বোন জয়ন্তী। পিতা আমাকে আপনার হাতে সমর্পণ করেছেন। শুক্র গৃহে ফিরে জয়ন্তীর পাণিগ্রহণ করে দশ বৎসর অদৃশ্য ভাবে তাঁর সঙ্গে বাস করতে লাগলেন।

এ দিকে ইন্দ্র তাঁর গুরু বৃহস্পতিকে বললেন, আপনি দৈত্যদের কাছে গিয়ে মায়া বলে তাদের প্রলোভিত করুন। ইন্দ্রের কথায় বৃহস্পতি শুক্রের রূপ ধারণ করে দৈত্যদের ডেকে বললেন, আমি শিবকে সন্তুষ্ট করে যে বিদ্যা লাভ করেছি তা তোমাদের বুঝিয়ে দেব। বৃহস্পতিকে শুক্র মনে করে দৈত্যরা তাঁকে প্রণাম করে নির্ভয় হলেন এবং তাঁর মায়ায় মোহিত হয়ে দৈত্যরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁরই শরণাপন্ন হলেন।

নিজের স্বার্থে ইন্দ্র তাঁর কন্যাকে পাঠালেন শুক্রের নিকটে এবং গুরুকে পাঠালেন দৈত্যদের ছলনা করতে। বৃহস্পতি এই সময়ে দৈত্যদের যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন, তা তাঁর এক শিষ্য চার্বাকের নামে প্রচারিত হয়েছিল। এই দর্শনের নাম চার্বাক দর্শন এবং বলা হয় যে দৈত্যদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করবার জন্য এই নাস্তিক দর্শন প্রচারিত হয়েছে। বৃহস্পতির নিজের চরিত্র শুক্রের মতো দৃঢ় ও পবিত্র ছিল না। তিনি তাঁর অন্তঃসত্ত্বা ভ্রাতৃবধূ মমতাকে হরণ করে উপভোগ করেছিলেন। তাঁর নিজের স্ত্রী তারা চন্দ্রের সঙ্গে বাস করেছিলেন দীর্ঘকাল। এই নিয়েও দেবাসুরের সংগ্রাম আসন্ন হয়ে উঠেছিল। যথাস্থানে সে কথা বলা হবে।

দশ বৎসর পূর্ণ হবার পর জয়ন্তীর সঙ্গে ক্রীড়া শেষ করে শুক্র দৈত্যদের কাছে এসে দেখলেন যে ছদ্মবেশে বৃহস্পতি তাঁদের কাছে বসে আছেন এবং বেদ নিন্দাপর জৈন ধর্মের উপদেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছিলেন, অহিংসাই পরম ধর্ম, এমন কি আততায়ীকেও বধ

করা উচিত নয়। ভোগ নিরত দ্বিজদের রসনা পরিতৃপ্তির জন্যই যজ্ঞে পশুহিংসার কথা বেদে বলা হয়েছে। এই সব কথা শুনে শুক্র ভাবলেন, ধর্ম শাস্ত্রের প্রবর্তক ও দেবতাদের গুরু হয়েও বৃহস্পতি এই পাষণ্ড মত গ্রহণ করেছেন। লোভের বশীভূত হয়ে এই পাষণ্ড পণ্ডিত দেখা যাচ্ছে যে নটের মতো ছদ্মবেশ ধারণ করে দৈত্যদের বঞ্চনা করছেন। তাই শুক্র হাসতে হাসতে শিষ্যদের বললেন, আমার রূপ ধারণ করে বৃহস্পতি তোমাদের বঞ্চনা করছেন। দৈত্যরা দুজনকেই এক রকম দেখে বিস্মিত হয়ে অধ্যাপনারত ব্যক্তিকেই শুক্র বলে স্থির করলেন। দেবগুরুও বললেন, উনিই বৃহস্পতি, আমার রূপ ধারণ করে তোমাদের বঞ্চনা করতে এসেছেন। ওঁর কথা তোমরা বিশ্বাস কোরো না। শুক্র দৈত্যদের অনেক বোঝালেন, কিন্তু বৃহস্পতির মায়ায় তাঁরা কিছুই বুঝলেন না। বৃহস্পতিকেই তাঁরা গুরু বলে গ্রহণ করেছেন দেখে শুক্র তাঁদের শাপ দিলেন, তোমরা আমার কথা শুনলে না, হতবুদ্ধি হয়ে তোমরা পরাভূত হবে। অল্প দিনের মধ্যেই তোমরা আমাকে অবজ্ঞা করার ফল পাবে। এই বলে শুক্র চলে গেলেন এবং বৃহস্পতি আনন্দে অবস্থান করতে লাগলেন। তার পর আর এখানে থাকবার দরকার নেই বুঝে তিনি নিজ রূপ ধারণ করে প্রস্থান করলেন এবং ইন্দ্রের নিকটে গিয়ে শুক্রের শাপের কথা জানালেন। এর পর দেবতারা পরামর্শ করে দৈত্যদের আক্রমণ করতে যাত্রা করলেন। বৃহস্পতি অন্তর্হিত হবার পর দেবতারা যুদ্ধের আয়োজন করছেন দেখে দৈত্যরা বলাবলি করতে লাগলেন, আমরা বৃহস্পতির মায়ায় মোহিত হয়েছি। গুরু ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেছেন, তাঁকে প্রসন্ন করতে হবে। এই ভাবে তাঁরা প্রহ্লাদকে সামনে নিয়ে শুক্রের কাছে উপস্থিত হলেন। শুক্র বললেন, আমার হিতবাক্য তোমরা শোন নি। এখন সেই বঞ্চক পণ্ডিতের কাছেই যাও। প্রহ্লাদ তাঁর পা ধরে বললেন, আমরা আপনার পুত্রের মতো, আপনি আমাদের ত্যাগ করবেন না। আমরা যে বঞ্চিত হয়েছি, তা তো আপনি বুঝতেই পারছেন। সাধুদের

কোপ ক্ষণস্থায়ী। আপনি ক্রোধ পরিহার করে আমাদের উপরে প্রসন্ন হোন। প্রহ্লাদের কথায় প্রসন্ন হয়ে শুক্র বললেন, ভয় নেই. আমি তোমাদের রক্ষা করব।

এর পর দেবী ভাগবতে আছে যে শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধে দৈত্যরাই জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু দেবীর আদেশে তাঁরা পাতালে চলে গিয়েছিলেন।

বিশ্বরূপ

গুরু বৃহস্পতিও একবার তাঁর শিষ্য দেবতাদের পরিত্যাগ করেছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য লাভে মত্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র একবার শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেছিলেন। এক দিন তিনি শচীকে বামে নিয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। মরুৎ প্রভৃতি তাঁকে ঘিরে ছিলেন এবং অপ্সরা ও গন্ধর্বরা তাঁর স্তুতি ও যশোগান করছিলেন। এমন সময় দেবগুরু বৃহস্পতি সেই সভায় এলে ইন্দ্র তাঁর আসন থেকে একটুও বিচলিত হলেন না। এই দেখে তাঁর মদ-বিকার ঘটেছে ভেবে তিনি নিঃশব্দে সভা থেকে বেরিয়ে নিজের গৃহে চলে গেলেন। ইন্দ্র তখনই নিজের দোষ বুঝতে পেরে বললেন, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে আমি অন্যায় করেছি। আমি পায়ে ধরে তাঁকে প্রসন্ন করব। কিন্তু বৃহস্পতি মায়া বলে গৃহ থেকে অদৃশ্য হয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর সন্ধান পেলেন না।

এ দিকে ইন্দ্রের এই বিপত্তির কথা শুনেই অসুররা তাঁদের গুরুর অনুমতি নিয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ইন্দ্র দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মার আশ্রয় নিলেন। ব্রহ্মা বললেন, বৃহস্পতিকে অভিনন্দন না করে তোমরা গুরুতর অন্যায় করেছ। এখন তোমরা ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের সেবা কর, তিনি তোমাদের অভীষ্ট সাধন করবেন। এই কথা শুনেই দেবতারা ত্বষ্টার পুত্রের নিকটে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, বৎস, তোমার

তজে আমরা যাতে শক্র জয় করতে পারি, সেই জন্য তোমাকে আমরা উপাধ্যায় রূপে বরণ করছি। বিশ্বরূপ বললেন, পৌরহিত্য যদিও অধর্মের কারণ ও নিন্দনীয় বৃত্তি, তবু আমি আপনাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারি না বলেই বলছি যে আপনাদের সব কাজ আমি করব। এর পর তিনি পৌরোহিত্যে বৃত হয়ে সব কাজ করতে লাগলেন। বৈষ্ণবী বিদ্যায় তিনি অসুরদের লক্ষ্মী আকর্ষণ করে ইন্দ্রকে দান করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপের নিকটে নারায়ণ কবচ লাভ করে যুদ্ধে অসুরদের পরাজিত করলেন।

শোনা যায় যে বিশ্বরূপের তিনটি মাথা ছিল। তার একটি দিয়ে তিনি সোমরস পান করতেন, একটি দিয়ে সুরাপান করতেন এবং তৃতীয়টি দিয়ে অন্ন ভক্ষণ করতেন। দেবতারা ছিলেন বিশ্বরূপের পিতৃকুল, পুরোহিত হয়ে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁদের যজ্ঞ ভাগ দিতেন। কিন্তু অসুররা তাঁর মাতৃকুল বলে স্নেহ বশত তিনি অসুরদেরও গোপনে যজ্ঞভাগ দিতেন। কোন বিশেষ উপায়ে তিনি তা তাঁদের কাছে পাঠাতেন। তাই দেখে ইন্দ্র বিশ্বরূপের তিনটি মাথাই ছেদন করেন। তাঁর সোমপানকারী মাথা কপিঞ্জল পাখি, সুরাপানকারী মাথা চটক পাখি ও অন্ন ভক্ষণকারী মাথা তিতির পাখি হয়েছিল। এই ব্রহ্ম হত্যার পাপ ইন্দ্র নিজের অঞ্জলিতে গ্রহণ করেছিলেন এবং সংবৎসর-কাল পরে লোকাপবাদ পরিহারের জন্য তিনি ঐ পাপ চার ভাগ করে ভূমি জল বৃক্ষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এক এক ভাগ দিয়েছিলেন।

দেবী ভাগবতে এই কাহিনী কিছু অন্য রকম। ত্বষ্টার পুত্র তিন মুখে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতেন। এক মুখে বেদাধ্যয়ন, দ্বিতীয় মুখে সুরাপান ও তৃতীয় মুখে চারি দিকে দৃষ্টি দিতেন। এর অর্থ খুবই পরিষ্কার। একই সঙ্গে তিনি বেদাধ্যয়ন ও সুরাপান করতেন, দৃষ্টিও দিতেন চারি দিকে। তারপরই সমস্ত ভোগ সুখ বিসর্জন দিয়ে ধর্মাশ্রয়ী তপস্বী ত্রিশিরা তপস্যা করতে লাগলেন। গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি সাধন এবং হেমন্ত ও শীতে জলে অবস্থান করতেন। ইন্দ্র এই তপস্যা

দেখে ক্ষুব্ধ ও বিষাদগ্রস্ত হলেন। ত্রিশিরার শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে দেখে ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব হারানোর ভয় পেয়ে তাঁর তপোভঙ্গের জন্য উর্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচী তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরাদের পাঠালেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে সেই তপস্বীকে প্রলুব্ধ করবার জন্য নৃত্য গীত ও কাম শাস্ত্রোচিত বিবিধ ভাব ভঙ্গি প্রদর্শন করেও ব্যর্থ হল এবং ফিরে এসে ইন্দ্রকে বলল, আমরা যে অভিশপ্ত হই নি এই আমাদের ভাগ্য। ইন্দ্র এদের বিদায় দিয়ে অন্যায় ভাবে পাপ আশ্রয় করে সেই তপস্বীকে বধের উপায় ভাবতে লাগলেন। তিনি ত্রিশিরার নিকটে এসে তাঁকে সূর্য ও অগ্নির মতো তেজস্বী দেখে বিপন্ন বোধ করলেন। এই শত্রুকে আমি কেন উপেক্ষা করছি, এই ভেবে ইন্দ্র তাঁর দিকে বজ্র নিক্ষেপ করলেন। বজ্রাহত তপস্বী বিগতপ্রাণ হলেন, সুখী হলেন দেবরাজ ইন্দ্র। কিন্তু নিকটস্থ মুনিরা আর্তনাদ করতে লাগলেন, পাপাত্মা ইন্দ্র এ কী করলেন! বিনা অপরাধে এঁকে হত্যার জন্য পাপমতি দুরাত্মা শচীপতি এর ফল ভোগ করুন।

বৃত্র

নিজের ভাই ইন্দ্র তাঁর পুত্রকে বধ করেছেন জেনে ত্বষ্টা মনে মনে বললেন, তোমাকে বধের জন্য আমি আর এক পুত্রের জন্ম দেব। এই বলে ক্রুদ্ধ ত্বষ্টা পুত্র উৎপাদনের জন্য অথর্ব বেদোক্ত মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিলেন। আট রাত্রি হোমের পর অগ্নি থেকে এক তেজস্বী পুরুষ আবির্ভূত হলেন। পুত্রকে দেখে ত্বষ্টা বললেন, আমার তপস্যার প্রভাবে তুমি বর্ধিত হও। সেই পুরুষ বর্ধিত হয়ে পিতাকে বললেন, কী করব বলুন। আমি আপনার শোক দূর করব। ত্বষ্টা বললেন, তুমি দুঃখ থেকে রক্ষা করতে সমর্থ, এই জন্য তুমি বৃত্র নামে খ্যাত হবে। বিনা অপরাধে ইন্দ্র তোমার ভ্রাতা ত্রিশিরাকে বজ্রাঘাতে বধ করেছে। তুমি সেই ব্রহ্ম হত্যাকারী শঠ ইন্দ্রকে বধ কর। বলে তাঁকে নানা অস্ত্র প্রস্তুত করে দিলেন। দ্রুতগামী রথও দিলেন।

সোজা কথায় ত্বষ্টার দুটি পুত্র ছিল। বিশ্বরূপ যখন নিহত হন, তখন বৃত্র নাবালক। তিনি বয়োপ্রাপ্ত হলে ত্বষ্টা তাঁকে ভ্রাতা হত্যার প্রতিশোধ নিতে বললেন। বৃত্র দেবতাদের বংশে জন্মেও ইন্দ্র বিরোধী হলেন। তাঁর মাতৃকুল অর্থাৎ দৈত্য ও দানবরা হলেন তাঁর সহায়। পূর্বে দেবতারা যাঁদের পরাজিত করেছিলেন, তাঁরা বৃত্রের সেবার জন্য সমাগত হলেন। দূতরা এসে ইন্দ্রকে সংবাদ দিল, বৃত্র রাক্ষসদের নিয়ে আসছেন। দেবতারা বললেন, আমাদের গৃহে নানান দুর্নিমিত্ত দেখা যাচ্ছে। রাতে রাক্ষসীরা কাঁদছে ও ভয় দেখাচ্ছে। শৃগাল এসে গৃহেব প্রাঙ্গণে ডাকছে। এই সব কথা শুনে ইন্দ্র চিন্তান্বিত হয়ে বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বিপদ নিবারণে দক্ষ, শত্রু বিনাশের ব্যবস্থা করুন। বৃহস্পতি বললেন, ব্রহ্ম হত্যার পাপেব ফল তোমাকে পেতে হবে। বৃত্র দেবতাদের অবধ্য হয়ে জন্মেছে। এই কথা শুনেই দেবতা যক্ষ কিন্নবরা গৃহ ত্যাগ করে পলায়ন করলেন। ইন্দ্র বসু রুদ্র অশ্বিনীকুমার সূর্য পুষা ভগ বায়ু কুবের বরুণ যম প্রভৃতি দেবতাদের বিমানে আরোহণ করে আসবার জন্য খবর দিলেন। নিজে বৃহস্পতিকে নিয়ে গজে আরোহণ করে বেরিয়ে পড়লেন। এই সময়ে দেবতারাও নিজ নিজ বাহনে আরোহণ করে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করলেন।

বৃত্র দানবদের সঙ্গে মানস সরোবরের উত্তরে অবস্থিত পর্বতে দেবতাদের বাসস্থানে এসে উপস্থিত হলেন। ইন্দ্র এইখানেই বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। প্রথমে বরুণ রণে ভঙ্গ দিলেন, পরে বায়ু যম অগ্নি ও ইন্দ্র সকলেই যুদ্ধ ক্ষেত্র-থেকে পলায়ন করলেন। বৃত্র ফিরে এসে ত্বষ্টাকে প্রণাম করে বললেন, দেবতারা পরাজিত হয়েছেন। ইন্দ্র পদব্রজে পালিয়েছেন, আমি তাঁর ঐরাবত এনেছি। ভীতদের হত্যা করা উচিত নয় বলে আমি কাউকে বধ করি নি। ত্বষ্টা বললেন, আমি প্রকৃত পুত্র লাভ করেছি, আমার জীবন সার্থক। এই বারে তুমি তপস্যা কর। তপস্যায় লক্ষ্মী লাভ হয়, বল বৃদ্ধি হয়, যুদ্ধ জয়ও

করা যায়। ব্রহ্মার আরাধনা করে তাঁর বর পেয়ে ব্রহ্মহত্যাকারী দুরাচার শত্রুকে বধ কর।

পিতার কথায় বৃত্র তপস্যা করতে গেলেন। গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে অন্নজল ত্যাগ করে তিনি ব্রহ্মাকে ধ্যান করতে লাগলেন। ইন্দ্র তাঁর তপস্যার সংবাদে চিন্তিত হয়ে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদিকে পাঠিয়ে বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃত্র তাতে বিচলিত হলেন না। শত বর্ষ পরে ব্রহ্মা এসে বললেন, তুমি ধ্যান ত্যাগ করে বাঞ্ছিত বর নাও। বৃত্র যোগ সাধনা ত্যাগ করে বিধাতাকে প্রণাম করে বললেন, লৌহ কাষ্ঠ, শুষ্ক বা আর্দ্র, বাঁশ বা অপর কোন অস্ত্রে যেন আমার মৃত্যু না হয়। আমি যেন অজেয় হই। 'তাই হবে' বলে ব্রহ্মা ফিরে গেলেন। বৃত্রও নিজের গৃহে ফিরে এলেন। ত্বষ্টা পুত্রের বর লাভের কথা জেনে বললেন, এইবারে আমার শত্রু ইন্দ্রকে বধ করে তুমি দেবতাদের অধীশ্বর হও। বৃত্র এই কথা শুনেই রথে আরোহণ করে যাত্রা করলেন।

বৃত্র আসছেন শুনে ইন্দ্র গৃধ্র ব্যূহ রচনা করে অবস্থান করতে লাগলেন। বৃত্র সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দেবতা ও দৈত্যদের মধ্যে লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলে ক্রোধান্ধ বৃত্র সহসা ইন্দ্রকে ধরে ফেললেন এবং তাঁকে মুখের মধ্যে রাখলেন। ইন্দ্রকে সেই অবস্থায় দেখে সমস্ত স্বর্গবাসী তাঁর মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা এক জৃম্ভিকার সৃষ্টি করলে সেই হাই তোলবার জন্য বৃত্র মুখব্যাদান করতেই ইন্দ্র ভূমিতে পড়লেন। এই ভাবে অযুত বর্ষ যুদ্ধ চলল। বৃত্র যুদ্ধে বৃদ্ধিলাভ করলেই ইন্দ্র পরাজিত হলেন। এক সময় পরাজিত দেবতারা যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলেন এবং বৃত্র দেবতাদের গৃহ অধিকার করলেন। ইন্দ্রের ঐরাবত উচ্চৈশ্রবা কামধেনু পারিজাত অপ্সরা বিমান ও রত্নরাজিও অধিকার করলেন। দেবতারা বাস করতে লাগলেন গিরি দুর্গে এবং যজ্ঞের ভাগ থেকে বঞ্চিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখে কাল যাপন করতে লাগলেন। তারপর ইন্দ্রের

সঙ্গে দেবতারা কৈলাস পর্বতে এসে মহাদেবকে প্রণাম করে বললেন, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। শিব বললেন, চল, বিষ্ণুর নিকটে গিয়ে আমরা বৃত্র বধের উপায় চিন্তা করি। এর পর সকলে মিলে বিষ্ণুর নিকটে গেলেন। বিষ্ণু বললেন, ব্রহ্মার বরে বৃত্র দুর্জয়। ত্বষ্টা তাকে সকল জীবের অজেয় করে সৃষ্টি করেছেন। এই শত্রুকে সাম ও প্রতারণা ব্যতীত জয় করা দুঃসাধ্য। তাকে প্রলুব্ধ করে বশে এনে বধ করতে হবে। তোমরা ঋষিদের সঙ্গে গিয়ে সাম দিয়ে তাকে জয় কর। শপথ করে তার বিশ্বাস সৃষ্টি করে বন্ধুতা কর। তার পর তাকে বিনাশ করতে হবে। আমি অদৃশ্য ভাবে ইন্দ্রের বজ্রে প্রবেশ করব। শত্রুর বিশ্বাস অর্জন করেই তাকে বধ করতে হবে। তোমরা দুর্গার নিকটে গিয়ে তাঁর আশ্রয় নাও।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই কাহিনী কিছু ভিন্ন রকমের। তাতে মহাদেব বা দুর্গার উল্লেখ নেই। দেবতারা বিষ্ণুর কাছে এলে তিনি বললেন, তোমরা সত্বর ঋষিশ্রেষ্ঠ দধীচির নিকটে গিয়ে বিদ্যা ব্রত ও তপো বলে দৃঢ় তাঁর দেহটি চাও। অথর্ব ঋষির পুত্র দধীচি অশ্বিনীকুমারদের ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ দিয়েছিলেন, ত্বষ্টাকে দিয়েছিলেন অভেদ্য নারায়ণ কবচ। বিশ্বরূপের নিকটে এই কবচ তুমি পেয়েছ। তোমাদের জন্য অশ্বিনী-কুমাররা তাঁর দেহ চাইলে শিষ্য বৎসল ঋষি তা অবশ্যই দান করবেন। দধীচির অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র তৈরি করে দিলে সেই অস্ত্রে তুমি বৃত্রের শিরশ্ছেদ করতে পারবে।

এর থেকেই জানা যায় যে বজ্র নামে ইন্দ্রের অস্ত্রটি বৃত্র বধের জন্য নির্মিত হয়েছিল এবং এর পূর্বে এই অস্ত্র বিশ্বরূপকে হত্যার জন্য ব্যবহৃত হয় নি। বজ্রের মতো মারাত্মক অস্ত্র ইন্দ্রের ছিল না বলেই তিনি ভীরু ছিলেন এবং অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে বার বার পরাজিত হয়েছেন। স্কন্দ পুরাণের নাগর খণ্ডে এই বজ্রের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। বৃত্র বধে অসমর্থ হয়ে ইন্দ্র বিষ্ণুর নিকটে গিয়েছিলেন পরামর্শের জন্য। তাঁকে হতাশ দেখে বিষ্ণু বললেন, বৃত্র মহাদেবের

বরে কোন অস্ত্রে বধ্য নয়, তাই অস্থি নির্মিত বজ্রে তাকে বিনাশ করতে হবে। ইন্দ্র বললেন, কোন্ জীবের অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি হবে? গজ শরভ বা অন্য কোন্ জন্তুর অস্থির দরকার, তা আমাকে বলুন। বিষ্ণু বললেন, এই অস্থি শত হস্ত প্রমাণ হবে, মধ্যে ক্ষীণ, দু পাশে স্থূল, ছয় কোণ ও ভীষণাকৃতি হওয়া চাই। ইন্দ্র বললেন, ত্রিলোকে এ রকম প্রাণী তো দেখা যায় না, যার অস্থিতে বজ্র তৈরি হতে পারে! বিষ্ণু বললেন, সরস্বতী নদীর তীরে দধীচি নামে এক তপস্বী বিপ্র আছেন. তিনি এর দ্বিগুণ দীর্ঘ। ইন্দ্র অনুসন্ধান করে দধীচিকে পেলেন এবং তাঁর নিকটে অস্থি প্রার্থনা করলেন। বললেন, বৃত্রকে বধ করতে হলে শত হস্ত প্রমাণ কোন জীবের অস্থিতে বজ্র নির্মাণ করতে হবে। আপনি ছাড়া এ রকম জীব আর নেই। বজ্রের কথা ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। যে জীবের অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি হয়েছিল, তার করোটি দেখতে অশ্বের মস্তকের অস্থির মতো ছিল। পর্বতে লুকনো অশ্বমস্তক পেতে ইচ্ছুক ইন্দ্র তা শর্বনাবৎ বা সরোবরে পেয়েছিলেন। বজ্র প্রকাণ্ড, শত পর্ব, চার পল যুক্ত। ঋগ্বেদ॥ ১।৮৪।১৪॥, ৪।২২।২॥, ৫।৩২।২॥, ৮।৬।৬॥ ও ৮।৮৯।৩॥ সহজেই অনুমান করা যায় যে এ কোন প্রাগৈতিহাসিক জীবের কঙ্কাল, তার মুখ ঘোড়ার মুখের মতো। এই জন্যই দধীচি মুনির অশ্ব মস্তকের কাহিনী রচিত হয়েছে।

এই বজ্র সম্বন্ধে স্কন্দ পুরাণে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ইন্দ্র ভয়ে ভয়ে কম্পিত দেহে দূর থেকে বৃত্রকে বজ্রাঘাত করেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। বজ্রাঘাতে বৃত্র নিহত হয়েছেন কিনা, সে সংবাদ তিনি অন্য দেবতাদের কাছে পেয়েছিলেন। পুরাণের বর্ণনায় জানা যায় যে বজ্র নক্ষেপ করলে তা থেকে আগুন ও শব্দ নির্গত হত। এর থেকেই মনে হয় যে বজ্র বন্দুকের মতো একটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। কোন প্রাগৈতিহাসিক জীবের অস্থি বন্দুকের নলের মতো ব্যবহৃত হত, পাথর বা ধাতুর খণ্ড তার মধ্যে পুরে বারুদের সাহায্যে নিক্ষেপ করা হত। ভদ্রাশ্ব বর্ষ অর্থাৎ বর্তমান চীন দেশে পাওয়া যেত বারুদ।

ত্বষ্টা বারুদের ব্যবহার জানতেন বলেই এই বজ্র তৈরি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই ত্বষ্টা বৃত্রের পিতা নিশ্চয়ই নন। পুরাণে একাধিক ব্যক্তির নাম ত্বষ্টা। যে ত্বষ্টা বিশ্বকর্মা নামে পরিচিত ছিলেন, সেই শিল্পী ত্বষ্টাই বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। এঁরই কন্যা সংজ্ঞার বিবাহ হয়েছিল বিবস্বানের সঙ্গে। তিনি আদিত্যদের পক্ষে ছিলেন। তাই এই কাজ করেছিলেন। বৃত্রের পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রেব ভাই ছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র বিশ্বরূপকে হত্যা করেছিলেন বলেই ইন্দ্র বিরোধী হয়ে বৃত্রকে ইন্দ্রবধে প্ররোচিত করেছিলেন। বৃত্রের মা রমা বা রচনা ছিলেন হিরণ্যকশিপুর কন্যা। এই জন্যই বৃত্রকে দেবতা না বলে পুরাণে অসুর বলা হয়েছে। আসলে বৃত্রও দেবতা, ইন্দ্রের শত্রু বলেই তিনি অসুর নামে অভিহিত।

বৃত্র বধের কথা দেবী ভাগবতে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষ্ণুর উপদেশ পেয়ে দেবতা ঋষি ও তপস্বীরা মন্ত্রণা করে বৃত্রের আশ্রমে গিয়ে তেজে প্রজ্বলিত বৃত্রকে দেখতে পেলেন। ঋষিরা তাঁর নিকটে গিয়ে বললেন, আপনি ব্রহ্মাণ্ড অধিকার করেছেন, কিন্তু ইন্দ্রের সঙ্গে আপনার শত্রুতা সুখ নাশ করছে। এই ব্যাপারটা আপনাদের উভয়েরই দুঃখদায়ক ও দুশ্চিন্তার কারণ। আপনাদের যুদ্ধের জন্য প্রজারাও নিপীড়িত হচ্ছেন। সংসারে সুখ গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় হল দুঃখ। পণ্ডিতরা যুদ্ধের প্রশংসা করেন না। বিশ্ব দৈবাধীন বলে জয় পরাজয়ও দৈবাধীন। তাই যুদ্ধ করার কোন যুক্তি নেই। তার পরিবর্তে সময় মতো স্নান আহার শয্যায় শয়ন ও পত্নীর সেবা গ্রহণই সুখ লাভের উপায়। ইন্দ্রের সঙ্গে আপনার মিত্রতা হলে আপনারা উভয়েই সুখলাভ করবেন, আমরাও শান্তি পাব। আপনাদের সখ্যের জন্য আমরা মধ্যস্থ হচ্ছি। আপনাদের শপথ করিয়ে আমরা প্রিয়কর্মে যোজনা করব। ইন্দ্র এই শপথ করে আপনার চিত্ত বিনোদন করবেন। বৃত্র বললেন, আপনারা তপস্বী, আমার শ্রদ্ধার পাত্র। আপনারা মিথ্যাবাদী নন, ছলনার কৌশল আপনাদের জানা নেই। কিন্তু ইন্দ্র দুরাচার ব্রহ্মঘাতক, নির্লজ্জ লম্পট ও শঠ। এ রকম ব্যক্তিকে

কিছুতেই বিশ্বাস করা উচিত নয়। আপনারা দুষ্ট বুদ্ধি নন, কিন্তু শাস্ত স্বভাবের জন্য অনভিজ্ঞ। মুনিরা বললেন, জীব মাত্রই শুভ ও অশুভ কর্মের ফল ভোগ করে। বিশ্বাসঘাতক নিশ্চিত ভাবে দুঃখ ভোগ করে এবং নরকে যায়। আপনার যেমন ইচ্ছা তেমনই শপথ বাক্য বলুন। সেই ভাবেই উভয়ের মধ্যে সন্ধি হবে। বৃত্র বললেন, শুষ্ক আর্দ্র প্রস্তর কাষ্ঠ বজ্র দিয়ে দিবা বা রাত্রিকালে আমাকে বধ করা চলবে না। এই শর্তেই ইন্দ্রের সঙ্গে আমার সন্ধি হতে পারে, অন্যথায় নয়। 'তাই হবে' বলে মুনিরা ইন্দ্রকে এনে শপথ বাক্য শোনালেন। ইন্দ্র অগ্নি সাক্ষী করে মুনিদের সামনে সন্ধি করে নিশ্চিন্ত হলেন। বৃত্রও ইন্দ্রের কথা বিশ্বাস করলেন এবং তাঁর সহচর সুলভ মনোভাব দেখে বন্ধুর মতো হলেন। কিন্তু ছিদ্রান্বেষী ইন্দ্র জিঘাংসু থেকেই বৃত্রের বধের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন।

এই ভাবেই কয়েক বৎসর কেটে গেল। এক দিন ত্বষ্টা পুত্রকে বললেন, আমার একটা হিতকর কথা শোন। ইন্দ্র সর্বদাই ঈর্ষাপরায়ণ, যার সঙ্গে একবার শত্রুতা করা হয়েছে তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই ইন্দ্র পাপবুদ্ধি প্রতারক পরদারলম্পট মদগর্বিত মায়াবী ছিদ্রান্বেষী দ্রোহপর দ্বেষরত লোভোন্মত্ত ও পরদুঃখোৎসবান্বিত। পুনঃ পুনঃ পাপকর্ম করেছে বলে তার কোন লজ্জা নেই। তাই তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু মৃত্যু আসন্ন বলে পুত্র পিতার কথা বুঝলেন না।

তারপর ইন্দ্র এক দিন সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের তীরে সেই পরাক্রান্ত অসুরকে দেখতে পেলেন। বৃত্রের বরের কথা চিন্তা করে তিনি ভাবলেন, এখন রাত্রি নয় দিনও নয়, এই নির্জন স্থানে সে এখন একাকী। তাকে বধ করবার এই উপযুক্ত সময়। এই ভেবেই তিনি বিষ্ণুকে স্মরণ করলেন। স্মরণ মাত্রেই বিষ্ণু এসে বজ্রের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সমুদ্রে পর্বতের মতো ফেণরাশি দেখতে পেয়ে ভাবলেন, এ শুষ্ক নয় আর্দ্রও নয়, এ কোন অস্ত্রও নয়। ইন্দ্র খেলার ছলে এই ফেণ গ্রহণ করলেন। তারপর পরমাশক্তিকে স্মরণ করতেই দেবী

ফেণে নিজের শক্তি দিলেন এবং বিষ্ণু-যুক্ত বজ্র সেই ফেণাবৃত করলেন। তারপর ইন্দ্র যখন সেই বজ্র বৃত্রের প্রতি নিক্ষেপ করলেন, তখন সহসা বজ্রাহত হয়ে তিনি পতিত হলেন। বৃত্র নিহত হয়েছেন দেখে হৃষ্ট হলেন ইন্দ্র।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই বৃত্র বধের বিবরণ অন্য রকম। নর্মদা নদীর তীরে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বেধেছিল। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র বৃত্রকে বজ্রাঘাতে বধ করেন। বৃত্র বধের পর ব্রহ্ম হত্যার পাপ ইন্দ্রকে আশ্রয় করল। তিনি দেখলেন যে চণ্ডালীর মতো সেই ব্রহ্ম হত্যা ক্ষয়রোগগ্রস্ত দেহে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছে। পরিধানে রক্ত-বস্ত্র, বিক্ষিপ্ত কেশ ও জরায় তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপছে। ইন্দ্র ভয়ে দশ দিকে ছুটোছুটি করে শেষে মানস সরোবরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি একটি মৃণালের সূত্রে অলক্ষ্যে থেকে মুক্তির উপায় ভেবেই হাজার বছর কাটিয়ে দিলেন। অগ্নি তাঁর যজ্ঞ ভাগ নিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে পারতেন না।

এ কথা সত্য নয়। ইন্দ্র ধর্ম যুদ্ধে বৃত্রকে বধ করে থাকলে বৃত্রের বর লাভের কাহিনী রচিত হত না। যুদ্ধে তিনি অজেয় ছিলেন। তাই সন্ধ্যা বেলায় সমুদ্রের ফেণায় বজ্রকে আবৃত করে বৃত্রকে বধ করতে হত না। বজ্রের মধ্যে বিষ্ণুকেও প্রবেশ করতে হত না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ইন্দ্র বিষ্ণুর সঙ্গে লুকিয়ে নিঃসঙ্গ বৃত্রকে সমুদ্রের ধারে একাকী বিচরণ করতে দেখে দূর থেকে বজ্র নিক্ষেপ করেছিলেন। নূতন অস্ত্র বজ্রের প্রথম ব্যবহার। বৃত্র এই অস্ত্র দেখতে পেলেও যেন সমুদ্রের ফেণ ভাবেন ও কোনরূপ সন্দেহ না করেন, তার জন্যই সমুদ্রের ফেণে এই অদ্ভুত অস্ত্রটি আবৃত করা হয়েছিল। দেবী ভাগবতের কাহিনীই সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়।

দেবী ভাগবতে আছে, বৃত্রের হত্যায় শঙ্কিত হয়ে বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে গেলেন। ভীতিগ্রস্ত হয়ে ইন্দ্রও গেলেন স্বর্গে। মুনিরাও ভয় পেয়ে

ভাবলেন, বৃত্রকে বঞ্চনা করে পাপ করা হয়েছে, ইন্দ্রের সাহচর্যে এসে আমাদের মুনি নাম নিরর্থক হল। বৃত্র আমাদের কথা বিশ্বাস করেছিলেন। বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গলাভ করে আমরাও বিশ্বাসঘাতক হলাম। পাপীর মন্ত্রণাদাতাও পাপী। আমরা পাপ করেছি, বিষ্ণুও পাপ করেছেন। এর থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে যে জগতে সবই অর্থ ও কাম, দুর্লভ শুধু ধর্ম ও মোক্ষ। এই ভাবে অনুতাপ করে তাঁরা নিজেদের আশ্রমে ফিরে গেলেন। কপট উপায়ে ইন্দ্র তাঁর পুত্রকে বধ করেছেন জেনে ত্বষ্টা দুঃখে কাতর হয়ে কাঁদলেন। তারপর যেখানে বৃত্রের মৃত্যু হয়েছিল সেখানে গিয়ে তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করবার পর শাপ দিলেন, যে ভাবে প্রলুব্ধ করে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেছে, বিধাতা যেন তাকেও সেই রকম দুঃখ দেন। এই বলে তিনি মেরু শিখরে গিয়ে দুষ্কর তপস্যায় ব্রতী হলেন।

এদিকে একে একে সমস্ত দেবতাই ইন্দ্রকে ব্রহ্মঘাতী বললেন। ইন্দ্র শপথ করে বন্ধু হয়ে বৃত্রকে হত্যা করেছেন, এই কথা দেবতা ও গন্ধর্বদের সমাবেশে প্রচারিত হল। মুনিরাও বৃত্রকে প্রতারণা করেছেন। ইন্দ্র নিজের কানেও এই সব কথা শুনলেন। পথে তাঁকে যেতে দেখলে সবাই ব্যঙ্গের হাসি হাসল। ইন্দ্র ও বিষ্ণু ছাড়া এমন বিপরীত আচরণ আর কে করবেন! ইন্দ্রকে ভীতিগ্রস্ত ও বিমনা দেখে শচী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে এমন ভীত ও দুঃখিত দেখছি কেন? ইন্দ্র বললেন, আমার মনে সুখ ও শান্তি নেই। আমি সারাক্ষণ ব্রহ্মহত্যার ভয় পাচ্ছি। আমার কাছে কিছুই আর সুখপ্রদ নয়। পত্নীকে এই কথা বলে ইন্দ্র মানস সরোবরে গেলেন এবং প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বাস করতে লাগলেন।

দেবী ভাগবতে দেখা যাচ্ছে যে ইন্দ্র ও বিষ্ণু দুজনেরই বিপরাত আচরণের জন্য নিন্দা করা হয়েছে। এই বিপরাত আচরণ কথাটির অর্থ স্পষ্ট। মুখে এক, কাজে অন্য। মুখে বৃত্রের সঙ্গে বন্ধুতা করে কাজে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এই কাজে পরামর্শদাতা বিষ্ণু

তিনিই সাহায্য করেছেন ইন্দ্রকে। ধর্মযুদ্ধে বৃত্রকে সংহার করতে পারবেন না বলে গুপ্ত ঘাতকের কাজ করেছেন।

নহুষ

এর পরবর্তী ঘটনাও আছে দেবী ভাগবতে। ইন্দ্র পলায়ন করেছেন দেখে দেবতারা চিন্তিত হলেন। ঋষি সিদ্ধ ও গন্ধর্ববাও অরাজকতা দেখে ভয় পেলেন। অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী সম্পদহীন হল। তাই দেখে স্বর্গবাসী দেবতা ও মুনিরা নহুষকে ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নহুষ চন্দ্রবংশের তৃতীয় রাজা, প্রথম রাজা পুরূরবার পৌত্র, আয়ুর পুত্র। চন্দ্রের পুত্র বুধ সূর্যবংশের রাজা বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম দিয়েছিলেন। অপ্সরা উর্বশীর সহবাসে আয়ুর জন্ম এবং আয়ু বিবাহ করেছিলেন এক দৈত্য কন্যাকে। নহুষ এঁদের পুত্র। স্বর্গে রাজত্ব করবার জন্য ইনিই নির্বাচিত হয়েছিলেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর বংশে কেউ যোগ্য বিবেচিত হন নি।

বুধের জন্ম নিয়ে পুরাণকার কিছু গোপন করার চেষ্টা করেন নি, কিন্তু পুরূরবার জন্ম মিথ্যা দিয়ে রহস্যে আবৃত করেছেন। আমরা জানি যে সোম দক্ষের সাতাশটি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষয় রোগ হয়েছিল বলে কোন সন্তান হয় নি। এও জানি যে তিনি গুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করেছিলেন। কিন্তু দেবী ভাগবতে আছে, এক দিন বৃহস্পতির সুন্দরী পত্নী তারা নিজেই তাঁব পতির যজমান চন্দ্রের গৃহে গিয়েছিলেন, দৈবক্রমে চন্দ্র তাঁকে দেখতে পান। দুজনেই দুজনকে দেখে কামাসক্ত হয়ে রমণে প্রবৃত্ত হন। কয়েক দিন কাটবার পর বৃহস্পতি তারাকে স্বগৃহে আনবার জন্য এক শিষ্যকে পাঠান। কিন্তু তারা চন্দ্রের এমন বশীভূত হয়েছিলেন যে সেই শিষ্যের সঙ্গে পতিগৃহে ফিরলেন না। চন্দ্রও বার বার গুরুর প্রেরিত শিষ্যকে ফিরিয়ে দিলে গুরু বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই সেখানে এলেন এবং চন্দ্রকে বললেন, আমার স্ত্রীকে তুমি কেন এত দিন নিজের গৃহে

আটকে রেখেছ? আমি তোমার গুরু, কী বলে তুমি গুরুপত্নীকে উপভোগ করছ? চন্দ্র বললেন, সেই বরবর্ণিনী কয়েক দিন এখানে আছেন, তাতে ক্ষতি কী! তিনি নিজের ইচ্ছাতেই আপনার গৃহে ফিরে যাবেন। বৃহস্পতি ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু তারার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা ভেবে বিরহে কাতর হয়ে কয়েক দিন পরেই আবার ফিরে এলেন। কিন্তু দ্বারপালরা তাকে নিবারণ করলে তিনি দ্বারদেশেই দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু চন্দ্র তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়েও অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলেন না দেখে বৃহস্পতি উচ্চস্বরে বললেন, আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে না দিলে আমি তোমাকে অভিসম্পাত দেব। গুরুর কথা শুনে চন্দ্র বেরিয়ে এসে হেসে বললেন, আপনি এ সব অপলাপ করছেন কেন! তারার মতো সুন্দরী আপনার মতো কদাকার লোকের স্ত্রী হবার উপযুক্ত নন। তিনি ভিক্ষুকের গৃহে থাকবেন কেন! আপনি ফিরে গিয়ে আপনার মতো কোন কুরূপা স্ত্রীকে গ্রহণ করুন। আর আপনি শাপের ভয় দেখাচ্ছেন কেন! আপনি নিজে কামার্ত, আপনার শাপে আমার কোন ক্ষতি হবে না। তারাকে আমি ফিরিয়ে দেব না। আপনার যা ইচ্ছে, আপনি তাই করতে পারেন।

চন্দ্রের এই কথা শুনে বৃহস্পতি ইন্দ্রের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন, চন্দ্র আমার স্ত্রী তারাকে অপহরণ করেছে এবং বার বার বলা সত্ত্বেও ফিরিয়ে দিচ্ছে না। তুমি আমাকে সাহায্য কর। ইন্দ্র বললেন, গুরুদেব, আপনি এ নিয়ে ভাববেন না। আমি চন্দ্রের কাছে দূত পাঠাচ্ছি। সে আপনার স্ত্রীকে প্রত্যর্পণ না করলে দেব-সৈন্য নিয়ে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করব। এই বলে তিনি একজন দূত চন্দ্রের নিকটে পাঠালেন। কিন্তু চন্দ্র দূতকে ফিরিয়ে দিলেন। ইন্দ্র চন্দ্রের অহঙ্কারে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য সৈন্যদের প্রস্তুত হতে বললেন অসুরদের গুরু শুক্র এই কথা জানতে পেরে বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষের জন্য চন্দ্রের নিকটে গিয়ে বললেন, তুমি তারাকে ফিরিয়ে দিও না। ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ হলে আমি মন্ত্রবলে তোমাকে সাহায্য করব। ওদিকে

শঙ্কর যখন শুনলেন যে শুক্র দেবগুরুর শত্রুতাচরণ করছেন, তখন তিনি বৃহস্পতির পক্ষে সাহায্য দিতে লাগলেন। পুরাকালে তারকাসুরের সঙ্গে যেমন যুদ্ধ হয়েছিল, তেমনি তারার জন্যও দেবাসুরের যুদ্ধ চলতে লাগল। তাই দেখে ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হলেন। প্রথমেই সবাইকে যুদ্ধে নিবারণ করে চন্দ্রকে বললেন, যদি নিজের মঙ্গল চাও তো গুরু-পত্নীকে ফিরিয়ে দাও। নচেৎ এই দণ্ডে বিষ্ণুকে এনে তোমাদের সকলকে বিনাশ করব। তারপর শুক্রকে বললেন, তুমি ভৃগুর পুত্র, সঙ্গ দোষেই কি তোমার এই অধর্মে মতি! পিতামহর এই কথায় লজ্জিত হয়ে শুক্র চন্দ্রকে বললেন, তোমার পিতা মহর্ষি অত্রি আদেশ পাঠিয়েছেন, এবারে গুরুপত্নীকে প্রত্যর্পণ কর। চন্দ্র এই কথায় গর্ভবতী তারাকে প্রত্যর্পণ করলেন। বৃহস্পতি স্ত্রীকে নিয়ে নিজের গৃহে ফিরলেন। দেবাসুরও ফিরে গেলেন নিজ নিজ গৃহে।

কিছুকাল পরে তারা এক পুত্র প্রসব করলেন। বৃহস্পতি তার জাতক্রিয়া সম্পন্ন কবলেন। চন্দ্র এই সংবাদ পেয়ে বৃহস্পতির নিকটে দূত পাঠিয়ে বললেন, এ পুত্র আমার। বৃহস্পতি বললেন, পুত্র যখন দেখতে আমার মতো, তখন এ পুত্র আমারই। পুত্রকে দিতে অসম্মত হয়ে দূতকে ফিরিয়ে দিলেন। দেবাসুব পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে এসে মন্ত্রণার জন্য সভা করলেন। খবর পেয়ে ব্রহ্মাও এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তারাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই পুত্র কার তা তুমিই বল। তারা লজ্জায় অধোমুখ হয়ে মৃদুস্বরে বললেন, চন্দ্রের। তারপরই অন্তর্হিত হলেন। চন্দ্র খুশী হয়ে পুত্রকে গ্রহণ করে নাম দিলেন বুধ। পুত্রকে নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন।

পুরূরবার জন্মের কথা বিষ্ণুপুরাণে আছে খুবই সংক্ষেপে। মনুর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নামে পুত্র ও ইলা নামে এক কন্যা জন্মে। মিত্রাবরুণের অনুগ্রহে ইলা সুদ্যুম্ন নামে পুত্রে পরিণত হলেন এবং ঈশ্বরের কোপে পুনরায় তিনি কন্যা হলেন। একদিন যখন তিনি চন্দ্রের পুত্র বুধের আশ্রমের নিকটে পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন বুধ তাঁর প্রতি অনুরক্ত

হলেন এবং পুরূরবা নামে তাঁদের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল। শিবের প্রসাদে ইলা আবার সুদ্যুম্নে পরিণত হলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই কাহিনী আছে সবিস্তারে। মনু যখন নিঃসন্তান ছিলেন, তখন বশিষ্ঠ তাঁর সন্তান লাভের জন্য মিত্র ও বরুণের যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞকালে মনুর পত্নী কন্যা সন্তানের প্রার্থনা জানালে তাঁর ইলা নামে এক কন্যা জন্মে। এতে মনু সন্তুষ্ট হলেন না দেখে বশিষ্ঠ ইলার পুরুষত্বের জন্য ভগবানের স্তব করলেন। তাতে হরি ইলাকে সুদ্যুম্ন নামে পুরুষে পরিণত করলেন। একবার সুদ্যুম্ন কয়েকজন অমাত্যকে নিয়ে মৃগয়ার জন্য সুমেরু পর্বতের সানুদেশে গেলেন। হর পার্বতী যেখানে বিহার রত ছিলেন, সেখানে প্রবেশ করতেই তাঁরা সকলে স্ত্রী রূপ পেলেন। কেন এমন হল, তার জন্য একটি কাহিনীও কল্পিত হয়েছে। সুদ্যুম্নকে স্ত্রী মূর্তিতে নিজের আশ্রমের নিকটে দেখে বুধ তাঁকে লাভ করতে ইচ্ছা করেন এবং ইনিও চন্দ্রের পুত্রকে পতি রূপে পেতে চান। তারপর বুধ তাঁর গর্ভে পুরূরবার জন্ম দেন। এর পর সুদ্যুম্ন কুলগুরু বশিষ্ঠকে স্মরণ করেন এবং বশিষ্ঠ কৃপাপরবশ হয়ে তাঁর পুরুষত্ব কামনা করে শিবের স্তুতি করেন। শিব বলেন যে তোমার গোত্রজাত সুদ্যুম্ন এক মাস পুরুষ ও এক মাস স্ত্রী হবে। বশিষ্ঠের অনুগ্রহে সুদ্যুম্ন পুরুষত্ব লাভ করে পৃথিবী পালন করেছিলেন। স্ত্রী ভাব পেলে তিনি লুকিয়ে থাকতেন। সুদ্যুম্নের তিন পুত্র উৎকল গয় ও বিমল দক্ষিণাপথের রাজা হয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি প্রতিষ্ঠানপুরের আধিপত্য পুত্র পুরূরবাকে দিয়ে বনগমন করেছিলেন।

এই রহস্যের একটি সূত্র অগ্নিপুরাণে পাওয়া যায়। এতে আছে, ইলা সুদ্যুম্নতাং গতা অর্থাৎ ইলা সুদ্যুম্নের সহিত সঙ্গত হয়েছিলেন। এর অর্থ ইলা সুদ্যুম্ন ও বুধ উভয়ের সহবাসে সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। মনে হয় যে বিবাহের পূর্বে বা পরেও হতে পারে, ইলা বুধের সংস্পর্শে এসে পুরূরবা নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। কুলগুরু বশিষ্ঠ এই কথা জানতে পেরে ইলাকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং পরবর্তী

জীবনে তিনি সুদ্যুম্নের সঙ্গেই সংসার করেন। সেখানে তাঁর তিন পুত্র হয় ও তারা দক্ষিণাপথের রাজা হয়। পরে পুরূরবাকেও প্রতিষ্ঠান-পুরের আধিপত্য দান করা হয়। পুরূরবা স্বর্গে গিয়ে উর্বশীর প্রেমে পড়েছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে সংসার করেন। নহুষ তাঁর পৌত্র। পুরূরবা দেবতাদের প্রিয় পাত্র ছিলেন বলেই বোধহয় তাঁর পৌত্র নহুষকে ইন্দ্রপদে বসানো হয়। ধার্মিক বলে নহুষের খ্যাতি ছিল। কিন্তু তিনি বিষয়াসক্ত হয়ে পড়েন এবং অপ্সরাদের মুখে শচীর গুণের কথা শুনে মনে মনে তাঁকে কামনা করেন। এই চেষ্টাতেই তাঁর পতন হয়।

নহুষের পতন ঘটানোর পিছনেও দেবতাদের ষড়যন্ত্র ছিল। নহুষ ঋষিদের বলেছিলেন, আপনারা আমাকে ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু ইন্দ্রাণী আমার নিকটে আসছেন না কেন? সেবার জন্য শচীকে আপনারা আমার নিকটে পাঠান। তাঁর এই কথা শুনে দেবতা ও ঋষিরা চিন্তিত হয়ে শচীকে বললেন, নহুষ আপনাকে পেতে চাইছেন। আমরা এখন তাঁর অধীন, কী করব বলুন। শচী বৃহস্পতিকে বললেন, আমি আপনার শরণাগত, নহুষের অত্যাচার থেকে আমাকে রক্ষা করুন। বৃহস্পতি বললেন, তোমার ভয় নেই, সনাতন ধর্ম ত্যাগ করতে আমি তোমাকে দেব না। এর পর বৃহস্পতি শচীকে আশ্রয় দিয়েছেন জেনে নহুষ ক্রুদ্ধ হয়ে দেবতাদের বললেন, আমি শুনেছি যে বৃহস্পতি ইন্দ্রাণীকে রক্ষা করছেন। আমি তাঁকে হত্যা করব। দেবতারা তাঁকে শান্ত করবার জন্য বললেন, আপনি রাগ করবেন না। পরস্ত্রীগমন ধর্মশাস্ত্রে নিন্দিত। আর পতিব্রতা শচী পতি জীবিত থাকতে কেমন করে আপনাকে বরণ করবেন! শচীর মতো সুদর্শনা এখানে অনেক আছে, সেই বারাঙ্গনারা থাকতে পরস্ত্রীর কামনা আপনি ত্যাগ করুন। নহুষ বললেন, ইন্দ্র যখন গৌতমের পত্নীকে উপভোগ করেন এবং চন্দ্র বৃহস্পতির পত্নীকে, তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? মানুষ অন্যকে উপদেশ দিতেই পটু হয়। এ কাজ ছেড়ে বিনয়ে হোক বা

সবলে হোক, শচীকে শীঘ্র আমার কাছে আনুন। তাতেই আপনাদের মঙ্গল হবে। দেবতারা সভয়ে বললেন, ইন্দ্রাণীকে শান্ত করে আমরা তাঁকে আনব। এই বলে তাঁরা বৃহস্পতির গৃহে গিয়ে বললেন, আমরা জানি যে ইন্দ্রাণীকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু নহুষকে যখন ইন্দ্রপদ দেওয়া হয়েছে, তখন ইন্দ্রাণীকেও তাঁর হাতে অর্পণ করতে হবে। তিনি তাঁকেই পতিত্বে বরণ করবেন। বৃহস্পতি বললেন, আমি শচীকে ত্যাগ করব না। দেবতারা বললেন, তা হলে নহুষ যাতে প্রসন্ন হন, সেই উপায় স্থির করতে হবে। গুরু বললেন, শচী রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে নিবিড় ভাবে প্রলুব্ধ করে বলবেন, আমার স্বামী জীবিত আছেন কিনা তা জেনে আপনাকে ভজনা করব। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে শপথ করে বলবেন, আমার স্বামীকে আনবার জন্য যত্ন করুন। আমিও তাঁর অন্বেষণে যাব।

এই স্থির করে তাঁরা ইন্দ্রাণীকে নিয়ে নহুষের নিকটে গেলেন। শচীকে দেখে নহুষ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, এখন আমি ইন্দ্র হয়েছি, তুমি আমাকে ভজনা কর। শচী কাঁপতে কাঁপতে সলজ্জ ভাবে বললেন, আমি আপনার কাছে একটি বর চাই। ইন্দ্র জীবিত আছেন বা কোথায় আছেন তা আমার জানা নেই। এ কথা না জানা পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন। আমি সত্য বলছি, এ কথা জানবার পর আমি আপনার সেবা করব। নহুষ হৃষ্ট চিত্তে রাজী হয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন। ফিরে গিয়ে ইন্দ্রাণী দেবতাদের বললেন, আপনারা ইন্দ্রকে খুঁজে আনুন। মন্ত্রণার জন্য দেবতারা বিষ্ণুর নিকটে গিয়ে বললেন, আপনার পরামর্শেই ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা করে এখন কোথায় লুকিয়ে আছেন বলুন। আপনিই আমাদের গতি। এখন আপনিই তার মুক্তির পথ নির্দেশ করুন। বিষ্ণু বললেন, ইন্দ্রের পাপ মোচনের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন। এতে জগদম্বিকা সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মহত্যার পাপ বিনাশ করবেন। ইন্দ্রাণীও প্রত্যহ ভগবতীর পূজা করুন। এতেই ইন্দ্র তাঁর ইন্দ্রত্ব লাভ করবেন।

দেবতারা দিবারাত্রি পথ চলে ইন্দ্রের নিকটে গিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করালেন। ব্রহ্মহত্যাকে ভাগ করে বৃক্ষ নদী পর্বত ও পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে ইন্দ্র বিগতপাপ হলেন। শচী ইন্দ্রকে বললেন, দেবতা ও ঋষিরা নহুষ নামে একজন রাজর্ষিকে তোমার আসনে বসিয়েছেন। তাকে পতিত্বে বরণ করবার জন্য সেই পাপাত্মা আমাকে প্রত্যহ বলছে। আমি এখন কী করব বল। ইন্দ্র বললেন, আমি এখানে থেকে সময়ের অপেক্ষা করছি। তুমিও তোমার মন স্থির কর। শচী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মদোন্মত্ত নহুষ আমাকে বশীভূত করলে আমি কী করে থাকব ? দেবতা ও ঋষিরা ভয়ে কাতর হয়ে আমাকে বলছেন, নহুষকে সেবা কর। বৃহস্পতি সমুদ্রের মতো উদার হলেও শক্তিহীন এবং দেবতাদের অনুগামী। তিনি আমাকে রক্ষা করবেন কেমন করে! আমি অবলা নারী, অন্যের বশীভূত, কিন্তু কুলটা নই। এখন আমার এমন আশ্রয় নেই, যে আমাকে রক্ষা করতে সমর্থ। ইন্দ্র বললেন, তোমাকে উপায় বলছি। নারীকে তার চরিত্রই পাপ থেকে রক্ষা করে। আমি যা বলছি সেই ভাবে কাজ করলে তোমার চরিত্র রক্ষা হবে। নহুষ যখন তোমাকে সবলে আকর্ষণ করবে, তখন তুমি শপথ করে তাকে গোপনে বঞ্চনা করবে। তুমি তাকে একান্তে গিয়ে বল, ঋষি বাহিত যানে আমার কাছে এলে আমি আপনার বশীভূত হব। এই আমার ব্রত। কামান্ধ হয়ে নহুষ ঋষিদের যানে যোজনা করবে। ঋষিরা তাহলে রাজাকে শাপ দিয়ে দগ্ধ করবেন।

ইন্দ্রের কথায় শচী নহুষের নিকটে গেলেন। নহুষ তাঁকে বললেন, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রেখেছ বলে আমি প্রীত হয়েছি। তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। শচী বললেন, আপনি আমার একটি মনোরথ পূর্ণ করুন। নহুষ বললেন, বল। শচী বললেন, আপনি শপথ করুন। আপনাকে সত্যবদ্ধ জেনে আমি বলব। নহুষ বললেন, তোমার কথা রাখা আমার কর্তব্য। আমি সুকৃতি দিয়ে শপথ করছি। ইন্দ্রাণী বললেন, ইন্দ্রের বাহন হস্তী অশ্ব ও রথ। আমি চাই যে আপনার

এমন বাহন হোক যা দেবতা বা অসুর কারও নেই। মুনিরা যেন আপনার শিবিকা বহন করেন, এই আমার ইচ্ছা। নহুষ বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। মুনি বাহিত যানে আরোহণ করেই আমি তোমার নিকটে আসব।

তারপর ইন্দ্রাণীকে বিদায় দিয়ে মুনিদের ডেকে বললেন, ইন্দ্রাণী আমার প্রতি অনুরক্ত হয়ে বলেছেন, মুনি বাহিত যানে আরোহণ করে তাঁর নিকটে যেতে। আমি তাঁর প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট। আপনারা এই অভূতপূর্ব কাজ করুন। অগস্তি প্রমুখ ঋষিরা এই অশালীন কথা শুনেও ভবিষ্যতের কথা ভেবে রাজী হলেন। তিনি শিবিকায় আরোহণ করে ত্বরান্বিত হয়ে বাহক মুনিদের বললেন, সর্প সর্প, অর্থাৎ অগ্রসর হও। এই বলে সেই মূঢ় কামার্ত রাজা লোপা-মুদ্রার পতি তাপসশ্রেষ্ঠ অগস্তির মস্তক পা দিয়ে স্পর্শ করলেন। একবার নয়, তাঁকে বার বার বললেন, সর্প অর্থাৎ অগ্রসর হও। যিনি সমুদ্র শোষণ করেছিলেন, সেই ঋষি কশাঘাতের বেদনা স্মরণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, দুরাচার, তুমি সর্পে পরিণত হও। নহুষ সহসা সর্প রূপ ধারণ করে স্বর্গ থেকে পতিত হলেন।

বৃহস্পতি ত্বরায় মানস সরোবরে গিয়ে ইন্দ্রকে সব কথা বললেন এবং সসম্মানে শচীপতিকে স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। এই ভাবেই ইন্দ্র নিদারুণ দুঃখ ভোগ করেছিলেন।

এই কাহিনীতে কিছু কল্পনা ঢুকে পড়েছে। যেমন পদ্মের মৃণালের মধ্যে ইন্দ্রের আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এই লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন হয়েছিল কেন তা জানা দরকার। এ কথা নিশ্চিত যে ইন্দ্র বিষ্ণুর সহায়তায় নির্জন সমুদ্র তীরে নিঃসঙ্গ বৃত্রকে অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করেছিলেন। তার পরেই বুঝতে পেরেছিলেন যে দৈত্য দানবরা মিলিত হয়ে তাঁকে আক্রমণ করবে। বলি নাবালক ছিলেন এবং দেবতা ও ঋষিরাও ইন্দ্রের নিন্দা করছেন দেখে নহুষ এই সুযোগ গ্রহণ করেন। ইন্দ্র কারও সাহায্য পাবেন

না ভেবেই ভয়ে পালিয়ে গিয়ে মানস সরোবর অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। দেখা যাচ্ছে যে বৃহস্পতি ইন্দ্রাণী শচীকে সাহায্যের চেষ্টা করেছিলেন। একমাত্র বিষ্ণুই ইন্দ্রের সংবাদ রাখতেন বলে অনুমান করা যায়। নহুষকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্র এঁরাই করেছিলেন। শাপের কথা বাদ দিলে সত্য ঘটনা দাঁড়ায় যে ঋষিরা অপমানিত হয়েই নহুষকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। এই সংবাদ পাবার পরেই ইন্দ্র তাঁব স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে বেরিয়ে আসেন।

বলি

বলি তখন দৈত্যদের রাজা। ভারতবর্ষে তাঁরই অধীনে দৈত্যরা সংঘবদ্ধ হচ্ছে। দেশের অবস্থা ভাল নয়। অর্থাৎ মহাপ্লাবনে দেশের যে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করার কোন চেষ্টা হয় নি। দেবাসুরের দ্বন্দ্বেই সমস্ত উদ্যম ব্যয় হয়েছে। দেশ গঠনের কোন কাজ হয় নি। এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে পুরাণকার তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে একটা রূপক রচনা করলেন। সেটি হল দুর্বাসাব শাপে লক্ষ্মী ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করলেন।

বিষ্ণুপুবাণে এই গল্প আছে। একদা শঙ্করাংশ দুর্বাসা পৃথিবী ভ্রমণের সময় এক বিদ্যাধরীর হাতে একটি সন্তানক ফুলের সুগন্ধী মালা দেখতে পেলেন এবং মালাটি অতি শোভন দেখে তিনি সেটি চাইলেন। বিদ্যাধরা সেই মালাটি তাঁর হাতে দিল। বিপ্র সেটি মাথায় নিয়ে ভ্রমণের সময় ইন্দ্রকে দেখলেন ঐরাবতের উপরে। তিনি সেই মালাটি নিজের মাথা থেকে নিয়ে তাঁকে দিলেন নিক্ষেপ করে। ইন্দ্র ঐরাবতের মাথায় রাখলেন সেই মালা, আর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঐরাবত তার শুঁড় দিয়ে আঘ্রাণ করে মালাটি মাটিতে ফেলে দিল। মালার দুর্দশা দেখে ক্রোধাবিষ্ট দুর্বাসা দেবরাজকে বললেন, ঐশ্বর্যমত্ত দুরাত্মা বাসব, আমার দেওয়া মালা তুমি মাথায় ধারণ না করে এই অবমাননা করলে! তোমার ত্রৈলোক্যশ্রী বিনষ্ট হবে। তারপরেই ত্রিভুবন শ্রীহীন ও পরিত্যক্ত হল।

ক্ষীণ হল ওষধি ও লতা, যজ্ঞ বন্ধ হল, তাপসরা তপস্যা করেন না, দানধর্মে মনোযোগ রইল না মানুষের, আর লোভ বৃদ্ধি পেল। তারপর দৈত্যরা এলেন দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে দৈত্যদের নিকটে পরাজিত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে এলেন, তিনি দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর তীরে বিষ্ণুর নিকটে এলেন। বিষ্ণু বললেন, আমি তোমাদের পুষ্টিসাধন করব। এইবারে আমি যা বলি, তাই কর। তোমরা দৈত্যদের সঙ্গে ক্ষীর সমুদ্রে সমস্ত ওষধি ফেলে মন্দর পর্বতকে মন্থন দণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করে অমৃত মন্থন কর। দৈত্যদের সাহায্যের জন্য মিষ্ট ভাবে তাদের বল যে তারা সমান ফলভাগী হবে এবং সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠবে তা পান করে তোমরা ও আমরা বলবান হব। তারপরে আমি এমন ব্যবস্থা করব যে দেবদ্বেষীরা অমৃত না পেয়ে শুধু ক্লেশভাগী হবে।

বিষ্ণুর এই কথা শুনে দেবতারা অসুরদের সঙ্গে সন্ধি করে অমৃতের জন্য যত্নবান হলেন। দেবতা ও অসুরেরা নানা ওষধি এনে শরতের মেঘের মতো নির্মল ক্ষীর সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে অমৃত মন্থন আরম্ভ করলেন। মন্দরকে করলেন মন্থন দণ্ড ও রজ্জু হলেন বাসুকি। তাঁর পুচ্ছের দিকে দেবতাদের ও মুখের দিকে অসুরদের নিযুক্ত করলেন বিষ্ণু। সেই ফণীর নিঃশ্বাস বহ্নিতে অসুররা নষ্টকান্তি ও নিস্তেজ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর নিঃশ্বাস বায়ু থেকে উৎক্ষিপ্ত মেঘ পুচ্ছের দিকে বর্ষণ করার জন্য দেবতারা আপ্যায়িত হলেন। বিষ্ণু নিজে কূর্মরূপ ধারণ করে ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান মন্থনাদ্রির অধিষ্ঠান হলেন। এক রূপে দেবতাদের মধ্যে এবং অন্য রূপে দৈত্যদের মধ্যে থেকেও সর্পরাজকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। আবার অন্য এক বৃহৎ রূপে তিনি শৈলের উপরিভাগ আক্রমণ করে রইলেন। নিজের তেজে নাগরাজকে আপ্যায়িত ও দেবতাদের পুষ্ট করতে লাগলেন।

তারপর ক্ষীর সমুদ্র থেকে একে একে উৎপন্ন হল সুরভি, বারুণী, পারিজাত, অপ্সরা, হলাহল এবং অমৃতের কুম্ভ হাতে উঠলেন ধন্বন্তরি।

মনে হয় ইনিই আয়ুর্বেদের প্রবর্তক ধন্বন্তরি ও অমৃত তাঁরই আবিষ্কৃত কোন শক্তিদায়ক ঔষধ। হস্তী অশ্বও উঠেছিল। উঠেছিলেন লক্ষ্মী। বিষ্ণু লক্ষ্মীকে নিলেন এবং মোহিনী মূর্তি ধারণ করে তিনি দৈত্যাদের বঞ্চিত করে অমৃত দিলেন দেবতাদের। ইন্দ্রাদি দেবতারা সেই অমৃত পান করে দৈত্যদের আক্রমণ করলেন। দৈত্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে পাতালে প্রবেশ করলেন। দেবতারা পুনরায় স্বর্গরাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

বলা বাহুল্য যে কাহিনীটি সম্পূর্ণ কল্পিত। যা সত্য তা হল দেশের সম্পদ আবিষ্কারের জন্য দেবতা ও দৈত্যরা বিষ্ণুর পরামর্শে একটি বিশেষ অভিযান চালিয়েছিলেন ক্ষীর সমুদ্রের তীরে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই ক্ষীর সমুদ্রই বর্তমান কালের কাস্পিয়ান সাগর। বিষ্ণু এখানেই রাজত্ব করতেন এবং দেবতা ও দৈত্যদের নিয়ে এই সমুদ্র-তীরবর্তী ভূমিতে অন্বেষণ করে অনেক কিছু পেয়েছিলেন। তিনিই এই অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন বলেই নিজের ইচ্ছা মতো মন্থন লব্ধ সামগ্রী বণ্টন করেছিলেন।

এই সময় দৈত্যদের অধিপতি ছিলেন বলি। তিনি বয়োপ্রাপ্ত হলে ভৃগুবংশের ব্রাহ্মণেরা স্বর্গ জয়ের জন্য তাঁকে অভিষিক্ত করে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করলেন। তারপর বলি অসুর বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে ইন্দ্রপুরী অবরোধ করলেন। দেবতারা বৃহস্পতির নিকটে এলে তিনি বললেন, হরি ছাড়া আর কেউ তাকে জয় করতে সক্ষম নয়। কাজেই এখন তোমরা স্বর্গপুরী ত্যাগ করে কোথাও লুকোও। যত দিন শত্রুর বিপর্যয় দেখা না দেয়, তত দিন অপেক্ষা কর। বৃহস্পতির মন্ত্রণায় দেবতারা স্বর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন এবং বলি স্বর্গ থেকে ত্রিলোকের উপরে আধিপত্য বিস্তার করলেন। শিষ্য বৎসল ভৃগু বংশের ব্রাহ্মণরা তাঁকে দিয়ে একশো অশ্বমেধ যজ্ঞ করালেন এবং তারই প্রভাবে বলি ত্রিলোক বিখ্যাত কীর্তি বিস্তার করলেন।

অদিতির কনিষ্ঠ পুত্রের নাম উরুক্রম। আকারে তিনি ছিলেন

বামন। উপনয়নের পর তিনি ছত্র দণ্ড অজিন ও কমণ্ডলু নিয়ে বলির যজ্ঞ ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। বলি তাঁকে অভ্যর্থনা করে বললেন, আপনাকে প্রার্থী মনে হচ্ছে, আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাই আমার নিকট গ্রহণ করুন। বামন বললেন, আমি আপনার নিকটে ত্রিপাদ ভূমি চাই। বলি বললেন, আমার কাছে একবার এলে আর কাউকে যাচ্ঞা করতে হয় না। তাই আমার নিকটে জীবিকার উপযোগী ভূমি গ্রহণ করুন। বামন বললেন, আমি তিন পদ ভূমি চাই। বলি সহাস্যে বললেন, তবে তাই নিন। বলে ভূমি উৎসর্গের জন্য জলপাত্র গ্রহণ করলেন।

এই সময়ে শুক্র উরুক্রমের অভিপ্রায় জানতে পেরে শিষ্য বলিকে বললেন, এই ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ বিষ্ণু, দেবতাদের কার্য উদ্ধারের জন্য এসেছেন। ইনি কৌশলে তোমার সব কিছু হরণ করে ইন্দ্রকে দেবেন। বলি বললেন, আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন, কিন্তু দানের অঙ্গীকার করে এই ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করব কেমন করে! আমি ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করাকে যত ভয় পাই, নরক দারিদ্র্য বা মৃত্যুকে তত ভয় পাই না। এর পর গুরু শুক্র সত্যনিষ্ঠ উদারচিত্ত বলিকে অভিশাপ দিলেন, তুমি অজ্ঞ হয়েও নিজেকে পণ্ডিত মনে কর। আমাকে উপেক্ষা করে তুমি গর্বের পরিচয় দিলে। অচিরেই তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে। গুরুর শাপেও বিচলিত না হয়ে বলি জলস্পর্শ করে বামনকে পৃথিবী দান করলেন। উরুক্রম অদ্ভুত রূপে বৃদ্ধিলাভ করে এক পদে বলির অধিকৃত সমস্ত ভূভাগ ও দ্বিতীয় পদবিন্যাসে স্বর্গলোক অধিকার করলেন। তৃতীয় পদ বিন্যাসের জন্য আর কোন স্থান রইল না। এর পর তিনি পূর্বের বামন রূপ ধারণ করলে অসুররা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, এই কপট বেশধারী বিষ্ণুকে বধ করাই আমাদের উচিত। তারা অস্ত্র ধারণ করলে বলি তাদের নিবারণ করলেন। বললেন, কাল এখন আমাদের অনুকূল নয়, তোমরা কালের অপেক্ষা করে থাক। দৈত্যরা এর পর পাতালে প্রবেশ করলেন। তারপর গরুড় বরুণের পাশে

বলিকে বন্ধন করে তাকে নিগ্রহের উপক্রম করতেই স্বর্গ ও মর্ত্যের সকল দিকে হাহাকার উত্থিত হল। বামন বলিকে বললেন, আমি দুই পদেই সমস্ত অধিকার করেছি, এখন আমার তৃতীয় পদ রাখবার স্থান দিতে না পারলে নরকে যাও। বলি এ কথায় একটুও ক্ষুণ্ণ না হয়ে বললেন, আপনি তো কপটতা করে এই ভূমি নিচ্ছেন। কিন্তু আমি কপট নই। আপনি আপনার তৃতীয় পদ আমার মাথায় রাখুন।

এই সময়ে প্রহ্লাদ এসে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা বললেন, বলিকে আপনি বন্ধনমুক্ত করুন। ইনি নিগ্রহের যোগ্য নন। বামন বললেন, বলি ধর্মকে লঙ্ঘন করেন নি বলে আমি এঁকে দেবতাদেরও দুর্লভ স্থান দান করছি। সাবাণ মন্বন্তরে ইনি ইন্দ্র হবেন। তার আগে ইনি বিশ্বকর্মার নির্মিত সুতলে বাস করবেন। বন্ধন মুক্ত বলি হরি ব্রহ্মা ও শিবকে প্রণাম করে পাতালে প্রবেশ করলেন।

এই কাহিনী শ্রীমদ্‌ভাগবতের। দুই পায়ে স্বর্গ ও মর্ত্য অধিকার করা একটি কল্পনা। সত্যবদ্ধ বলিকে ছলনা করে জয় করা হয়েছিল। বামন হয়তো মুখেই বলেছিলেন, এই এক পায়ে আমি স্বর্গ অধিকার করলাম, আর এই দ্বিতীয় পায়ে মর্ত্য। বলি মেনে নিয়েছিলেন যে অঙ্গীকার করলে তা সত্য বলেই মেনে নেওয়া উচিত। তিনি ওই ছলনার প্রতিবাদ না করে নিজের সেনাদের যুদ্ধে বিরত করেছিলেন এবং স্বেচ্ছায় তাঁর পাতালে নির্বাসন গ্রহণ করেছিলেন।

বলির পর আর কোন দৈত্য দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি। বাণ তাঁর পুত্র। কিন্তু অনেক পরবর্তীকালের মানুষ হিসাবে যাঁকে আমরা পাই, তিনি হয়তো অন্য কোন বাণ। তিনি বলির পুত্র বাণ নন। তৃতীয় কিংবা চতুর্থ ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে নির্বিঘ্নে স্বর্গে অর্থাৎ ইলাবৃত বর্ষে রাজত্ব করতে হলে ভারতবর্ষে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিতে হবে। পাতালে অর্থাৎ বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে বাস করছেন দৈত্য দানবেরা। সূর্য ও চন্দ্র বংশের রাজারা সমগ্র উত্তর ভারতে রাজ্য

বিস্তার করেছেন। তাই এঁদের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ইন্দ্র তাঁর বজ্রের আঘাতে পাহাড়ের একটা অংশ ধ্বসিয়ে ভারতবর্ষের পথটি বন্ধ করে দিলেন। গিরিপথ নিশ্চয়ই সঙ্কীর্ণ ছিল, তাই সেই পথ তিনি সহজেই বন্ধ করে দিতে পেরেছিলেন। মৎস্য পুরাণে আছে, যখন থেকে হীনচেতা ইন্দ্র বজ্র দিয়ে স্বর্গের পথ রুদ্ধ করেন, তখন থেকেই লোকের স্বর্গমার্গ নিবারিত হয়েছে । ১৯১।১৩॥ এই পথেরই নাম হয়েছিল দেবযান পথ। এই পথ বন্ধ হয়ে যাবার পর ভারতবাসী স্বর্গে তীর্থ করতে যেত বদরী নারায়ণ ও মানস সরোবরের পথে। এই পথের নাম পিতৃযান। স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝখানে হিমালয় অঞ্চলের নাম ছিল পিতৃলোক বা অন্তরিক্ষ। কৈলাসের অধিপতি ছিলেন রুদ্র বা শিব। এটিও বিষ্ণু ও ইন্দ্রের মতো একটি সাধারণ নাম। দেবযান রুদ্ধ হয়ে পিতৃযান চালু হবার পর থেকেই ভারতের ধর্ম-জগতে শিবের প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে। যে শিবকে যজ্ঞের ভাগ না দেবার জন্য দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড হয়েছিল, কালক্রমে তিনি ভারতের প্রধান তিন দেবতার অন্যতম হতে পেরেছেন। এ সবই দিবি আরোহণের ফলে। মানুষ বিষ্ণু শিব ও ইন্দ্রের উপরে আমরা দেবত্ব আরোপ করেছি। চন্দ্র সূর্য বুধ বৃহস্পতি ও শুক্রকে দিয়েছি আকাশে স্থান। রক্তমাংসের মানুষকে দেবতায় পরিণত করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে রূপক রচনা ও অতিরঞ্জনের সাহায্যে গালগল্পে পরিণত করেছি। তা না হলে দেবতা ও অসুর আজকের এই আজগুবি আকার ধারণ করত না।

নবম পরিচ্ছেদ

নহুষ থেকে মান্ধাতার আমল

(৩৭৫৮ থেকে ৩৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)

আনর্ত, মনুর বংশ, নিমি ও জনক বংশ, চাতুর্বর্ণ প্রবর্তন, ধন্বন্তরি ও আয়ুর্বেদ, যযাতি ও যযাতির বংশ, ইক্ষ্বাকুব বংশ ও মান্ধাতা

এর পর বিষ্ণু পুরাণেব চতুর্থাংশ পড়লে দেবাসুরের যুদ্ধ ও তার পববর্তী কালের বাজাদের কথা জানা যাবে। মৈত্রেয় বললেন, এইবারে আমাকে বিভিন্ন বংশের বিবরণ বলুন। পরাশর বললেন, ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ধেকে দক্ষ প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁরই এক কন্যা অদিতির পুত্র সূর্য ও সূর্যের পুত্র মনু। মনুর পুত্রদের নাম ইক্ষ্বাকু নৃগ ধৃষ্ট শর্যাতি নরিষ্যন্ত প্রাংশু নাভাগ নেদিষ্ঠ করূষ ও পৃষধ্র। ইলা তাঁর কন্যা রূপে জন্মেছিলেন বলে পিতার রাজ্য ভাগ পেলেন না। বশিষ্ঠের কথায় তাঁর পিতা তাঁকে প্রতিষ্ঠান নামে এক নগর প্রদান করেন। তিনি ঐ নগর পুরূরবাকে দান করেন। ইলার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তিনি চন্দ্র বংশের জননী এবং চন্দ্রের পুত্র বুধ এই বংশের জনক। এঁদের পুত্র পুরূরবা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত পৈথান অঞ্চলের অধিপতি হয়েছিলেন।

আনর্ত

মনুর অপর এক পুত্র শর্যাতির সুকন্যা নামে এক কন্যা জন্মে। চ্যবন তাঁকে বিবাহ করেন। শর্যাতির পুত্রের নাম আনর্ত। আনর্তের পুত্র রেবত কুশস্থলী নামে পুরীতে বাস করতেন। রেবতের একশো পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ককুদ্মী। তাঁর কন্যা রেবতী। এই কন্যা

কার উপযুক্ত—এই কথা জানবার জন্য ককুদ্মী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে গিয়ে দেখলেন যে হাহা ও হূহূ নামে দুজন গন্ধর্ব তখন অতি তাল নামে দিব্য গন্ধর্ব গান ব্রহ্মাকে শোনাচ্ছেন। সেই গান শুনতে শুনতে যে অনেক যুগ গত হল তা তিনি বুঝতে পারলেন না, তাঁর মনে হল যে তিনি মুহূর্তকাল গান শুনেছেন। গান থামলে রৈবতক রাজ ককুদ্মী ব্রহ্মার নিকটে তাঁর কন্যার উপযুক্ত বরের বিষয়ে জানতে চাইলেন। ব্রহ্মা বললেন, তোমার কোন্ বর পছন্দ তাই বল। কয়েক জনের নাম বলতেই ব্রহ্মা হেসে বললেন, তুমি যাদের কথা বলছ, পৃথিবীতে এখন তাদের পুত্র পৌত্রাদির পুত্রও বর্তমান নেই। তুমি যখন গান শুনছিলে, তখন বহু যুগ অতীত হয়ে গেছে। পৃথিবীতে এখন কলি আসন্ন। এই কথা শুনে রাজা সভয়ে বললেন, তবে আমার কন্যা কাকে সম্প্রদান করব? ব্রহ্মা বললেন, যেখানে তোমার অমরাবতীর মতো রমণীয় কুশস্থলী পুরী ছিল, এখন সেখানে দ্বারকাপুরী এবং বিষ্ণুর অংশে বলরাম সেখানে আছেন। তাঁকে তোমার কন্যা দান কর। ব্রহ্মার আদেশে রাজা রৈবতক পৃথিবীতে এসে দেখলেন যে তাঁর কুশস্থলী এখন অন্য রকম হয়েছে এবং পুরুষেরা হ্রস্ব তেজ ও স্বল্প বিবেক। তিনি বলরামকেই তাঁর কন্যা দান করলেন। আর বলরাম রেবতীকে দীর্ঘাঙ্গী দেখে নিজের লাঙ্গলের অগ্রভাগ দিয়ে তাঁকে অন্যান্য বনিতার মতো খর্বাকার করলেন। রাজা রৈবতক কন্যা দানের পর তপস্যার জন্য হিমালয়ে চলে গেলেন।

এর পরেই পরাশর বলছেন, রৈবতক রাজা ককুদ্মী যখন ব্রহ্ম লোকে ছিলেন, তখন পুণ্যজন নামে রাক্ষসরা তাঁর কুশস্থলী পুরী ধ্বংস করে। রাক্ষসদের ভয়ে রাজার একশো ভ্রাতা দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করেন এবং তাঁর বংশের ক্ষত্রিয়রা সব দিকেই বসবাস করতে থাকেন।

এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে শর্যাতির আনর্ত নামে যে পুত্র কুশস্থলীতে তাঁর রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, তাঁর বংশধররা কয়েক পুরুষ পরেই দস্যুর আক্রমণে কুশস্থলী পরিত্যাগ করে চারি

দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল পরে অর্থাৎ দ্বাপরের শেষে এই বংশেরই একজন নিজের পরিচয় দিয়ে বলরামকে কন্যা দান করেন। বংশ গৌরবে রেবতী বড় ছিলেন বলেই তাঁকে দীর্ঘাঙ্গী বলা হয়েছে। বলরাম তাঁকে বংশের উপযোগী করে নেন। পুরাণকার একটি রূপকের আশ্রয় নিয়ে বুঝিয়েছেন যে এই বংশের পুরুষেরা সঙ্গীতের চর্চা করতেন এবং কুশস্থলী পরিত্যাগের পরে সঙ্গীত চর্চাতেই কালাতিপাত করেছিলেন।

মনুর বংশ

মনুর পুত্র পৃষধ্র গুরুর গো বধ করেছিলেন বলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। করূষের বংশে কারূষ নামে ক্ষত্রিয়ের জন্ম। নেদিষ্ঠের পুত্র নাভাগ বৈশ্য হয়েছিলেন। তার পূর্বেই ভলন্দন নামে তাঁর এক পুত্রের জন্ম হয়। ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রিয়, তাঁর পুত্র প্রাংশু, প্রাংশুর পুত্র প্রজানি, তাঁর পুত্র কনিত্র ও কনিত্রের পুত্র ক্ষুপ। ক্ষুপের পুত্র অবিবিংশ, তাঁর পুত্র বিবিংশ, বিবিংশের পুত্র খনিনেত্র। এঁর পুত্র অতিবিভূতি, তাঁর পুত্র করন্ধম অবিক্ষির পিতা। অবিক্ষির পুত্র মরুত্ত যে রকম যজ্ঞ করেছেন, সে রকম আর কেউ করেন নি। চক্রবর্তী রাজা মরুত্তের পুত্র নরিষ্যন্ত, তাঁর পুত্র দম, দমের পুত্র রাজ্যবর্ধন সুধৃতির পিতা। তাঁর পুত্র নর, তাঁর পুত্র কেবল, কেবলের পুত্র বন্ধুমান, তাঁর পুত্র বেগবান। তাঁর পুত্র বুধ তৃণবিন্দুর পিতা। তৃণবিন্দুর ইলিবিলা নামে এক কন্যা জন্মে, পরে অলম্বুষা নামে এক অপ্সরার গর্ভে তাঁর যে পুত্র হয়, তার নাম বিশাল। এই বিশাল বৈশালী নামে এক পুরী নির্মাণ করেন। বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, তাঁর পুত্র সুচন্দ্র ধূম্রাশ্বের পিতা। ধূম্রাশ্বের পুত্র সৃঞ্জয়, তাঁর পুত্র সহদেব। সহদেবের পুত্র কৃশাশ্ব সোমদত্তের পিতা। সোমদত্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁর পুত্রের নাম জনমেজয়। সুমতি তাঁর পুত্র। এঁরা বিশাল বংশীয় রাজা বলে পরিচিত।

মন্থুর পুত্র পৃষধ্র থেকে দমের পুত্র রাজ্যবর্ধন পর্যন্ত সমস্ত রাজাব কথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে সবিস্তাবে বর্ণিত হয়েছে। নামে কিছু পার্থক্য দেখা যায় এবং ঘটনাতেও। এই বিবরণ থেকে কিছু নূতন তথ্যও পাওয়া যায়। পৃষধ্র মৃগয়ার জন্য বনে গিয়ে গবয় মনে করে এক ব্রাহ্মণের হোমধেন্থু বধ করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের পুত্রের শাপে তিনি শূদ্র হন। শাপে কোন ব্যক্তির জাতি পরিবর্তন হয় না এবং এই শাপেব অর্থ যে নিন্দা তা বুঝতে অস্থবিধা হয় না।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে নাভাগ দিষ্টের পুত্র। যৌবনে পদার্পণ কবে তিনি এক বৈশ্য কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং কন্যার পিতার নিকটে গিয়ে তাকে চাইলেন। কন্যার পিতা নাভাগের পিতাকে জানতেন। তাই বললেন, আপনারা রাজা, আমরা ভৃত্য। আপনাদের সমকক্ষ নই। তাই আপনাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বন্ধন হতে পারে না। রাজপুত্র বললেন, ভিন্ন জাতি হলেও মান্থুষকে যোগ্যতা দেখতে হয়। আপনি আমাকে কন্যা সম্প্রদান করুন। বৈশ্য বললেন, আমরা দুজনেই পরাধীন। তাই আপনি পিতার অন্থুমতি নিয়ে কন্যাকে গ্রহণ করুন। রাজপুত্র বললেন, সত্য কথা, কিন্তু এ কথা গুরু জনকে বলা যায় না। বৈশ্য বললেন, তাহলে আমিই তাঁকে জিজ্ঞাসা করব। এই বলে বৈশ্য রাজাকে সব কথা নিবেদন করলেন। রাজা পুত্রকে ডেকে ঋচীক প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের উপদেশ চাইলেন। ঋষিরা বললেন, রাজপুত্র, আপনার যদি বৈশ্য কন্যায় অন্থুরাগ জন্মে থাকে তো তাই ধর্ম বলে গণ্য হবে। কিন্তু ন্যায়ান্থুসারে প্রথমে কোন রাজকন্যাব পাণিগ্রহণ করতে হবে। তার পরে একে বিবাহ করে উপভোগ করলে কোন দোষ হবে না। কিন্তু এখন একে হরণ করলে আপনাকে জাতিভ্রষ্ট হতে হবে। রাজপুত্র এ কথা গ্রাহ্য না করে তখনই বেরিয়ে গিয়ে সেই কন্যাকে গ্রহণ করে বললেন, আমি রাক্ষস বিবাহ পদ্ধতি অন্থুসরণ করে একে হরণ করলাম। ব্রাহ্মণরা বললেন, নাভাগ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হলেন। কৃষি বাণিজ্য ও পশুপালন তাঁর ধর্ম হল।

বিষ্ণু পুরাণে ভলন্দনের জন্ম নাভাগের বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হবার পূর্বে। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে পুত্রের নাম ভনন্দন এবং তাঁর জন্ম বৈশ্যকন্যার গর্ভে। তিনি পিতার রাজ্য উদ্ধার করেছিলেন এবং তাঁকে ক্ষত্রিয়ত্ব দান করার জন্য একটি কাহিনী রচিত হয়েছে। সে কাহিনী এখানে অবান্তর।

ভনন্দনের পুত্র বৎসপ্রিয়র নাম মার্কণ্ডেয় পুরাণে বৎসপ্রী। তিনি কুজ্‌ম্ভ নামে এক অসুর বধ করেছিলেন। তাঁর বারোটি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রাংশু রাজা হয়ে অসংখ্য যজ্ঞ করেন এবং তার পুত্র প্রজাতি জম্ভ ও আরও নিরানব্বইজন অসুর বধ করেছিলেন। প্রজাতির পুত্র খনিত্র তাঁর চার ভাইকে চারটি পৃথক রাজ্য দেন—শৌরিকে প্রাচী, উদাবসুকে দক্ষিণ, সুনয়কে প্রতীচী ও মহারথকে উত্তর দিকে নিয়োজিত করেন।

খনিত্রের পুত্র ক্ষুপ রাজা হয়ে শুধু শস্য নিয়েই তিনটি যজ্ঞ করে-ছিলেন এবং গো ব্রাহ্মণেরা যে কর দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের সেই পরিমাণ ধন দিলেন। তাঁর পুত্রের নাম বিবিংশ, বিদর্ভ বংশীয় নন্দিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। বিবিংশের পুত্র খনীনেত্র এত যজ্ঞ করেছিলেন যে গন্ধর্বরা গান গাইত যে তাঁর মতো যাজ্ঞিক হয় না। তাঁর পুত্রের নাম বলাশ্ব, ইনিই করন্ধম নামে বিখ্যাত হয়ে-ছিলেন। এঁর পুত্র অবীক্ষিতের কাহিনী অতি দীর্ঘ। তিনি রাজা হতে রাজী না হওয়ায় তাঁর পুত্র মরুত্তকে রাজা করা হয়। তার-পর রাজা হয়েছিলেন তাঁর পুত্র নরিষ্যন্ত। নরিষ্যন্তের পুত্রের নাম দম ও দমের পুত্র রাজ্যবর্ধন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ শেষ হয়েছে এইখানে, অর্থাৎ ৩৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পর আর কোন রাজার কথা নেই। রাজ্যবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশের যুবনাশ্ব, চন্দ্র বংশে জাত অনুর বংশে বলি এবং এই বংশেরই পুরু বংশে জাত রন্তিনার। রন্তিনারের কন্যা গৌরী মান্ধাতার মাতা। চন্দ্র বংশের যদুর বংশধরের নাম

পাওয়া যায় না। বিষ্ণু পুরাণে আছে যে এই বংশের কেউ রাজা হবেন না।

নিমি ও জনক বংশ

ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমিরও বংশছেদ ঘটেছিল। একটি কাহিনী রচনা করে প্রায় চল্লিশ পুরুষের ছেদ কমানো হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণে আছে, ইক্ষ্বাকুর নিমি নামে যে পুত্র ছিলেন, তিনি এক সময় সহস্র সংবৎসর ব্যাপী যজ্ঞের জন্য বশিষ্ঠকে হোতৃত্বে বরণ করেন। বশিষ্ঠ বললেন, ইন্দ্র আমাকে পঞ্চশত বর্ষব্যাপী যজ্ঞে বরণ করেছেন। আপনি অপেক্ষা করুন, তাঁর যজ্ঞ শেষ করে আমি আপনার ঋত্বিক হব। বশিষ্ঠের এই কথা শুনে রাজা নিমি কোন উত্তর দিলেন না। বশিষ্ঠ ভাবলেন যে রাজা এই কথায় সম্মত হয়েছেন এবং এই ভেবে ইন্দ্রের যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। কিন্তু রাজা নিমি বশিষ্ঠের জন্য অপেক্ষা না করে গৌতমাদি ঋষির সাহায্যে যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। এ দিকে ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ করে বশিষ্ঠ নিমির যজ্ঞের জন্য ত্বরান্বিত হয়ে এলেন এবং গৌতম যজ্ঞের কর্তৃত্ব করছেন দেখে নিদ্রিত নিমিকে শাপ দিলেন যে তাঁকে অবজ্ঞা করে গৌতমকে যজ্ঞের ভার দেবার জন্য নিমি বিদেহ অর্থাৎ দেহহীন হবেন। প্রবুদ্ধ হয়ে রাজাও বললেন, গুরু বশিষ্ঠ কিছু না জেনে শুনে আমাকে কিছু না বলে আমার নিদ্রাকালে আমাকে শাপ দিলেন, তার জন্য তাঁরও দেহ পতিত হবে। রাজা এই প্রতিশাপ দিয়ে দেহত্যাগ করলেন এবং তাঁর শাপের প্রভাবে বশিষ্ঠের তেজ মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হল। একদিন উর্বশীকে দেখে মিত্রাবরুণের বীর্য স্খলিত হলে তার থেকে বশিষ্ঠ অপর দেহ লাভ করলেন।

নিমি রাজার মৃতদেহ অতি মনোহর তৈল ও গন্ধাদি লিপ্ত থাকায় ক্লেদাদি দুষ্ট হল না এবং সদ্য মৃতের মতো অবিকৃত রইল। যজ্ঞ সমাপ্তির পর ঋত্বিকরা যজ্ঞভাগ গ্রহণে আগত দেবতাদের বললেন,

যজমানকে আপনারা বর দিন। দেবতারা বর গ্রহণ করতে বললে নিমি বললেন, এই জগতে শরীর ও আত্মার পরস্পর বিয়োগের চেয়ে বেশি দুঃখের আর কিছু নেই। কাজেই আমি আর শরীর গ্রহণ করতে চাই না। তার বদলে আমি সবার নয়নে বাস করতে চাই। নিমির এই প্রার্থনায় দেবতারা তাঁকে সকলের নেত্রে স্থাপন করলেন, এই জন্যই লোকের উন্মেষ ও নিমেষ হয়ে থাকে।

ঋষিরা অরাজকতার ভয়ে অপুত্রক রাজার দেহ অরণী কাষ্ঠে মন্থন করতে লাগলেন। তাতে এক পুত্র উৎপন্ন হল। জনকের দেহ থেকে জন্ম হল বলে ঐ পুত্রের নাম হল জনক এবং পিতা বিদেহ হয়েছিলেন বলে তাঁর অন্য নাম হল বৈদেহ। মন্থনে উৎপন্ন বলে তাঁকে মিথিও বলা হয়। এই বংশেই সীরধ্বজের জন্ম। পুত্রলাভের জন্য তিনি যখন যজ্ঞভূমি কর্ষণ করছিলেন, সেই সময়ে তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগে সীতা নামে এক কন্যা সমুৎপন্ন হল।

সীরধ্বজের ভ্রাতা কুশধ্বজ ছিলেন সাঙ্কাশ্য নগরের অধিপতি। সীরধ্বজের পর এই বংশের বত্রিশজনের পর জনক বংশের অবসান হয়। এই মৈথিল রাজাদের প্রায় সকলেই আত্মতত্ত্বে পণ্ডিত ছিলেন।

এই কাহিনীকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে দেখতে হবে। বোঝা যাচ্ছে যে নিমি ও বশিষ্ঠ যজ্ঞের সময় বিবাদ করে দুজনেই নিহত হয়েছিলেন। বশিষ্ঠের বংশধর পুত্র ছিল, কিন্তু নিমি অপুত্রক ছিলেন। তাই বশিষ্ঠের পুনর্জন্ম হয়েছিল, নিমি বিদেহই রয়ে গেলেন। তিনি লোকের চক্ষুতে নিমেষ হয়ে রইলেন। এর অর্থ লোকচক্ষুর আড়ালে রইলেন। নিমির যজ্ঞের কাল সহস্র বৎসর। অর্থাৎ এই বংশের ছেদ হয়েছিল দীর্ঘকালের জন্য। বৎসরের হিসাবে তা পাওয়া যায়। ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি তাঁর ভ্রাতা বিকুক্ষির সমসাময়িক। এদিকে সীতা রামের স্ত্রী হয়েছিলেন বলে এই দুই বংশের পর্যায় কাল সমান হওয়া দরকার। গুণে দেখা যায় যে বিকুক্ষি ও রামের মধ্যে আরও ষাটজন আছেন, কিন্তু নিমির বংশে আছেন মাত্র

বাইশজন। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে নিমির আটত্রিশ পুরুষ পর জনক নামে কোন ব্যক্তি নিমির বংশধর বলে নিজেব পরিচয় দিয়ে মিথিলা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিদেহ নিমির বংশধর বলে তিনি বিদেহ রাজ এবং নিমির বংশে মন্থন বা অন্বেষণ করে তাঁকে পাওয়া যায় বলে তিনি মিথিলাপতি। ইনি ইক্ষ্বাকুর মূল বংশে অর্থাৎ বিকুক্ষির বংশে ভগীরথের পুত্র শ্রুতের সমসাময়িক, অর্থাৎ জনক বংশের আরম্ভ ২৭১৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। যথাস্থানে এই নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

এই পরিচ্ছেদে যে তিনশো বৎসরের ইতিহাস আলোচিত হচ্ছে. তার মধ্যে প্রধান ঘটনা রাজা যযাতির রাজ্য কাল এবং বৃহদশ্বের রাজত্ব কালে মরুস্থলের অগ্ন্যুৎপাত। প্রথমে যযাতির কথা বলা যাক, তার পব বৃহদশ্বের কথা। বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব এই অগ্ন্যুৎপাতের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে পুরূরবার পুত্রের নাম আয়ু ও আয়ুর পুত্র নহুষ। উর্বশী ও পুরূরবার প্রেমের কাহিনী থেকে কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায় যে তিনি ইন্দ্রের মিত্র ছিলেন এবং অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রকেই সাহায্য করতেন। এই সূত্রেই উর্বশীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং ইন্দ্র গন্ধর্বদের সাহায্যে উর্বশীকে পুনরায় স্বর্গে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাঁর পৌত্র নহুষের কথাও পূর্বে বলা হয়েছে। ইলাবৃত বর্ষে ইন্দ্র যখন আত্মগোপন করে অবস্থান করছিলেন, নহুষকে তখন প্রতিষ্ঠান নগর থেকে ইন্দ্রত্ব করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি যুবক ছিলেন বলেই মনে হয়। কিন্তু তাঁকে ফিরে আসতে হয়।

ইলাবৃত বর্ষে প্রথম ইন্দ্র ছিলেন অদিতির পুত্র শক্র। আর একজন ইন্দ্রের নাম শতক্রতু। একজনের পুত্রের নাম জয়ন্ত। জয়ন্ত নিশ্চয়ই ইন্দ্র হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বংশের আর কোন

ব্যক্তির নাম জানা যায় না। জয়ন্তের ভগিনী জয়ন্তী শুক্রের সঙ্গে সংসার করেছিলেন। মনে হয় জয়ন্তী তখন যুবতী ও শুক্র প্রৌঢ় তপস্বী। তাঁদের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেছিলেন নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতির পিতামহ আয়ু দৈত্য বংশে বিবাহ করেছিলেন এবং যযাতি বিবাহ করেছিলেন দৈত্য গুরু শুক্রের কন্যা দেবযানী এবং দানব রাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে। এই সব ঘটনা থেকে মনে হয় চন্দ্র বংশই তখন বংশ গৌরবে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং এর জন্যই নহুষ ইন্দ্রপদ লাভ করেছিলেন —হয় যোগ্যতায়, নয় শক্তিতে।

চাতুর্বর্ণ প্রবর্তন

চন্দ্র বংশের পরিচয় আছে বিষ্ণুপুরাণে। পুরূরবার ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আয়ু এবং আর এক পুত্র অমাবসুর বংশে দীর্ঘকাল পরে জহ্নুর জন্ম। বিশ্বামিত্র এই বংশেই জন্মেছিলেন। আয়ু বাহুর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর নহুষ ক্ষত্রবৃদ্ধ রম্ভ রজি ও অনেনা নামে পাঁচ পুত্র হয়। সুহোত্রের তিন পুত্রের নাম কাশ লেশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক চাতুর্বর্ণের প্রবর্তক।

ভারতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের প্রবর্তন কবে হয়েছিল, তা এই উক্তি থেকেই জানা যায়। শৌনকের কাল পুরূরবার পর ষষ্ঠ পুরুষে অর্থাৎ প্রায় দেড় শো বৎসর পরে অর্থাৎ ৩৬৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। এর পূর্বে ভারতে জাতি বা বর্ণভেদ ছিল না। পুরাণ পাঠে জানা যায় যে শৌনক নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ করেছিলেন এবং সেই যজ্ঞ সভায় সূত পুরাণ পাঠ করেছিলেন। উগ্রশ্রবার পিতা লোমহর্ষণকে পুরাণ পাঠ কালে হত্যা করেছিলেন কৃষ্ণের ভ্রাতা বলরাম। সে ঘটনা বহুকাল পরে। কাজেই বলা যেতে পারে যে শৌনক একাধিক ছিলেন।

ধন্বন্তরি ও আয়ুর্বেদ

কাশের পুত্র কাশিরাজ, তাঁর পুত্র দীর্ঘতমা ধন্বন্তরির পিতা। ধন্বন্তরির দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে মর্ত্যধর্ম ছিল না এবং ইনি প্রাণীতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্বজন্মে ইনি বিষ্ণুর নিকটে বর পেয়েছিলেন যে কাশিরাজ গোত্রে জন্মে ইনি আয়ুর্বেদ আট ভাগে বিভক্ত করবেন ও যজ্ঞ ভাগী হবেন।

বিষ্ণু পুরাণের এই উক্তি থেকে দেখা যাচ্ছে যে পুরূরবার পর অষ্টম পুরুষে ধন্বন্তরি। দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের সময়ে এক ধন্বন্তরি অমৃতের কুম্ভ হাতে নিয়ে উঠেছিলেন। পুরাণকার বললেন যে বিষ্ণুর বরে ইনিই পরজন্মে আয়ুর্বেদ বিভাগ করবেন। এই উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম ধন্বন্তরি ছিলেন আয়ুর্বেদের প্রবর্তক এবং দ্বিতীয় ধন্বন্তরি আয়ুর্বেদের উন্নতি সাধন করেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব এই সব উক্তি থেকেই নির্ণয় করা সম্ভব। অনুমান করা যেতে পারে যে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে অর্থাৎ ৩৮০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জানা গিয়েছিল যে ধন্বন্তরি নামে কোন ব্যক্তি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন।

ধন্বন্তরির বংশেই দিবোদাস। তাঁর পুত্র প্রতর্দন শত্রুজিৎ, বৎস ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামে পরিচিত। তিনি গন্ধর্ব কন্যা মদালসাকে বিবাহ করেছিলেন। অলর্ক তাঁদের পুত্র। কুবলয়াশ্ব মদালসা ও অলর্কের উপাখ্যান মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে।

আয়ুর আর এক পুত্র রজি পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁর সময়ে দেবাসুরের যে যুদ্ধ হয় তাতে দু পক্ষই তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। রজি শর্ত দিয়েছিলেন যে শত্রু জয় করতে পারলে তাঁকে ইন্দ্রের পদ দিতে হবে। দৈত্যেরা আগে এসেছিলেন। তাঁরা বললেন, তা সম্ভব নয়। আমরা প্রহ্লাদের জন্য যুদ্ধ করছি, জয় হলে তিনিই রাজা হবেন। কিন্তু দেবতারা রাজা হয়ে বললেন, তাই হবে। [illegible] নামে এক ব্যক্তি তখন দেবতাদের অধিপতি। [illegible] আর কোন

দেবতাদের জয় হল। শতক্রতু এসে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, আমি আপনার পুত্র। রজি এই চাটুবাক্যের অর্থ বুঝতে পেরে হেসে বললেন, বেশ, তুমিই রাজা হও। বলে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর রজির পুত্ররা ইন্দ্র পদ দাবী করেছিলেন। শতক্রতু রাজী না হওয়ায় তাঁরা যুদ্ধ করে সেই পদ অধিকার করেন। কিন্তু বেশি দিন ভোগ করতে পারেন নি। বৃহস্পতির চেষ্টায় শতক্রতু রজির পুত্রদের বধ করে পুনরায় ইন্দ্র হয়েছিলেন।

যযাতি

পুরাণে বলা হয়েছে যে নহুষ অগস্ত্যের শাপে অজগরত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি সর্পদষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিলেন, না তাঁকে নিহত বা পঙ্গু করা হয়েছিল তা বোঝা যায় না। কিন্তু ইন্দ্রপদ থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনি নিজের রাজ্যে বোধ হয় আর রাজত্ব করেন নি। তাঁর ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যতি রাজা হতে না চাইলে দ্বিতায় পুত্র যযাতি রাজা হয়েছিলেন। তিনিই দৈত্যগুরু শুক্রের কন্যা দেবযানী ও দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন।

যযাতি ক্ষত্রিয় হয়ে কেন ব্রাহ্মণ কন্যাকে প্রতিলোম বিবাহ করে-ছিলেন, সেই কাহিনী আছে শ্রীমদ্‌ভাগবতে। দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা গুরু শুক্রের কন্যা দেবযানী ও সহস্র সখার সঙ্গে সরোবরের তীরে নিজেদের বস্ত্র রেখে জলে বিহার করছিলেন। এই সময়ে পার্বতীর সঙ্গে শিবকে বৃষে আরোহণ করে যেতে দেখে সবাই লজ্জায় তীরে উঠে বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। ব্যস্ততা বশত শর্মিষ্ঠা নিজের মনে করে গুরুকন্যার বস্ত্র পরিধান করলে দেবযানী বললেন, শূদ্রের বেদ ধারণের মতো অসুর কন্যা এই দাসী আমার কাপড় পরেছে। গুরুকন্যার এই তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হয়ে শর্মিষ্ঠা বললেন, ভিক্ষুকী, তোমরা কি কাকের মতো আমাদের গৃহের প্রত্যাশা কর না!

বলে দেবযানীর বস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে একটা কূপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন। মৃগয়ায় এসে রাজা যযাতি দৈবাৎ দেবযানীকে দেখতে পেলেন। তিনি এই বিবস্ত্রা কন্যাকে পরিধানের জন্য নিজের উত্তরীয় দিয়ে হাত ধরে তাঁকে কূপের ভিতর থেকে উদ্ধার করলেন। দেবযানী বললেন, আপনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন, আর কেউ যেন আমাকে বিবাহ না করে। বৃহস্পতির পুত্র কচের অভিশাপে কোন ব্রাহ্মণ আমার পাণিগ্রহণ করবেন না। এই বিবাহ অশাস্ত্রীয় হলেও যযাতি তা মেনে নিয়েছিলেন। এর পব দেবযানী কাঁদতে কাঁদতে এসে শুক্রের নিকটে শর্মিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। শুক্র মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে দৈত্যপুরী ত্যাগ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বৃষপর্বা তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্য তাঁর পায়ে ধরলেন। এতেই শুক্র সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আমি তো কন্যাকে ত্যাগ করতে পারি না, তুমি তার অভিলাষ পূর্ণ কর। দেবযানী বললেন, আমি যেখানে যাব, শর্মিষ্ঠা তার সহচরীদের নিয়ে আমার অনুগমন করবে। বৃষপর্বা নিজের সঙ্কট বুঝেও এতে রাজী হয়ে গেলেন। শুক্র যযাতিকে নিজের কন্যা সম্প্রদান করে বললেন, শর্মিষ্ঠাকে তুমি কখনও নিজের শয্যায় স্থান দিতে পারবে না। কিন্তু কিছুকাল পরে দেবযানীকে পুত্রবতী হতে দেখে শর্মিষ্ঠা নির্জনে যযাতিকে তাঁর কামনার কথা জানিয়েছিলেন। দেবযানীর যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। এই কথা জানতে পেরে দেবযানী পিতৃগৃহে চলে যান এবং শুক্র ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে শাপ দেন, তুমি জরাগ্রস্ত হও। যযাতি তাঁর পুত্রদের একে একে ডেকে নিজের জরা গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু সকলে প্রত্যাখ্যান করলে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুরু এতে সম্মত হলেন এবং যযাতি সপ্তদ্বীপের সম্রাট রূপে বিষয় ভোগ করতে লাগলেন। এক সময় এই স্ত্রৈণ রাজা আত্ম বঞ্চনা বুঝতে পেরে পুরুকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে নিজের জরা গ্রহণ করলেন। তিনি যদুকে দক্ষিণ দিকে, তুর্বসুকে পশ্চিম দিকে, দ্রুহ্যুকে

দক্ষিণ পূর্ব দিকে ও অনুকে উত্তর দিকে রাজা করলেন এবং পুরুকে ভূমণ্ডলের অধিপতি করে বনে গেলেন।

এই কাহিনীতে শুক্রের শাপে যযাতির জরা, পুরুর জরা গ্রহণ ও পুনরায় যৌবন লাভ অবিশ্বাস্য ঘটনা। কেন এই রকমের একটি কাহিনী কল্পিত হল, তা ভেবে দেখা দরকার। পুরাণান্তরে পাওয়া যায় যে বৃহস্পতির পুত্র কচ যখন শুক্রের নিকটে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষার জন্য এসেছিলেন, তখন দেবযানী তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন এবং এরই পরিণামে কচ অভিশাপ দিয়েছিলেন যে কোন ব্রাহ্মণ তাঁকে বিবাহ করবেন না। এর পর ক্ষত্রিয় বাজা যযাতি তাঁকে হাত ধরে কূপ থেকে উদ্ধার করলে এই পাণি গ্রহণের জন্যই দেবযানী যযাতিকে বিবাহে বাধ্য করেছিলেন। যযাতি শর্মিষ্ঠাকেও বিবাহ করেছিলেন বলে মনে হয় এবং স্ত্রৈণ ছিলেন বলেই অল্প বয়সে জরাগ্রস্ত হয়েছিলেন। সম্ভবত সামাজিক নিয়মে বাণপ্রস্থে যাবার সময় উপস্থিত হলে তিনি আরও কিছুকাল বিষয় ভোগ করতে চেয়েছিলেন এবং একমাত্র পুরু তাঁর এই ইচ্ছাকে সমর্থন করেছিলেন বলে তিনি তাঁকেই পরবর্তীকালে সমগ্র রাজ্যের অধিকার দেন।

যযাতির বংশ

নিমির বংশের মতো যদুবংশেও প্রায় পঞ্চাশ পুরুষের ছেদ আছে দেখা যায়। ২৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ক্রোষ্টু নামে কোন ব্যক্তি যদু বংশ জাত বলে দাবী করেন। এই ক্রোষ্টুর বংশেই সপ্তদশ পুরুষে বৃষ্ণি, সপ্তত্রিংশৎ পুরুষে অন্ধক এবং অষ্টচত্বারিংশ পুরুষে কৃষ্ণের জন্ম। অনুর বংশ লোপ পেয়েছে আনুমাতিক ২৯০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এবং পুরুর বংশে পঞ্চদশ ও ষোড়শ পুরুষে দুষ্মন্ত ও ভরত। এই বংশে হস্তীর পর প্রায় তিরিশ পুরুষের ছেদ আছে, তারপর অজমীঢ় নামে এক ব্যক্তি এই বংশের উত্তরাধিকারী বলে পরিচয় দেন আনুমানিক ২৩২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। অজমীঢ়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশে বত্রিশজনের পর

শান্তনুর কাল ১৪৮৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের বংশ নীপ বংশ নামে পরিচিত হয়েছিল দশম পুরুষে নীপের নামে।

সহস্রজিৎকে যদুর পুত্র বলা হয়েছে এবং যদুর পুত্র হৈহয় একটি শক্তিশালী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু সহস্রজিৎ কোন মতেই যদুর পুত্র হতে পাবেন না। তাঁর কাল যদুর বহু পরে, আনুমানিক ৩৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। তার কারণ এই বংশে কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন হৈহয়ের জন্ম নবম পুরুষে এবং তিনি পরশুরামের কিংবা তাঁর পিতা জমদগ্নির সমকালীন ছিলেন।

তুর্বসু ও দ্রুহ্যুর বংশে উল্লেখযোগ্য কোন নাম নেই। দ্রুহ্যুর পুত্ররা ম্লেচ্ছদেব আধিপত্য করেছিলেন।

ইক্ষ্বাকুর বংশ

এইবারে ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিকুক্ষির বংশ পরিচয় দেওয়া যাক। ইক্ষ্বাকুর একশো পুত্রের মধ্যে পঞ্চাশ জন উত্তরাপথে ও আটচল্লিশজন দক্ষিণাপথে রাজা হন। নিমির কথা পূর্বে বলা হয়েছে। বিকুক্ষিই যুবরাজ ছিলেন। রাজা তাঁকে শ্রাদ্ধের জন্য মাংস সংগ্রহ করে আনতে বললে তিনি বনে গিয়ে মৃগ শিকারে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন। তখন একটি শশক ভক্ষণ করে বাকি মাংস পিতার নিকটে আনেন। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ মাংস দেখেই বললেন যে তা অপবিত্র হয়েছে। পুত্র একটি শশক খেয়ে ফেলেছে জেনেই পিতা তাঁকে পরিত্যাগ করলেন এবং তাঁর নাম হল শশাদ। শশাদ অবশ্য পিতার মৃত্যুর পর রাজা হয়েছিলেন।

শশাদের পুত্র পরঞ্জয় দেবতাদের পক্ষ নিয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। দেবতারা অসুরদের নিকটে পরাজিত হয়ে তাঁর সাহায্য চাইতে এলে পরঞ্জয় বলেন যে শতক্রতু ইন্দ্র তাঁর বাহন হলে তিনি যুদ্ধ করবেন। ইন্দ্র রাজী হলে পরঞ্জয় তাঁর কাঁধে চেপে যুদ্ধ করেন এবং অসুর সেনা দলিত করেন। এইজন্য তাঁর নাম হয়

ককুৎস্থ। এঁর পুত্র অনেনা পৃথুর পিতা। পৃথুর পুত্র বিশ্বগশ্ব, তাঁর পুত্র অর্দ্র, অর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব এবং যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত শ্রাবস্তী নামে এক পুরী স্থাপন করেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব এবং তাঁর পুত্র কুবলয়াশ্ব একুশ হাজার পুত্রে পরিবৃত হয়ে মহর্ষি উতঙ্কের অপকারী ধুন্ধু নামের এক অসুরকে বিনাশ করে ধুন্ধুমার সংজ্ঞা পেয়েছিলেন। কুবলয়াশ্বের সমস্ত পুত্র ধুন্ধুর মুখের নিঃশ্বাসের আগুনে দগ্ধ হয়ে বিনষ্ট হয়। তাদের মধ্যে কেবল দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব নামে তিন পুত্র রক্ষা পায়।

ধুন্ধুমার

বায়ু পুরাণে এই ঘটনার বিবরণ বিশদ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাজা বৃহদশ্ব যখন বাণপ্রস্থ অবলম্বনে উদ্যত হয়েছেন, সেই সময়ে মহর্ষি উতঙ্ক এসে বললেন, রাজা, আমার আশ্রমের নিকটে এক বালির সমুদ্র আছে। সেখানে ধুন্ধু নামে মনুর এক পুত্র বালির নিচে অন্তর্হিত থেকে শত শত লোক বিনাশের জন্য নিদারুণ তপ করছে। সে মহাকায় মহাবল ক্রূর ও দেবতাদেরও অবধ্য। সম্বৎসর শেষে সে যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তখন সপ্তাহ কাল ধরে ভূমিকম্প হতে থাকে এবং প্রদীপ্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে ধোঁয়া নির্গত হয়। মহর্ষির কথা শুনে রাজা বৃহদশ্ব তাঁর পুত্র কুবলয়াশ্বকে বললেন ধুন্ধুকে দমন করতে। কুবলয়াশ্ব একুশ হাজার পুত্র নিয়ে সেই মরুভূমিতে গিয়ে বালির সমুদ্র খনন করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু পশ্চিম দিকাশ্রিত ধুন্ধুর মুখ থেকে আগুন বেরিয়ে সকাইকে উল্টে ফেলতে লাগল এবং তার উপর দিয়ে জলের প্লাবন বয়ে গেল। তাতে তিনজন ছাড়া কুবলয়াশ্বের আর সমস্ত সন্তান বিনষ্ট হল। কিন্তু কুবলয়াশ্ব যোগ বলে সেই জলেই আগুন নিবিয়ে সমস্ত জল পান করে ফেললেন। ধুন্ধু নিরস্ত হল।

এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় যে উতঙ্কের আশ্রম ছিল মরুস্থলে

মহাভারতের উতঙ্ক বহু পরবর্তী কালের হলেও তিনিও মরুস্থলবাসী ছিলেন। প্রথম উতঙ্কের সময়ে এই মরুভূমিতে ছিল একটি আগ্নেয়গিরি। প্রতি বছরই সেই আগ্নেয়গিরি থেকে আগুন ও ধোঁয়া বেরোত। কম্পন অর্থে ধু-ধাতু এবং ধুন্ধু নাম ধূম থেকেই নিষ্পন্ন হয়েছে। ধুন্ধু শব্দেই ধূম ও কম্পন বোঝানো হয়েছে। কুবলয়াশ্ব একুশ হাজার পুত্র নিয়ে ধুন্ধু দমনে গিয়েছিলেন। স্পষ্ট বোঝা যায় যে পুত্র শব্দে সেনা বা মজুর বোঝানো হয়েছে। সেকালে প্রজাকেও পুত্র বলা হত। পুত্রের মতো প্রিয় বলে তারাও পুত্র। কুবলয়াশ্ব বোধহয় ভূমিকম্পের বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পর উদ্ধারের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর লোকদের। সেই সময়ে আর একবার অগ্ন্যুৎপাত হয় এবং খোঁড়াখুঁড়ির ফলে ভূগর্ভস্থ জলের প্লাবনে সব লোকজন ভেসে যায় বা অগ্ন্যুৎপাতে চাপা পড়ে। যাঁরা বাঁচে, তাঁরা তিনজন নিশ্চিত ভাবে কুবলয়াশ্বের নিজের পুত্র। পিতার সঙ্গে তাঁরা আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়েছিলেন।

এই অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পই পুরাণের প্রথম ঘটনা। এর কাল আনুমানিক ৩৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘটনার উল্লেখ আছে মহাভারতে। বলরাম ছিলেন সঙ্কর্ষণের অবতার। এক বার তিনি লাঙ্গল দিয়ে যমুনাকে আকর্ষণ করে তার প্রবাহ পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন, আর একবার দুর্যোধনরা বন্দী ভ্রাতুষ্পুত্র শাম্বকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলে তিনি তাঁর লাঙ্গলে হস্তিনাপুর উৎপাটিত করতে চেয়েছিলেন। তাতে হস্তিনাপুর গঙ্গার দিকে ঝুঁকে গেছে। এই দুটি ঘটনাও ভূমিকম্পের ফলে হয়েছে বলে মনে হয়। ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরিকেও যে সঙ্কর্ষণ বলা হত, তাতে সন্দেহ নেই।

মান্ধাতা

কুবলয়াশ্বের জ্যেষ্ঠ পুত্র দৃঢ়াশ্বের পুত্র বার্যশ্ব, তাঁর পুত্র নিকুম্ভ, তাঁর পুত্র সংহতাশ্ব, তাঁর পুত্র প্রসেনজিৎ যুবনাশ্বের পিতা। যুবনাশ্বের কোন পুত্র সন্তান ছিল না বলে তিনি পরম দুঃখে মুনিদের আশ্রমে বাস করতেন। কালক্রমে মুনিরা কৃপা পরবশ হয়ে যুবনাশ্বের পুত্র-লাভের জন্য যজ্ঞ করলেন। মধ্য রাত্রে যজ্ঞ সমাপ্ত হলে তাঁরা মন্ত্রপূত জলের কলস বেদীতে রেখে শয়ন করলেন। এ দিকে যুবনাশ্ব তৃষ্ণার্ত হয়ে সেখানে এসে নিদ্রিত মুনিদের না জাগিয়ে সেই মন্ত্রপূত জল পান করলেন। মুনিরা জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই জল পান করল? এই জল পান করলে যে যুবনাশ্বের পত্নী পুত্র লাভ করতেন! রাজা বললেন, না জেনে আমি এই জল পান করেছি। তাই যুবনাশ্বেরই গর্ভ সঞ্চার হল এবং যথাসময়ে তাঁর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে এক পুত্র সন্তান জন্মাল। কিন্তু রাজা মরলেন না। মুনিরা বললেন, এই শিশু কার স্তন্য পান করবে? দেবরাজ ইন্দ্র এসে বললেন, এ আমাকে ধয়ন করবে। বলে শিশুর মুখে তাঁর প্রদেশিনী অঙ্গুলি দিলেন। শিশু সেই অমৃতস্রাবিণী অঙ্গুলি চুষে এক দিনেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল। মাং ধাতা, ইন্দ্রের এই কথা থেকে শিশুর নাম হল মান্ধাতা।

মান্ধাতার জন্ম বৃত্তান্ত যে রহস্যময় তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কোন পুরুষের কুক্ষি বা উদর ভেদ করে সন্তানের জন্ম হতে পারে না এবং কারও উদর ভেদ হলে মৃত্যু অনিবার্য। সুতরাং এই রকমের জন্ম বৃত্তান্ত দিয়ে পুরাণকার কোন সত্য গোপনের চেষ্টা করে-ছিলেন। মান্ধাতাকে গৌরিক অর্থাৎ গৌরীর পুত্র বলা হয়। কিন্তু ব্যাকরণ মতে এটি নিন্দার্থে নিষ্পন্ন। বায়ু পুরাণে পাওয়া যায়, যুবনাশ্বের গৌরী নামে এক পতিব্রতা পত্নী ছিল এবং স্বামীর অভিশাপে তিনি বাহুদা নামে নদী হয়েছিলেন। এখানেও সত্য গোপনের চেষ্টা হয়েছে। কোন নারী তাঁর স্বামীর অভিশাপে নদীতে পরিণত হতে

পারেন না এবং পতিব্রতা স্ত্রীকে কেউ শাপ দেবে, এ কথাও সত্য হতে পারে না। তবে যুবনাশ্বের পত্নীর নাম যে গৌরী, সে কথা সত্য। গৌরী ছিলেন পুরু বংশের রাজা রন্তিনারের কন্যা এবং রন্তিনার যুবনাশ্বের সমসাময়িক। গৌরীর সঙ্গে রাজার বিচ্ছেদ হয়েছিল এবং নিঃসন্তান রাজা মনের দুঃখে ছিলেন, এ কথাও ঠিক। মান্ধাতাও ইন্দ্রের সহায়তায় বড় হয়েছিলেন বলে মনে হয়। এই সমস্ত উক্তি মিলিয়ে অনুমান করলে অন্যায় হবে না যে স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করে রাজা যুবনাশ্ব গৌরীকে বাহুদা নামের কোন নদীর তীরে নির্বাসন দিয়েছিলেন এবং নিজে দুঃখে কাল কাটাচ্ছিলেন। এই নদীর তীরেই গৌরীর পুত্র মান্ধাতার জন্ম হয় এবং বড় হয়ে তিনি ইন্দ্রের সহায়তায় যুবনাশ্বকে রাজ্যচ্যুত করেন। কিন্তু প্রাণে বধ না করে কারারুদ্ধ করেন, কিংবা বনে নির্বাসিত করেন। মান্ধাতা কালে চক্রবর্তী রাজা হয়ে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভোগ করেছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে সূর্য যেখান থেকে উদিত হয় ও যেখানে অস্ত যায় তার অন্তর্গত সমুদায় ক্ষেত্র যুবনাশ্ব বংশীয় রাজা মান্ধাতার বলে কীর্তিত। এই উক্তি বিষ্ণুপুরাণের। তাই মনে হয় যে এই পুরাণ রচয়িতা মান্ধাতার জন্মবৃত্তান্ত গোপন করার জন্যই একটি কাহিনী কল্পনা করেছিলেন এবং বায়ু পুরাণ রচয়িতাও তাঁর মাতার কোন কলঙ্ক গোপনের চেষ্টায় তাঁকে পতিব্রতা বলেছিলেন।

মান্ধাতা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর পুরুকুৎস অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁর পঞ্চাশটি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন সৌভরি নামে এক বৃদ্ধ ঋষি। এঁদের নিয়ে একটি উপাখ্যান আছে বিষ্ণু পুরাণে।

মুচুকুন্দের উপাখ্যান আছে শ্রীমদ্‌ভাগবতে। ইন্দ্রাদি দেবতাকে তিনি বহুকাল অসুরদের হাত থেকে রক্ষা করেন, পরে কার্তিকেয়কে স্বর্গের পালক রূপে পেয়ে দেবতারা বললেন, আপনি আমাদের রক্ষার জন্য বহুকাল কষ্ট স্বীকার করেছেন, এইবারে বিশ্রাম করুন। আপনার

পুত্র কলত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেউ তো আর জীবিত নেই, আপনাকে আমরা কী বর দেব বলুন। মুচুকুন্দ বললেন, কেউ আমার নিদ্রা ভঙ্গ করলে সে যেন আমার দৃষ্টিপাতেই ভস্মীভূত হয়। দেবতারা বলেছিলেন, তথাস্তু। আর মুচুকুন্দ একটি গুহায় প্রবেশ করে নিদ্রাব অভিভূত হয়েছিলেন।

বহুকাল পরে কালযবন নামে নামে এক ম্লেচ্ছ রাজা যখন মথুরা আক্রমণ করেন, তখন কৃষ্ণ তাঁকে ভুলিয়ে এই গুহার মধ্যে আনেন। কৃষ্ণের পিছনে কালযবন সেই গুহায় প্রবেশ করে এক নিদ্রিত ব্যক্তিকে দেখে ভাবলেন যে কৃষ্ণই সাধুর মতো নিদ্রার ভান করছেন। তাই তাঁকে পদাঘাত করলেন। এই পদাঘাতেই মুচুকুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হল এবং তাঁর ক্রোধবহ্নিতে কালযবন ভস্মীভূত হয়ে গেলেন।

এই কাহিনীও কল্পিত। এই মুচুকুন্দকে মান্ধাতার পুত্র বলা হলেও তিনি তা হতে পারেন না। তার কারণ কালের ব্যবধান দুস্তর। মনে হয় যে মুচুকুন্দের বংশে জাত কোন ব্যক্তির হাতেই কালযবন নিহত হয়েছিলেন। অথবা কৃষ্ণ কৌশলে তাঁকে হত্যার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভুলিয়ে কালযবনকে একটি গুহার মধ্যে আনেন এবং সেই ব্যক্তি গুহায় আত্মগোপন করে থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করে কালযবনকে হত্যা করে।

মান্ধাতার এমন কোন কীর্তি নেই যে তাঁকে আমরা তাঁর কীর্তির জন্য স্মরণ করতে পারি। কিন্তু তবু আমরা প্রাচীন কাল বোঝাতে বলি মান্ধাতার আমল। এই মান্ধাতার আমল কবে ছিল সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। বায়ু পুরাণের মতে এই মান্ধাতার কাল ত্রেতার পঞ্চদশ যুগে অর্থাৎ আনুমানিক ৩৪৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এখন থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে মান্ধাতার আমল ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

ত্রেতা যুগের শেষ সহস্র বৎসর

(৩৪৫৮ থেকে ২৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)

দুষ্মন্ত ও ভরত, সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, জমদগ্নি, কার্তবীর্য অর্জুন ও পরশুরাম, সগর ও ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, ঋতুপর্ণ ও নল, কল্মাষপাদ

দুষ্মন্ত ও ভরত

মান্ধাতার জননী গৌরীর পিতা ছিলেন প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা রন্তিনার। কাব্যে বিখ্যাত দুষ্মন্ত তাঁর প্রপৌত্র। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দুষ্মন্তের কাহিনী আছে সংক্ষেপে। এক সময়ে দুষ্মন্ত মৃগয়া করতে গিয়ে কণ্ব মুনির আশ্রমে এক সুন্দরী কন্যাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে ? শকুন্তলা বললেন, আমি বিশ্বামিত্রের কন্যা। আমার মা মেনকা আমাকে বনে ত্যাগ করে যান। ভগবান কণ্ব এই বৃত্তান্ত জানেন। ইচ্ছা করলে আপনি এখানে বাস করতে পারেন। দুষ্মন্ত বললেন, তুমি কুশিক বংশজাত রাজকন্যা। যোগ্য বর বরণ করতে পার। শকুন্তলা সম্মত হলে দুষ্মন্ত তাঁকে গন্ধর্ব বিধান অনুসারে বিবাহ করলেন এবং তাঁর গর্ভাধান করে নিজের পুরে ফিরে গেলেন।

যথাসময়ে শকুন্তলা একটি পুত্র প্রসব করলেন। বালক বয়সেই সে বনের সিংহের সঙ্গে খেলা করত। বিষ্ণুর বংশে জন্ম সেই বালককে নিয়ে শকুন্তলা স্বামীর নিকটে গেলে দুষ্মন্ত তাঁদের গ্রহণ করলেন না। তখন আকাশে দৈববাণী হল, পিতাই পুত্র রূপে উৎপন্ন হন। তুমি এই পুত্রকে ভরণ কর ও শকুন্তলাকে অবজ্ঞা

কোরো না। এই পুত্রই পিতার মৃত্যুর পরে ভরত নামে সম্রাট হয়েছিলেন।

মহাভাবতে ও নানা কাব্যে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনী পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে কণ্ব মুনির আশ্রম থেকে ফিরে গিয়ে দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং এই জন্য তিনি শকুন্তলা ও তাঁর পুত্রকে গ্রহণ করতে চাননি। ঋষির শাপে এই রকম হয়েছিল। পুরাণকার এই ভাবে সত্যকে গোপন করেছিলেন।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে জানা যায় যে দুষ্মন্তের কাল ৩৩৮৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ ; এবং বিশ্বামিত্র শকুন্তলার জনক হতে পারেন না। তার কারণ বিশ্বামিত্রেব জন্ম তখনও হয় নি। তিনি অমাবসুর বংশে দশম পুরুষ গাধির পুত্র। গাধির কাল ৩০৬৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ বলে অনুমান করা হয়। স্বর্গের অপ্সরা মেনকা তাঁর জননী। কিন্তু যে সময়ে মেনকারা ভারত বর্ষের মুনি ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ করতে আসতেন, তা বহুকাল পূর্বেই গত হয়েছিল। এক কথায় বলা যায় যে শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের কন্যা ছিলেন না, তাঁর মাও ছিলেন না মেনকা। তবে এ রকম একটা কথা শকুন্তলা দুষ্মন্তকে কেন বললেন ? সত্য কথা তাঁর জানা ছিল না, এটাই সত্য কথা ! কণ্ব এই কন্যাকে তাঁর আশ্রমের নিকটে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছিলেন, পিতা মাতার পরিচয় জানা ছিল না বলে কণ্ব বোধ হয় এই মিদারুণ সত্য কন্যাসমা শকুন্তলাকে বলতে চান নি। তিনি তাঁকে এক অপ্সরার কন্যা বলেছিলেন এবং পিতা একজন তপস্বী। দুষ্মন্ত এই কথা সত্য মনে করে কণ্বের আগমনের অপেক্ষা না করেই শকুন্তলাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু পরে ঋষির নিকটে সত্য কথা জানতে পেরেই তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। শকুন্তলা অন্তঃসত্বা হয়েছিলেন এবং ঋষির আশ্রমে তাঁর পুত্রের জন্ম হয়। তার পরে তাঁরা রাজার নিকটে গেলে প্রথমে রাজা তাঁদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং পরে গুরু কিংবা মন্ত্রীর পরামর্শে তাঁদের গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে

পুরাণকার ভারতের একছত্র সম্রাট ভরতের মাতামহ যে সাধারণ কোন তপস্বী নন, তিনি গাধি রাজার পুত্র বিশ্বামিত্র এবং শকুন্তলা রাজকন্যা ছিলেন, এই কথা প্রচার করেছিলেন ভারতের গৌরব বৃদ্ধির জন্য। বিশ্বামিত্র যে শকুন্তলার জনক নন, তার আরও প্রমাণ আছে। তিনি হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের জন্ম ইক্ষ্বাকু বংশে। দুষ্মন্তের সময়ে এই বংশের রাজা ছিলেন ত্রসদস্যু। এঁর নবম পুরুষে হরিশ্চন্দ্র। কাজেই হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক বিশ্বামিত্র প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে শকুন্তলার জন্ম দিতে পারেন না।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে যে ভরত তেত্রিশ শো অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পৃথিবার সমস্ত রাজাকে বিস্মিত করেছিলেন। দিগ্‌বিজয়ের সময় তিনি কিরাত হূণ যবন পৌণ্ড্র কঙ্ক খশ শক ম্লেচ্ছ ও ব্রাহ্মণ বিরোধী রাজাদের বধ করেছিলেন।। তিনি সাতাশ হাজার বৎসর পৃথিবীর সকল দিকে সৈন্য চালনা করেছিলেন। ভরতের বিদর্ভ দেশীয় পত্নী ছিল। ভরত তাঁর পুত্রদের নিজের অনুরূপ না বলায় তাঁর পত্নীরা নিজেদের সতীত্বের প্রতি ভরতের সন্দেহ আছে ভেবে সন্তান জন্মাবার পরেই হত্যা করেছিলেন। বংশরক্ষার জন্য ভরত মরুৎস্তোম যজ্ঞ করেন। তাতে সন্তুষ্ট হয়ে মরুদ্‌গণ ভরদ্বাজকে তাঁর পুত্র রূপে অর্পণ করেন। তিনি উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এক নামের অনেক ব্যক্তি থাকলে এই রকমের বিপত্তি হয়। বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজের জন্ম চন্দ্রবংশের প্রথম পুরুষ বুধের জন্মেরও পূর্বে অর্থাৎ ৩৮০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দেরও পূর্বে। ৩৩৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পর তিনি এসে ভরতের পোষ্যপুত্র হতে পারেন না। ভরতের পত্নীরা তাঁদের সন্তানদের হত্যা করতেন এ কথাও সত্য বলে মনে হয় না। তাঁর কোন পুত্র সন্তান হয় নি বলেই তিনি মরুৎস্তোম যজ্ঞ করে ভরদ্বাজ নামের কোন ব্যক্তিকে দত্তক নিয়েছিলেন। তাঁর সময়ের মাগধ বা সূতদের অতিরঞ্জনের চেষ্টাও লক্ষণীয়। বলা হয়েছে যে

তেত্রিশ শো অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং সৈন্য চালনা করেছিলেন সাতাশ হাজার বৎসর। স্পষ্টতই এর অর্থ তেত্রিশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন তাঁর সাতাশ বৎসরের রাজত্বকালে। তিনি কোন ব্রাহ্মণ বিরোধী রাজাকে বধ করেছিলেন বলেই ব্রাহ্মণ পুরাণকার তাঁর সম্মানের জন্য শুধু তাঁকে নয়, তাঁর পিতামাতাকেও গৌরবান্বিত করবার সব রকম চেষ্টা করেছিলেন।

অনেকে মনে করেন যে প্রয়াগে ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। ভরদ্বাজ নামের ব্রাহ্মণরা পুরুষানুক্রমে এইখানেই বাস করতেন। এমনও হতে পারে যে ভরতের কোন পুত্র সন্তান ছিল না বলে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য ভরদ্বাজকে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তাতে ভবমন্যু নামে এক পুত্রের জন্ম হয় ও ভরতের মৃত্যুর পর এই পুত্রের নাবালক অবস্থায় ভরদ্বাজ কিছু দিন রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন। ভরদ্বাজ ঋষি ছিলেন, রাজা ছিলেন না।

সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু ও বিশ্বামিত্র

ভবমন্যুর পুত্র বৃহৎক্ষেত্র। তাঁর পুত্র হস্তী হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠাতা। এর পর পুরুবংশে যে প্রায় তিরিশ পুরুষের ছেদ আছে তা পূর্বেই বলা হয়েছে। ইক্ষ্বাকুবংশে কোন ছেদ নেই। মান্ধাতার পর দশম পুরুষে সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্র এই সত্যব্রতের পুত্র। হরিশ্চন্দ্রের কথা বলবার আগে সত্যব্রতের কথাও বলতে হয়। এই কাহিনী আছে দেবী ভাগবতে।

রাজা অরুণের পুত্র সত্যব্রত যথেচ্ছাচারী ছিলেন এবং এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে বিবাহের সময় হরণ করেন। ব্রাহ্মণদের অভিযোগ শুনে রাজা বললেন, তুমি চণ্ডালের কাজ করেছ, তুমি তাদের সঙ্গেই বাস কর। সত্যব্রত চণ্ডালদের সঙ্গেই কাল যাপন করতে লাগলেন। তাঁর নির্বাসন দণ্ডের সময় গুরু বশিষ্ঠ পিতাকে সমর্থন করার জন্য তিনি বশিষ্ঠের প্রতি রুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে সপ্তপদী

গমনের পরেই পাণিগ্রহণের মন্ত্র শেষ হয় এবং তার পূর্বে হরণ করলে দ্বিজপত্নী হরণ করা হয় না।

এক সময় অরুণ তাঁর পুরী ত্যাগ করে পুত্রের জন্য তপস্যা করতে বনে চলে গেলেন। এই অরাজক অবস্থায় বারো বৎসর রাজ্যে বর্ষণ হল না। বিশ্বামিত্র তখন স্ত্রীপুত্রকে রেখে কৌশিকী নদীর তটে তপস্যা করছিলেন। তাঁর পতিব্রতা স্ত্রী পুত্রদের ক্ষুধায় কাতর দেখে ভাবলেন, দেশে রাজা নেই, কার কাছে ভিক্ষা চাইব! এই ভেবে তাঁর অন্য সন্তানদের ভরণ পোষণের জন্য মধ্যম পুত্রকে বিক্রয় করতে তার গলায় দড়ি বেঁধে বেরিয়ে পড়লেন। সত্যব্রত তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, এই ছেলেটির গলায় দড়ি বেঁধে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? ঋষিপত্নী বললেন, রাজকুমার, আমি বিশ্বামিত্রের স্ত্রী। পতি আমাদের ত্যাগ করে তপস্যা করতে গেছেন। রাজ্যে রাজা নেই, আমার অন্নের সংস্থান নেই। তাই অন্য সন্তানদের ভরণ পোষণের জন্য আমি একে বিক্রয় করতে নিয়ে যাচ্ছি। সত্যব্রত বললেন, আপনার পতি যত দিন না ফেরেন, তত দিন আমি আহার্য জোগাব। আপনি এই অস্বাভাবিক কাজ করবেন না। ঋষিপত্নী এই আশ্বাস পেয়ে পুত্রের গলার বাঁধন খুলে দিয়ে গৃহে ফিরে গেলেন। পরবর্তী কালে এই বালকই গলায় বন্ধনের জন্য গালব নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর সত্যব্রতই বিশ্বামিত্রের পরিবারের ভার বহন করতে লাগলেন। তিনি বন্য হরিণ বরাহ ও মহিষ বধ করে সেই মাংস তাঁদের আশ্রমের একটি বৃক্ষে বেঁধে রেখে আসতেন। এক দিন তিনি অন্য কোন পশু না পেয়ে বনের মধ্যে বশিষ্ঠের একটি গাভী বধ করে নিজেও খেলেন এবং ঋষির পত্নীর জন্য রেখে এলেন। ঋষি পত্নী তা মৃগ মাংস ভেবে সন্তানদের খাওয়ালেন। কিন্তু বশিষ্ঠ এই কথা জানতে পেরে বললেন, তুমি পিশাচের মতো গো-বধ করেছ, পরস্ত্রীহরণ করেছ এবং পিতা তোমার উপরে রুষ্ট। এই তিন পাপে তোমার মাথায় তিনটি শঙ্কু চিহ্ন হবে। তোমার নাম হবে ত্রিশঙ্কু।

এর পর সত্যব্রত পরমা প্রকৃতি ভগবতা শিবার তপস্যায় নিরত হলেন।

বশিষ্ঠের অভিশাপে সত্যব্রত পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণদের অনুরোধ করলে তাঁরা বললেন, তুমি এখন যজ্ঞের অধিকারী নও। রাজপুত্র ভাবলেন, ধিক্ আমার জীবনে। এই ভেবে চিতার আগুনে প্রবেশ করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। তিনি যখন আগুন জ্বেলে মহামায়াকে স্মরণ করলেন, তখন দেবী আকাশ থেকে তাঁকে বললেন, দেহত্যাগ কোরো না। তোমার জরাগ্রস্ত পিতা তোমাকে রাজ্য পালনে নিযুক্ত করে তপস্যার জন্য বনে যাবেন। নারদ অযোধ্যায় গিয়ে রাজাকে এই কথা বললেন এবং রাজা পুত্রকে আনবার জন্য অমাত্যদের বনে পাঠালেন। অমাত্যরা গিয়ে রাজপুত্রকে অযোধ্যায় নিয়ে এলেন। জটাধারা মলিন বস্ত্র পরিহিত নিস্তেজ সত্যব্রতকে দেখে রাজা তাঁকে বুকে নিয়ে পাশে বসালেন এবং নীতিশাস্ত্রের উপদেশ দিলেন। তারপর শুভদিনে পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে সস্ত্রীক বাণপ্রস্থে গেলেন। যথাসময়ে তাঁদের স্বর্গলাভ হল।

এই কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে। তিনি গাধি নামে অমাবসুর বংশে রাজার পুত্র বলে পরিচিত। তপস্যা করে তিনি ব্রাহ্মণ হতে চেয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর স্ত্রী স্বামীর অবর্ত-মানে পুত্রকে বিক্রয় করতে চেয়েছিলেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। ঐতিহাসিক বিচারে কালেরও কিছু পার্থক্য আছে বলে মনে হয়। সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু যদি গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রের পরিবারের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন, তবে কার্তবীর্য অর্জুনের কালেরও হেরফের হবে অর্থাৎ তিনি বিশ্বামিত্রের প্রায় সমকালীন হবেন। অর্জুনের উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ মহিষ্মান মাহিষ্মতী নগর পত্তন করেছিলেন বলে মনে হয়। এই নগর তাঁদের রাজধানী ছিল। রাবণের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়েছিল। রাম যে রাবণ বধ করেছিলেন, এই রাবণ তাঁর অনেক

পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। এই রাবণের সময়ে গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রও ছিলেন, কিন্তু দশরথের পুত্র রাম থাকতে পারেন না। দশরথের জন্ম হরিশ্চন্দ্রের তেত্রিশ পুরুষ পরে, অর্থাৎ কালের ব্যবধানে প্রায় আটশো বৎসর পরে। ত্রেতাযুগ তখন শেষ হয়ে গেছে। অথচ আমরা জানি ও বিশ্বাস করি যে রাম ত্রেতা যুগেই বর্তমান ছিলেন এবং রামায়ণের কাহিনী ত্রেতাযুগের। এ যে ভুল তাতে কোন সংশয় নেই। সূর্যবংশে কোন ছেদ নেই বলে কতকটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে রামের কাল ২১২৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ এবং ত্রেতাযুগের অবসান ২৪৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে।

আরও একটি তথ্য তাৎপর্যপূর্ণ। গাধির পুত্র বিশ্বামিত্রের পর এই বংশের আর কোন নাম পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বামিত্রের পরই অমাবসু বংশের শেষ। ভীম নামে কোন ব্যক্তি দাবী করেছিলেন যে তিনি অমাবসুর পুত্র বা বংশধর। তাঁর পৌত্র সুহোত্র। সুহোত্রের পুত্র জহ্নু, তিনি যৌবনাশ্বের পৌত্রীকে বিবাহ করেছিলেন বলে জানা যায়। এই বংশেই কুশ, কুশাশ্ব ও গাধির জন্ম। জহ্নু রাজর্ষি ছিলেন, অর্থাৎ রাজা হলেও ঋষির জীবন যাপন করেছিলেন। এর অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। সেকালে রাজবংশের পুত্ররাও রাজা বলে পরিচিত হতেন কিনা জানা যায় না। সামান্য জমি জমা থাকলেই হয়তো রাজা বলা হত। যদি তাই হয় তবে গাধি এই রকমের কোন রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র বিশ্বামিত্র তপস্বীর জীবন যাপন করেছিলেন। কিন্তু সমাজে তখন বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত হয়েছিল বলে তাঁকে ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়েছিল। অযোধ্যাপতির কুলগুরু বশিষ্ঠই বোধহয় সমাজপতি ছিলেন এবং তাঁর সমর্থনের প্রয়োজন ছিল এবং এই নিয়েই বশিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের শত্রুতা। বিশ্বামিত্রের সম্বন্ধে প্রচলিত নানা কাহিনী বিচার করে মেনে নেওয়া যায় যে গাধির পুত্র বিশ্বামিত্রই অযোধ্যার নিকটে তাঁর স্ত্রীপুত্রদের রেখে কৌশিকী নদীর তীরে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন এবং সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু এই

সময়েই তাঁর পরিবারের ভরণ পোষণ করতেন। এই জন্যই তিনি বিশ্বামিত্রের প্রিয় পাত্র হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁব পুত্র হরিশ্চন্দ্র হয়েছিলেন তাঁর বিষম বিরাগভাজন।

ত্রিশঙ্কু তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে মনুষ্যদেহে স্বর্গ ভোগের ইচ্ছায় বশিষ্ঠের নিকটে গিয়ে বললেন, আপনি এমন যাগ করুন যাতে আমি পার্থিব শরীরেই স্বর্গে বাস করতে পারি। বশিষ্ঠ বললেন, মনুষ্যদেহে তা অসম্ভব। মানুষ মরবার পরে তার পুণ্য কর্মের ফলে স্বর্গ লাভ করে, কাজেই তুমি এই দুর্লভ বাসনা ত্যাগ কর। রাজা বিষণ্ণ হয়ে ভাবলেন যে অতীতে অনেক অবৈধ কাজ করার জন্যই বোধ হয় তিনি এই কথা বলছেন। তাই বললেন, আপনি যদি অহঙ্কারের বশে এই যজ্ঞ না করেন, তবে অগত্যা আমাকে অন্য পুরোহিত নিয়ে যজ্ঞ করতে হবে। রাজার এই কথায় বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, এই মুহূর্তে তুমি চণ্ডাল হও। এই কথা বলাব সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালের আকৃতি হল এবং নিজের এই নিন্দনীয় দেহ দেখে তিনি গৃহে না ফিরে বনে চলে গেলেন। আত্মহত্যা করলে পরজন্মেও চণ্ডাল হতে হবে বলে তিনি পুণ্য কর্ম করে পাপ ক্ষয় করবার জন্য গঙ্গার তীরে বাস কবতে লাগলেন। পিতার অভিশাপের কথা জানতে পেরে হরিশ্চন্দ্র তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য অমাত্যদের পাঠালেন। কিন্তু ত্রিশঙ্কু তাঁদের বললেন, আমি এই চণ্ডাল বেশে অযোধ্যায় ফিরতে চাই না, আপনারা হরিশ্চন্দ্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য পালন করুন। অমাত্যরা ফিরে এসে হবিশ্চন্দ্রকে রাজ্যে অভিষেক করলেন।

এ দিকে বিশ্বামিত্র গৃহে ফিরে স্ত্রী ও অপত্যদের নিরাপদ দেখে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, দুর্ভিক্ষের সময়ে তুমি কী ভাবে সন্তানদের পালন করলে? আমি ফিরে এসে কী করব, তা ভেবে না পেয়েই আমি আসি নি। এক দিন ক্ষুধার তাড়নায় আমি চোরের মতো এক চণ্ডালের গৃহে প্রবেশ করেছিলাম। তার পাকশালায় ঢুকে

রন্ধন করা কুকুরের মাংস খাবার উপক্রম করতেই চণ্ডালের দৃষ্টি পথে পড়ে গেলাম। তার প্রশ্নের উত্তরে বললাম, ক্ষুধার তাড়নায় চোরের মতো এসেছি, কিন্তু আমি তোমার অতিথি। তুমি অনুমতি দিলে আমি এই মাংস খাব। কিন্তু চণ্ডাল বলল, এটা চণ্ডালের গৃহ, এখানে আপনি কিছু খাবেন না। আমি লোভের জন্য এ কথা বলছি না, আপনার যাতে দোষ না হয়, সেই জন্যই নিষেধ করছি। আমি তাকে বললাম, শরার রক্ষার জন্য পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করলেই চলে। অনাহারে মরলেও নরকে গতি। আমি চৌর্যবৃত্তি করে দেহ রক্ষা করতে চাই। এর ফলেই আকাশে মেঘ হবে। তার পরেই বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলে আনন্দে সেই গৃহ ত্যাগ করলাম। এই বারে তুমি বল, কী ভাবে তুমি এই অরণ্যে বাস করেছ? তাঁর স্ত্রী বললেন, তুমি চলে যাবার পরেই দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হল। প্রথমে নীবারের আশায় বনে বনে ঘুরে কিছু ফল পেয়েছিলাম। নীবারে কয়েক মাস চলে। তারপর নীবার ফুরিয়ে গেল। বৃক্ষে ফল নেই, কোন মূলও পাওয়া গেল না। সন্তানরা যখন ক্ষুধায় কাঁদছে, তখন একটি সন্তানকে বিক্রয় করতে বেরোলাম। পথে সত্যব্রত আমাকে দেখে সব কথা জেনে বললেন, যত দিন মুনি না ফেরেন, তত দিন আমি প্রত্যহ আপনাকে আমিষ দ্রব্য দিয়ে যাব। তাঁর দেওয়া মাংসেই আমি সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছি। আমার জন্যই বশিষ্ঠ তাঁকে শাপ দিয়েছেন। এক দিন অরণ্যে মাংস না পেয়ে তিনি বশিষ্ঠের কামধেনু বধ করেছিলেন। আমার জন্যই ঐ রাজপুত্র চণ্ডালে পরিণত হয়েছেন। তাঁকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করা তোমার কর্তব্য। বিশ্বামিত্র বললেন, আমি তাঁকে শাপমুক্ত করব, বিদ্যা বা তপস্যার বলে আমি তাঁর দুঃখ মোচন করব। তারপর তিনি ত্রিশঙ্কুর নিকট গেলেন।

ত্রিশঙ্কু তাঁকে প্রণাম করলে বিশ্বামিত্র বললেন, আমার জন্যই তুমি অভিশপ্ত হয়েছ, আমি তোমার কী উপকার করতে পারি বল। ত্রিশঙ্কু

বললেন, আমি বশিষ্ঠের নিকটে গিয়ে অনুরোধ করেছিলাম যজ্ঞ করে সশরীরে আমার ইন্দ্রলোকে যাবার ব্যবস্থা করতে। তিনি বললেন, মানব দেহে স্বর্গ বাস সম্ভব নয়। আমি অন্য পুরোহিত বরণ করে যজ্ঞ করব বলতে তিনি আমাকে শাপ দিয়ে চণ্ডালে পরিণত করেছেন। আপনি কি আমার দুঃখ দূর করতে পারবেন? রাজার কথা শুনে বিশ্বামিত্র শাপ মোচনের পথ ভাবতে লাগলেন এবং যজ্ঞ করবেন বলে স্থির করে মুনিদের নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ এই যজ্ঞ অনুমোদন করলেন না বলে কেউ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন না। বিশ্বামিত্র দুঃখিত হয়ে রাজার আশ্রমে এসে বললেন, বশিষ্ঠের অনুমোদন পাওয়া যায় নি বলে কোন ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞে এলেন না। এইবারে আমার তপস্যার প্রভাব দেখ। আমি তোমাকে দেবলোকে পাঠাচ্ছি। বলে জল হাতে নিয়ে গায়ত্রী জপ করে তাঁর অর্জিত পুণ্যফল রাজাকে দান করলেন। বললেন, এইবারে তুমি দেবলোকে যাও। এই কথা বলতেই ত্রিশঙ্কু পাখীর মতো আকাশে উড্ডীন হলেন। ইন্দ্রলোকের নিকটস্থ হতেই দেবতারা ইন্দ্রকে খবর দিলেন। ইন্দ্র এসে বললেন, তুমি ঘৃণিত চণ্ডাল, তোমার থাকবার যোগ্য স্থান এখানে নেই। তুমি ফিরে যাও। এ কথা বলতেই ত্রিশঙ্কু স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধোগামী হলেন। রাজা বিলাপ করে উঠলেন, আমাকে রক্ষা করুন। বিশ্বামিত্র বলে উঠলেন, ঐখানে থাক। বলে দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। ইন্দ্র এই উদ্যমের কথা বিদিত হয়ে সহসা এসে বললেন, পৃথক সৃষ্টির কোন প্রয়োজন নেই। ত্রিশঙ্কুকে আমি স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছি। বলে তাঁকে দিব্য দেহ দিয়ে বিমানে নিজের পুরীতে নিয়ে গেলেন।

এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে সেকালের একটি সমাজ চিত্র ফুটে ওঠে। পশুর মাংসের কোন বাছ বিচার ছিল না। মৃগ বরাহ ও মহিষের মাংস খাওয়া হত, তা না জুটলে গো-মাংস খেতেও আপত্তি ছিল না। গোবধ করে গোমাংস খাবার জন্য সত্যব্রতকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়

নি, বিশ্বামিত্রের স্ত্রী পুত্রেরও জাত যায় নি। বিশ্বামিত্র নিজে চণ্ডালের গৃহে প্রবেশ করে কুকুরের মাংস খেতে উদ্যত হয়েছিলেন। বলেছিলেন যে জীবন ধারণের জন্য কোন কাজই নিন্দনীয় নয়। প্রায়শ্চিত্ত করলেই সব দোষ নষ্ট হয়। কিন্তু বশিষ্ঠের শাপে ত্রিশঙ্কু মুহূর্ত মধ্যে চণ্ডালে পরিণত হলেন, এর অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। যারা শ্মশানে শব দেহের কাজ করে, তারাই চণ্ডাল। কিন্তু ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল হয়ে গঙ্গার তীরে পুণ্য করে পাপ ক্ষয় করতে লাগলেন। যে সমাজে বৃত্তি দিয়ে জাতি বিচার হত, সেই সমাজেই ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালে পরিণত হবার ঘটনা সত্যই দুর্বোধ্য। তাঁর সশরীরে স্বর্গে যাবার ব্যাপারটা তেমন অস্পষ্ট নয়। দেখা যাচ্ছে যে প্রায় চার পাঁচশো বৎসরের ব্যবধানেই স্বর্গ বা ইলাবৃত বর্ষ মৃত্যুর পর পুণ্যবানের বাসস্থানে পরিণত হয়েছিল এবং সকলেই বিশ্বাস করতেন যে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ যে ভুল ধারণা বিশ্বামিত্র তা জানতেন। তাই তিনি ত্রিশঙ্কুর স্বর্গে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মনে হয় যে কোন কারণে ত্রিশঙ্কু স্বর্গে পেঁ ৗছতে পারেন নি এবং পথের শেষে পৌছে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তাই তিনি দিব্য দেহে স্বর্গে পেঁ ৗছেছেন বলা হয়েছে। স্বর্গ যে মানুষের একটি তীর্থস্থান তা বহু বৎসর পরে পাণ্ডবরাও মানতেন। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে বাণপ্রস্থে যাবার সময় এলে তাঁরা মহাপ্রস্থানের পথে স্বর্গে যাত্রা করেছিলেন। সে চতুর্দশ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কিছু পূর্বের ঘটনা, অর্থাৎ তিন হাজার চার শো বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠিরাদি স্বর্গ যাত্রা করেছিলেন হিমালয় পেরিয়ে।

হরিশ্চন্দ্র

হরিশ্চন্দ্র পিতার স্বর্গলাভের কথা শুনে হৃষ্ট চিত্তে প্রজাপালন করতে লাগলেন। কিন্তু বহু দিন গত হবার পরেও তাঁর কোন সন্তান হল না। তিনি বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে তাঁর দুঃখের কথা নিবেদন করলেন। বশিষ্ঠ বললেন, বরুণ সন্তানদায়ক দেবতা, তাঁর আরাধনা

কর। গুরুর কথায় রাজা গঙ্গার তীরে গিয়ে একাগ্র চিত্তে বরুণের তপস্যায় মগ্ন হলেন। বরুণ দেখা দিয়ে বললেন, আমি তুষ্ট হয়েছি, তুমি বর নাও। হরিশ্চন্দ্র বললেন, ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধের জন্য আমাকে একটি পুত্র দিন। বরুণ বললেন, যদি তুমি তোমার পুত্রকে পশু করে যজ্ঞ করতে পার, তবেই তোমাকে আমি এই বর দেব। রাজা বললেন, আমার বন্ধ্যাত্ব দোষ নাশ হোক। আমি সত্য বলছি, আমার পুত্র হলে তাকে পশু কল্পনা করে আমি যজ্ঞ করব। বরুণ বললেন, তোমার পুত্র হবে, তুমি গৃহে ফিরে যাও।

রাজা ফিরে গিয়ে তাঁর রাণীদের এই কথা বললেন। তাঁর একশো রাণীর মধ্যে শৈব্যা ছিলেন পাটরাণী। তিনি সন্তানসম্ভবা হলেন এবং শুভদিনে তাঁর একটি পুত্র হল। রাজপুরীতে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হতেই ব্রাহ্মণের বেশে বরুণ এসে রাজাকে বললেন, আমার কথায় তোমার পুত্র হয়েছে, এইবারে ঐ শিশুকে দিয়ে আমার যজ্ঞ কর। রাজা ভাবলেন, কোন্ প্রাণে আমি এই শিশুকে বধ করব! তাই বললেন, সন্তানের জন্মের পর মাতার দেহ এক মাস অশুদ্ধ থাকে। বেদে সস্ত্রীক ধর্মাচরণের বিধান। এই সময়টা আপনি কৃপা করুন। বরুণ বললেন, বেশ, আমি মাসান্তেই আসব, নবজাত পুত্রের সমস্ত সংস্কার শেষ করেই যজ্ঞ কোরো। রাজা আনন্দিত হয়ে প্রচুর দান করে পুত্রের নাম রাখলেন রোহিতাশ্ব।

এক মাস পূর্ণ হলে বরুণ আবার রাজার নিকটে এসে বললেন, এখনই যজ্ঞ আরম্ভ কর। রাজা শোক সাগরে নিমগ্ন হয়ে বললেন, দাঁত না বেরোলে পশু যজ্ঞের যোগ্য হয় না, তাই শিশুর দাঁত বেরোলে আমি যজ্ঞ আরম্ভ করব। 'বেশ' বলে বরুণ ফিরে গেলেন এবং দাঁত বেরিয়েছে বুঝে পুনরায় এসে বললেন, এইবারে প্রতিশ্রুত কাজ কর। রাজা সাদরে তাঁর পূজা করে বললেন, আমি শুনেছি যে চূড়াকরণের পরেই পশু যজ্ঞের উপযুক্ত হয়। বরুণ বললেন, এই সমস্ত কথা বলে তুমি বার বার আমাকে প্রতারণা করছ। পুত্র স্নেহের জন্যই যে তুমি

প্রতারণা করছ, তা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু তোমাকে বলে যাচ্ছি, চূড়াকরণের পর যজ্ঞ না করলে আমি তোমাকে শাপ দেব। বলে তিনি চলে গেলেন এবং চূড়াকরণের সময় আবার উপস্থিত হয়ে বললেন, এইবারে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হও। রাজা তাঁকে দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে বললেন, ক্ষত্রিয় সন্তান একাদশ বর্ষে উপনয়নের পরেই দ্বিজ হয়। তখন আমি সংস্কৃত পশু দিয়ে যজ্ঞ করতে পারব। বরুণ বললেন, বেশ, তাই কোরো। বলে তিনি চলে গেলেন।

এই ভাবে রাজপুত্রের একাদশ বর্ষে রাজা উপনয়নের আয়োজন করলেন এবং উপনয়নের সময়েই বরুণ আবার ব্রাহ্মণের বেশে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখেই রাজা প্রণাম করে বললেন, প্রভু, উপনয়ন সংস্কারের পর এ যজ্ঞের পশুর যোগ্য হয়েছে। আমি প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞ করব। যত দিন সমাবর্তন না হচ্ছে, তত দিন আপনি অপেক্ষা করুন। বরুণ বললেন, রাজা, তুমি নানা যুক্তি উদ্ভাবন করে আমাকে প্রতারণা করছ। তোমার কথামতো আজ যাচ্ছি। সমাবর্তন কালে আবার আসব। এই বলে বরুণ চলে গেলেন। রাজপুত্র পিতাকে চিন্তিত দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে নিজের বিনাশের কথা জানতে পারলেন। তিনি মন্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করে বনে পালিয়ে গেলেন এবং রাজা তাঁর অন্বেষণের জন্য চর নিয়োগ করলেন।

কিছুকাল পরে বরুণ এসে রাজাকে বললেন, যজ্ঞের ব্যবস্থা কর। রাজা বললেন, আমার পুত্র ভয় পেয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে তা জানি না। আমি কী করব বলুন। বরুণ রুষ্ট হয়ে শাপ দিলেন, তুমি কথায় আমাকে বার বার প্রতারণা করেছ। তুমি জলোদর ব্যাধিতে কষ্ট পাবে। এই শাপ দিয়ে বরুণ চলে গেলেন এবং রাজা ব্যাধিগ্রস্ত হলেন।

এদিকে অরণ্যে রাজপুত্র রোগে পিতার কষ্টের কথা জেনে রাজপুরীতে ফিরবেন বলে স্থির করলেন। এই খবর পেয়ে ইন্দ্র ব্রাহ্মণের

বেশে তাঁর কাছে এসে বললেন, তুমি রাজনীতিতে অজ্ঞ, তাই বাড়ি ফিরবে ভাবছ। তোমার পিতা যজ্ঞ করে নিজে রোগমুক্ত হবেন। কিন্তু আত্মা সব প্রাণীর সমান প্রিয়, এই আত্মার জন্যই স্ত্রী পুত্র ও ধন-রত্ন প্রিয় হয়ে থাকে। তাই তোমার এখন ফেরা উচিত হবে না। পিতা স্বর্গত হলে তুমি রাজ্য পালনের জন্য ফিরে যেও। ইন্দ্রের নিষেধে রাজপুত্র আরও এক বৎসর বনে কাটালেন। তারপর পিতার মৃত্যু অবধারিত জেনে যাবার জন্য আবার স্থির করলেন। এবারেও ইন্দ্র এসে তাঁকে নিবারণ করলেন।

হরিশ্চন্দ্র বশিষ্ঠের নিকটে নিরোগ হবার উপায় জানতে চাইলেন। বশিষ্ঠ বললেন, শাপ মোচনের জন্য তুমি পুত্র ক্রয় করে যজ্ঞ কর। পুত্র দশবিধ। লোভের বশে কোন দ্বিজ পুত্র বিক্রয় করতে পারেন। এই কথায় রাজা তাঁর মুখ্য সচিবকে পুত্রের জন্য পাঠালেন। অজীগর্ত নামে এক দরিদ্র দ্বিজের শুনঃপুচ্ছ শুনঃশেফ ও শুনোলাঙ্গুল নামে তিন পুত্র ছিল। মুখ্য সচিব তাঁকে বললেন, আপনি একশো গরুর বিনিময়ে একটি পুত্র দিন। জ্যেষ্ঠ পুত্র পিণ্ডদানের অধিকারী, কনিষ্ঠ মাতার প্রিয়। তাই দ্বিতীয় পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করে রাজা নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে বালক রোদন করতে থাকলে মুনিরা আর্তনাদ করে উঠলেন। শমিতা অর্থাৎ ঘাতক অস্ত্র গ্রহণে বিমুখ হয়ে বলল, লোভ পরায়ণ হয়ে আমি এই ক্রন্দনরত ব্রাহ্মণ বালককে বধ করতে পারব না। রাজা বললেন, এখন তাহলে কী করা যায়? শুনঃশেফের ক্রন্দন শুনে জনগণ তুমুল আন্দোলন শুরু করলে সভায় গোলমালের সৃষ্টি হল। তখন অজীগর্ত বললেন, আমাকে দ্বিগুণ ধন দিলে আমি আপনার কাজ করব। হরিশ্চন্দ্র বললেন, আমি আপনাকে আরও একশো গো দান করছি। এর পর পিতা পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন দেখে সভায় সকলে হায় হায় করে উঠলেন। বললেন, এ রকম পাপী আমরা দেখি নি। ইনি ব্রাহ্মণের বেশে কোন পিশাচ। বেদে আছে যে আত্মাই অঙ্গ থেকে

সন্তান রূপে জন্ম গ্রহণ করে। ইনি নিজের আত্মাকেই হত্যা করছেন।

এই সময়ে বিশ্বামিত্র রাজার নিকটে এসে বললেন, একে পরিত্যাগ করলে তোমার যজ্ঞ ও রোগ নাশ দুইই হবে। দয়ার মতো পুণ্য ও হিংসার মতো পাপ নেই। পশু হিংসা বিষয়ানুরাগীর জন্যই বিহিত হয়েছে। নিজের মঙ্গল চাইলে নিজের দেহরক্ষার জন্য অপরের দেহ ছেদন করা যুক্তিযুক্ত নয়। সর্ব জীবে সমান দয়া থাকলেই জগদীশ্বর সন্তুষ্ট হন। আমার কথায় তুমি একে মুক্তি দাও। হরিশ্চন্দ্র বললেন, জলোদর ব্যাধিতে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি। আপনি আমাকে বাধা দেবেন না, আপনি অন্য কিছু বলুন। বিশ্বামিত্র অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে কাতর শুনঃশেফকে বললেন, বৎস, আমি তোমাকে বরুণ মন্ত্র দিচ্ছি। তুমি মনে মনে এই মন্ত্র জপ কর, তোমার মঙ্গল হবে। শুনঃশেফ এই মন্ত্র জপ করতে আরম্ভ করলে বরুণ তার নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। সকলেই বিস্ময়াপন্ন হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। হরিশ্চন্দ্র বললেন, আমার পুত্র কোথায় গেছে তা জানি না। তাই এই বালককে ক্রয় করে যজ্ঞ করছি। আপনি সন্তুষ্ট হলে আমার কষ্ট দূর হবে। বরুণ বললেন, এই বালক কাতর ভাবে আমার স্তব করছে। তুমি একে মুক্তি দাও। তোমার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়েছে, তুমি রোগ মুক্ত হবে। এ কথা বলতেই রাজা রোগমুক্ত হলেন এবং শুনঃশেফ মুক্ত হয়ে বললেন, এই বারে আপনারা বলুন, আমি কার পুত্র? সভ্যরা ভাবলেন, ইনি অজীগর্তের পুত্র। কিন্তু বামদেব বললেন, অজীগর্ত এঁকে রাজার নিকটে বিক্রয় করেছেন, তাই ইনি রাজার পুত্র, কিংবা বরুণ পাশ মুক্ত করেছেন বলে তাঁরই পুত্র। কারণ অন্নদাতা ভয়ত্রাতা বিদ্যাদাতা বিত্তদাতা ও জন্মদাতা এই পাঁচজনই পিতা। এই নিয়ে বাদানুবাদ আরম্ভ হলে বশিষ্ঠ বললেন, পিতা বিক্রয় করেছেন বলে ইনি তাঁর পুত্র নন, ক্রীত সন্তান রাজা যূপে বন্ধন করেছেন বলে ইনি তাঁরও সন্তান নন। বরুণ

এঁকে মুক্তি দিয়েছেন বলে ইনি বরুণেরও পুত্র হতে পারেন না। কিন্তু বিশ্বামিত্র এঁকে বরুণ মন্ত্র দিয়ে রক্ষা করেছেন বলে ইনি এখন তাঁরই পুত্র। এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের হাত ধরে তাঁকে নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন। রাজপুত্র রোহিতও এই খবর পেয়ে বন থেকে রাজপুরীতে ফিরে এলেন।

এই কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করার একটা উদ্দেশ্য আছে। এতে সে যুগের একটা সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে। আমরা মনে করি যে কিছু দিন পূর্বেও এ দেশে নরবলির প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই বর্ণনা পড়ে মনে হয় যে তা নয়। হরিশ্চন্দ্রের আমলেও নরবলি নিন্দিত ছিল। বরুণের আরাধনা করে হরিশ্চন্দ্র পুত্র লাভ করেছিলেন, এই বিশ্বাস দেখে বোঝা যায় যে তাঁর সময়ে দেবতারা দিবি আরোহণ করেছেন, অর্থাৎ মানুষ দেবতা জাতি দিব্য দেবতায় পরিণত হয়েছেন। বরুণ নিশ্চয়ই হরিশ্চন্দ্রকে পুত্রমেধ যজ্ঞ করতে বলেন নি, বলেছিলেন সে যুগের কোন ব্রাহ্মণ যাজ্ঞিক। কিংবা হরিশ্চন্দ্র জলোদর রোগে আক্রান্ত হওয়াতে কেউ তার প্রতিবিধানার্থ বরুণ যজ্ঞের পরামর্শ দিয়েছিলেন। জলাধিপতি বরুণ, তাই জলোদর রোগ নিরাময়ের জন্য বরুণ যজ্ঞের ব্যবস্থা। এই যজ্ঞে নরবলি দেবার কথা ছিল বলেই রাজা একজন ব্রাহ্মণ বালক ক্রয় করেছিলেন এবং এই বলি দানের সমর্থনেই বলা হয়েছিল যে বরুণ নিজেই রাজার কাছে এসে বার বার এই কথা বলেছেন। এক সময়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলেই এই নরবলির প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার দরকার হয় নি। দেখা যাচ্ছে, রাজার ঘাতক প্রথমেই আপত্তি করেছিল, তারপর আন্দোলন করেছিল উপস্থিত জনগণ। রাজার কথায় তারা স্তব্ধ হলেও বলিদান সম্ভব হয় নি। বিশ্বামিত্র এসে বুঝিয়ে দিলেন, মিথ্যা সংস্কারের বশে একজনের প্রাণ-নাশ করে নিজের মঙ্গল হবে না। মনে হয় তিনিই ব্যাধি নিরাময়ের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন।

এই কাহিনীর দ্বারা এও বোঝানো হয়েছে যে জন্মদাতাই পিতা হয় না, যিনি পালন করেন তিনিই প্রকৃত পিতা। আরও একটি কথা জানা যায় যে এই নৃশংস কাজের উদ্যোগ করেই হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু দেবী ভাগবতে অন্য কারণ বলা হয়েছে। এক দিন ইন্দ্রের সভায় বশিষ্ঠের সম্মান দেখে বিশ্বামিত্র বিস্মিত হয়ে বললেন, এ রকম পূজা আপনি কোথায় পেলেন? বশিষ্ঠ বললেন, আমার যজমান হরিশ্চন্দ্র আমাকে প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে রাজসূয় যজ্ঞ করেছেন। এমন সত্যবাদী ধর্মপরায়ণ রাজা আর নেই। কোপন স্বভাব বিশ্বামিত্র বললেন, হরিশ্চন্দ্র বরুণের নিকটে বর নিয়ে তাঁকেই প্রবঞ্চনা করেছেন। তিনি মিথ্যাবাদী ও কপটতাপ্রিয়। আপনি তাঁর প্রশংসা করছেন! আমি আমার আজন্ম অধ্যয়ন ও তপস্যার পণ রাখছি। আমি যদি তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে না পারি তো আমার সঞ্চিত সমস্ত পুণ্য নষ্ট হবে। তাঁরা পরস্পর বিবাদ করে নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে এলেন।

এইখানে বলা ভাল যে হরিশ্চন্দ্রের পিতা ত্রিশঙ্কুকে বশিষ্ঠ বলেছিলেন যে জীবিত অবস্থায় স্বর্গে যাওয়া সম্ভব নয় এবং বিশ্বামিত্র তা সম্ভব করার চেষ্টা করে সফল হতে পারেন নি। কাজেই মনে হচ্ছে যে এই ইন্দ্রের সভা স্বর্গে ছিল না। এ ঘটনা এ দেশেরই কোন রাজার সভায় ঘটেছিল।

এক দিন হরিশ্চন্দ্র বনে মৃগয়া করতে এসে একটি সুন্দরা নারীকে ক্রন্দন করতে দেখলেন। তিনি তার কারণ জানতে চাইলে নারী বললেন, আমাকে পাবার জন্য বিশ্বামিত্র ভয়ঙ্কর তপস্যা করছেন। রাজা বললেন, আপনি ধৈর্য ধরুন, আমি মুনিকে নিষেধ করছি। এই বলে রাজা বিশ্বামিত্রের নিকটে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, আপনি এই তপস্যা থেকে বিরত হন। এই বলে তাঁকে নিবারণ করে রাজা গৃহে ফিরলেন এবং বিশ্বামিত্র তাঁর আশ্রমে ফিরে ভাবলেন,

হরিশ্চন্দ্র ধার্মিক হলে আমাকে তপস্যায় বাধা দিলেন কেন! মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হলেন।

তারপব তিনি এক দানবকে হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীতে পাঠিয়ে সুকৌশলে তাঁকে ভুলিয়ে বনের মধ্যে আনলেন এবং গান্ধর্বী মায়ায় এক পুত্র কন্যা সৃষ্টি করে তাদের বিবাহের জন্য ধন চাইলেন। রাজা যখন অগ্নিশালায় উপস্থিত, তখন বিশ্বামিত্র বললেন, আমার অভীষ্ট আপনি বেদীতে দিন। রাজা বললেন, কী দিতে হবে বলুন। বিশ্বামিত্র বললেন, আপনার রাজ্য। রাজা নির্বিচারে বললেন, আমি এই রাজ্য দান করলাম। বিশ্বামিত্র বললেন, আমি এই দান গ্রহণ করলাম। এবারে দানের যোগ্য দক্ষিণা দিন। মনু বলেছেন যে দক্ষিণা না দিলে দান নিষ্ফল। রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, কী পরিমাণ ধন দিতে হবে বলুন। বিশ্বামিত্র বললেন, আড়াই ভার সোনা। রাজা বললেন, তাই দেব। রাজধানীতে ফিরে রাজা ভাবলেন, আমাব বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছিল, তাই মুনির কপটতা বুঝতে না পেরে প্রতারিত হয়েছি। প্রভাতেই বিশ্বামিত্র এসে উপস্থিত হলেন এবং রাজাকে বললেন, আপনি ‘স্বরাজ্য পরিত্যাগ করুন এবং প্রতিশ্রুত সোনা দক্ষিণা দিন। হরিশ্চন্দ্র বললেন, আমি আপনাকে রাজ্য দিয়েছি, নিশ্চয়ই অন্যত্র চলে যাব। কিন্তু বিধি মতে আপনাকে সর্বস্ব দিয়েছি বলে দক্ষিণা দিতে অক্ষম। যদি পুনরায় ধনাগম হয়, তবেই দক্ষিণা দেব। এই বলে তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে বারাণসীতে এলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই কাহিনী কিছু অন্য রকম। অরণ্যে বিশ্বামিত্র ভবাদি বিদ্যার সাধনা করছিলেন। সেই সময়ে বিঘ্নরাজ হরিশ্চন্দ্রের দেহে প্রবেশ করে কটূক্তির দ্বারা বিশ্বামিত্রের ক্রোধ সঞ্চার করলেন। তাতে বিদ্যারা রক্ষা পেলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রকে শান্ত করবার জন্য হরিশ্চন্দ্র দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। রাজ্য দান করে বিদায় নেবার সময় বললেন, এক মাসের মধ্যে দক্ষিণা দেব।

তারপর সত্য রক্ষার জন্য বারাণসীতে তিনি স্ত্রী পুত্র বিক্রয় করলেন। কিন্তু সেই ধনে বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট না হয়ে এক চণ্ডালের নিকটে নিজেকে বিক্রয় করতে বললেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁর দু পা জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি আপনার দাস, আপনি প্রসন্ন হন। ঋষি বললেন, তুমি আমার দাস হলে বলে আমি চণ্ডালের নিকটে তোমাকে বিক্রয় করলাম। এর পরের ঘটনা মর্মান্তিক। হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের দাস হয়ে শ্মশানে কাজ করছেন। এক দিন তাঁর পুত্র রোহিত সর্পাঘাতে নিহত হল। তাঁর স্ত্রী শৈব্যা এলেন পুত্রকে কোলে নিয়ে। কিন্তু পরস্পরকে তাঁরা চিনতে পারলেন না। অবশেষে শৈব্যার বিলাপ শুনে হরিশ্চন্দ্র সব বুঝতে পারলেন। পুত্রের সঙ্গে চিতার আগুনে তাঁরা পুড়ে মরবেন বলে যখন স্থির করেছেন, তখন ধর্ম ও ইন্দ্রের সঙ্গে এলেন বিশ্বামিত্র। ইন্দ্র তাঁদের স্বর্গে নিয়ে গেলেন এবং মৃত রোহিতকে জীবিত করে তাঁকে অযোধ্যার রাজা করলেন।

এই কাহিনীর সত্য মূল্য যাচাই করার প্রয়োজন নেই। হরিশ্চন্দ্রের পর তাঁর পুত্রই রাজা হয়েছিলেন, ইতিহাসের প্রয়োজনে এইটুকুই জানা দরকার। হরিশ্চন্দ্র যে খুবই ধার্মিক ছিলেন এবং সত্য রক্ষার জন্য রাজত্ব দান করে বারাণসীর শ্মশানে চণ্ডালের কাজ করেছিলেন, তা সত্য হতে পারে। বারাণসীতে হরিশ্চন্দ্রের নামে ঘাট আছে। সেটি শ্মশান ঘাট। এর পিছনে সত্য থাকা অসম্ভব নয়। তাই মনে হয় যে সত্য রক্ষা সে যুগের মানুষের কাছে কত মূল্যবান ছিল। প্রতারিত হয়েও মানুষ সত্য ভঙ্গ করতে সাহস পেত না। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানে ঋষির নিষ্ঠুরতার চেয়ে সত্যের মর্যাদাই বেশি ফুটে উঠেছে।

জমদগ্নি, কার্তবীর্য অর্জুন ও পরশুরাম

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিশ্বামিত্র ছিলেন গাধি রাজার পুত্র। তাঁর তিনি বেশি বয়সের সন্তান। সত্যবতী নামে এক কন্যা হয়েছিল, কিন্তু কোন পুত্র সন্তান ছিল না। ঋচীক নামে ভৃগু বংশ জাত এক ব্রাহ্মণ এসে সত্যবতীকে বিবাহ করতে চাইলে গাধী পণ রূপে এক হাজার অশ্ব দাবী করেন। ঋচীক বরুণের নিকট থেকে এই অশ্ব এনে সত্যবতীকে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রী ও শ্বশ্রূ উভয়েই পুত্র সন্তান কামনা করলে তিনি দুজনের জন্য চরু প্রস্তুত করেন। তারপর এটি তোমার ও অপরটি তোমার মাতার উপযোগী, এই বলে তিনি বনে গেলেন। কিন্তু চরু সেবন কালে সত্যবতীর জননী বললেন, সকলেই তো নিজের জন্য অতি গুণবান পুত্র চায়, তাই তোমার চরু আমাকে দাও, ও আমারটি তুমি খাও। তা ছাড়া আমার পুত্রকে তো পৃথিবী পালন করতে হবে, আর ব্রাহ্মণের বলবীর্য সম্পত্তির কী প্রয়োজন! জননীর কথায় সত্যবতী নিজের চরু মাকে দিয়ে মায়ের চরু নিজে খেলেন।

বন থেকে ফিরে এসে ঋচীক সত্যবতাকে দেখে বললেন, এ তুমি কী অকাজ করেছ! তোমার শরীরে রুদ্র ভাব দেখে আমার মনে হচ্ছে যে তুমি তোমার মায়ের চরু খেয়েছ। এ কাজ করা তোমার উচিত হয় নি। তোমার মায়ের চরুতে আমি সমস্ত বীর্য সম্পদের সমাবেশ করেছিলাম, আর তোমার চরুতে সমাবেশ করেছিলাম শান্তি জ্ঞান মতি তিতিক্ষা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সম্পদের। বিপরীত কাজ করার জন্য তোমার পুত্র রৌদ্রাস্ত্র ধারণ ও মারণাদিনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়াচারী হবে, আর তোমার মাতার পুত্র হবে শান্তির অভিলাষী ব্রাহ্মণাচারী। এই কথা শুনেই সত্যবতী ঋষির পা ধরে বললেন, অজ্ঞানতার জন্যই আমি এ কাজ করেছি। আমার পুত্র যেন এ রকম না হয়, বরং পৌত্র তাই হোক।

যথাসময়ে সত্যবতী জমদগ্নিকে ও তাঁর মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করলেন। সত্যবতী পরে কৌশিকী নামে নদী হয়েছিলেন এবং

জমদগ্নি ইক্ষ্বাকু বংশের রেণু রাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। তাঁরই গর্ভে জন্ম হয় ক্ষত্রিয় বংশের উচ্ছেদকারী পরশুরামের।

চরু বা যজ্ঞের পায়স ভক্ষণ করে পুত্র লাভ এ যুগের বিজ্ঞান সম্মত নয়। চরুতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় গুণের সমাবেশ করা আরও অসম্ভব কথা। তাই মনে হয় যে ক্ষত্রিয় রাজা গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের গুণ সম্পন্ন হয়ে তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন বলেই এই রকমের একটি কাহিনী কল্পিত হয়েছে। জমদগ্নি ধনুর্বেদে পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁর পুত্র পরশুরাম অদ্বিতীয় বীর ও সমসাময়িক সমস্ত ক্ষত্রিয় বীর অপেক্ষা প্রভাবশালী ছিলেন। তাই এই চরু বিপাকের কাহিনীতে পুত্রের গুণ পৌত্রে সঞ্চারিত করা হয়েছে। তবে একটি সত্য এই যে গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ছিলেন তাঁর দৌহিত্র জমদগ্নির সমসাময়িক এবং জমদগ্নি ছিলেন হৈহয় রাজ কৃতবীর্যের পুত্র অর্জনের সমসাময়িক। কার্তবীর্য অর্জুনের মতো বীর সে যুগে আর কেউ ছিলেন না। লঙ্কার রাজা রাবণও তাঁর কাছে পরাজিত ও বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু ইনি সীতা অপহরণকারী রাবণ নন, ইনি তাঁর অনেক পূর্ববর্তী রাজা। বিষ্ণু ইন্দ্র বা রুদ্রের মতো লঙ্কাধিপতিরাও রাবণ নামে অভিহিত হতেন বলে মনে হয়।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে যদুর এক পৌত্রের নাম হৈহয়। হৈহয়ের পিতা সহস্রজিৎকে যদুর পুত্র বলা হয়েছে। কিন্তু তা সম্ভব হতে পারে না। পুরূরবার পুত্র অমাবসু বা যদুর পুত্র সহস্রজিৎ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে হয় না। দীর্ঘকাল পরে ভীম ও হৈহয় নামে কোন ব্যক্তি যথাক্রমে অমাবসু ও যদুর বংশধর বলে দাবী করেন এবং তাঁদেরই বংশ অমাবসুর বংশ ও হৈহয় বংশ বলে পরিচিত হয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে অমাবসুর বংশে জহ্নু যৌবনাশ্বের পৌত্রীকে বিবাহ করেন এবং তিনি ছিলেন হৈহয়ের সমসাময়িক। জমদগ্নি ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু ইক্ষ্বাকু বংশে রেণু নামে কোনো রাজা পাওয়া যায় না। অনেকে

বলেন যে প্রসেনজিতের নামই রেণু। কিন্তু তাঁর কন্যা জমদগ্নির সমকালীন নন। তাই মনে হয় যে রেণু রাজা ছিলেন না, তবে তিনি ইক্ষ্বাকু বংশ জাত ছিলেন বলেই তাঁকে রাজা বলা হয়েছে।

দেবী ভাগবতে হৈহয় বংশের উৎপত্তি এবং হৈহয় ও ভার্গবদের কথা সবিস্তারে আছে। একবীর ও একাবলীর উপাখ্যানে দেখা যায় যে কৃতবীর্য এঁদেরই পুত্র। কিন্তু অন্য পুরাণের মতে ধনকের পুত্র কৃতবীর্য। ইনিই বিখ্যাত অর্জ্জুনের জনক। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, রাজা কৃতবীর্য পরলোক গমন করলে মন্ত্রী পুরোহিত ও পৌরগণ সমবেত হয়ে তাঁর পুত্র অর্জুনকে অভিষেকের জন্য আহ্বান করলেন। কিন্তু অর্জুন বললেন, রাজত্বের পরিণাম নরক, তাই আমি তা গ্রহণ করব না। রাজা যে জন্য কর গ্রহণ করেন, তা না করে পণ্ড করেন। বণিকরা রাজাকে পণ্যের দ্বাদশ ভাগ কর দেয়, অথচ পথে তারা রাজার অর্থরক্ষী পুরুষদের বদলে দস্যুদের কৃপার উপরে নির্ভর করে যাতায়াত করে। গোপ ও কৃষকেরা তাদের ঘৃত ও শস্যের ষষ্ঠ ভাগ কর দেয়। তারা যদি বেশিও দেয় এবং রাজা তা গ্রহণ করেন, তাহলে তা চুরি করা হয়। প্রজারা যদি রাজাকে বৃত্তি দেয় অথচ অন্যে তাদের প্রতি-পালন করে, তাহলে ঐ ষষ্ঠাংশ গ্রহণের জন্য রাজার নরক ভোগ হয়। প্রাচীন পণ্ডিতরা এই ষষ্ঠ ভাগ রাজার রক্ষণ বেতন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং প্রজাকে চোরের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারলে রাজারই চুরির পাপ হয়। তাই আমি এই রকম রাজা হয়ে পাপের ভাগী হতে চাই না। আমি তপস্যা করে পৃথিবী পালনে সমর্থ অদ্বিতীয় শস্ত্রধর রাজা হতে চাই।

তাঁর এই দৃঢ় সংকল্পের কথা শুনে বয়োবৃদ্ধ গর্গ মুনি বললেন, এই যদি তোমার ইচ্ছা হয় তো দত্তাত্রেয়র আরাধনা কর। সেই যোগী বিষ্ণুর অংশ ও পৃথিবীর পালক। তাঁরই আরাধনা করে দুরাত্মা দৈত্যদের বধ করে ইন্দ্র তাঁর রাজ্য উদ্ধার করেছেন।

গর্গের কথায় অর্জুন দত্তাত্রেয়র আশ্রমে গিয়ে তাঁর পূজা করলেন

এবং নানা ভাবে পরিচর্যা করতে লাগলেন। ঋষি তুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি বর নাও। অর্জুন বললেন, আমি যেন সর্বতোভাবে প্রজাপালন করতে পারি, কখনও যেন অধর্মে লিপ্ত না হই। তাছাড়া পরের অভিপ্রায় বুঝবার জ্ঞান চাই, যুদ্ধে যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হই, সহস্র বাহু ও লঘুহস্ত হতে পারি। সর্বত্র আমার গতি যেন অপ্রতিহত হয় এবং আমার মৃত্যু যেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাতে হয়। আমি যেন সৎপথের প্রদর্শক হতে পারি, আমার রাজত্বে আমাকে স্মরণ করে কারও যেন কিছু নষ্ট না হয় এবং আপনাতে আমার ভক্তি যেন অবিচল থাকে। ঋষি বললেন, তথাস্তু, আমার প্রসাদে তুমি চক্রবর্তী সম্রাট হবে।

অর্জুন ঋষিকে প্রণাম করে ফিরে এসে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঘোষণা করলেন, দস্যুবৃত্তি বা পরের হিংসা করলে এবং শস্ত্র গ্রহণ করলে আমি তাকে সংহার করব। এর পর রাজ্যে আর কেউ শস্ত্রধর রইল না। তিনিই গ্রাম্যপাল পশুপাল অর্থপাল ও ক্ষেত্রপাল হলেন। তিনিই হলেন ব্রাহ্মণ বণিক ও তপস্বীদের পরিপালক। তাঁর অধিকারে কারও কোন দ্রব্য নষ্ট হত না। তিনি বহুবিধ যজ্ঞ করলেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধ করলেন এবং তপস্যা সঞ্চয় করলেন। তাঁর অতুল ঐশ্বর্য ও অভিমান দেখে মহর্ষি অঙ্গিরা বলেছিলেন, কি যুদ্ধ কি দান কি তপস্যা, কোন কিছুতেই কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারবে না।

বিষ্ণুপুরাণেও এই রকমের কথা আছে। অর্জুন দত্তাত্রেয়র আরাধনা করে সহস্রবাহু হয়েছিলেন। বর পেয়েছিলেন যে তিনি ধর্মে পৃথিবী জয় ও প্রতিপালন করবেন। শত্রুর অপরাজেয় হবেন এবং কোন প্রখ্যাত পুরুষের হাতে তাঁর মৃত্যু হবে। এই বরে অর্জুন সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রতিপালন করেন এবং দশ হাজার যজ্ঞ করেন। লোকে বলত যে যজ্ঞ দান তপস্যা বিনয় বা ইন্দ্রিয় সংযমে কোন রাজা কার্তবীর্য অর্জুনের সমকক্ষ হতে পারবে না। তিনি পঞ্চাশ হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন।

একদিন তিনি মদ্যপানে মত্ত হয়ে নর্মদার জলে অবগাহন ক্রীড়া করছিলেন। সেই সময়ে দেব দৈত্য গন্ধর্ব বিজয়ের গর্বে রাবণ তাঁর মাহিষ্মতী নগরী আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি অনায়াসেই রাবণকে পশুর মতো বন্ধন করে নগরের এক নির্জন স্থানে রেখে দেন। ইনি পরশুরামের হাতে নিহত হন।

এই বংশে বৃষ্ণির জন্ম হয় এবং তাঁর নামেই যদুকুল বৃষ্ণি সংজ্ঞা পেয়েছে। এরা যাদব নামে বিখ্যাত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের উক্তি থেকে রাজাকে কর দেবার বিধি ও রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। প্রজার কাছে কর নিয়ে রাজ্যপালন তখন খুব সুখের কাজ ছিল না। তাই ধার্মিক অর্জুন প্রথমে রাজা হতে চান নি। দত্তাত্রেয় বংশের কোন তপস্বীর নিকটে তিনি রাজধর্ম শিক্ষা করতে গিয়েছিলেন কুলগুরু গর্গের পরামর্শে। তাঁর উপদেশ অনুসারেই তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন। বিষ্ণু-পুরাণে বলা হয়েছে যে অর্জুন সহস্রবাহু হয়েছিলেন। সেকালে বাহুবল বললে সৈন্যবলও বোঝাত। তাই মনে হয় যে দত্তাত্রেয় অর্জুনকে বাহুবলের জন্য সহস্র সৈন্য বা সেনাবাহিনীকে সহস্র দলে বিভক্ত রাখতে বলেছিলেন। সহস্র শব্দটি বহু অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। যেমন তিনি দশ হাজার যজ্ঞ করেন বা পঞ্চাশ হাজার বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। সহস্র এখানে অর্থহীন, অর্থাৎ তিনি দশটি যজ্ঞ করেন ও রাজত্ব করেন পঞ্চাশ বৎসর। তবে তিনি যে একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন এবং সে সময়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শুধু ঋষিরা নন, জনসাধারণও এই কথা বলতেন বলে পুরাণকাররা এক মত।

কিন্তু জমদগ্নির কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম তাঁকে বধ করেন। সে কাহিনীও পুরাণে আছে। অর্জুন একবার মৃগয়ায় বেরিয়ে জমদগ্নির আশ্রমে আসেন। একটি মাত্র কামধেনুর সাহায্যে সকলের অতিথি সৎকার করলে রাজা সেই ধেনু সবলে হরণ করে নিয়ে যান। রাম

আশ্রমে ফিরে এই দৌরাত্ম্যের কথা শুনে তাঁর পরশু বা কুঠার দিয়ে রাজার সমস্ত সৈন্য বধ করে রাজাকেও বধ করেন। তিনি ধেনু নিয়ে আশ্রমে ফিরলে পিতা তাঁকে বললেন, ব্রাহ্মণের গুণই ক্ষমা। তুমি তীর্থসেবা করে পাপ পরিহার কর।

পরশুরাম এক বৎসর নানা তীর্থ ভ্রমণ করে আশ্রমে ফিরলেন। এক দিন তাঁর মা রেণুকা গঙ্গায় জল আনতে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথকে ক্রীড়ারত দেখে সকৌতুকে বিলম্ব করেছিলেন। মুনি এই অন্যায়ের জন্য পুত্রদের বলেছিলেন, এই পাপীয়সীকে হত্যা কর। তাঁরা এই আদেশ পালন না করলে পরশুরাম পিতার কথায় মায়ের সঙ্গে ভাইদেরও হত্যা করেন। এতে তুষ্ট হয়ে জমদগ্নি বর দিতে চাইলে পরশুরাম নিহতদের পুনর্জীবন ও তাঁদের হত্যাকাণ্ডের বিস্মৃতি এই দুটি বর চেয়েছিলেন। এতে তাঁরা নিদ্রাভঙ্গের পর জেগে ওঠার মতো গাত্রোত্থান করেন।

অর্জুনের এক হাজার পুত্র ছিল। পরশুরামের অনুপস্থিতিতে তারা জমদগ্নির আশ্রমে এসে অগ্নিশালায় তাঁকে হত্যা করেন। পরশুরাম ফিরে এসে পিতার মৃত্যু দেখে মাহিষ্মতী পুরাতে গিয়ে সেই পুত্রদের মাথা কাটেন। এই ঘটনাকেই নিমিত্ত করে তিনি একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে তাদের রক্তে সমন্তপঞ্চক ক্ষেত্রে নয়টি হ্রদ নির্মাণ করেন। এখনও তিনি প্রশান্ত চিত্তে মহেন্দ্র পর্বতে অবস্থান করছেন।

এই কাহিনী শ্রীমদ্‌ভাগবতের। অর্জুনের মতো ধার্মিক রাজা গরু চুরি করবেন, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। আবার পরশুরাম তাঁর মা ও ভাইদের হত্যা করবেন, এও অবিশ্বাস্য। তার কারণ নিহত ব্যক্তির পুনর্জীবন লাভ সম্ভব নয়। পরশুরাম তাঁর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে একুশবার পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয় বধ করেছিলেন, এ কথাও অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। এই কাহিনার মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে তবে তা এই হতে পারে যে অর্জুনের অনেক পুত্র ছিল।

তাদেরই মধ্যে কেউ জমদগ্নির কামধেনু হরণ করেছিলেন বলে যে বিবাদ হয়, তাতে জমদগ্নি প্রাণ হারান। পরশুরাম হয় তো এই সময়ে আশ্রমে ছিলেন না এবং ফিরে এসে এই সংবাদ পেয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে অর্জুন ও তাঁর পুত্রদের নৃশংস ভাবে হত্যা করেন। যাঁরা পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেন, তাঁদেরও তিনি অব্যাহতি দেন নি। অর্থাৎ একুশবারের চেষ্টায় তিনি অর্জুনের সমস্ত পুত্রদের হত্যা করেছিলেন।

অর্জুনের পর হৈহয় বংশের কথা আর শোনা যায় না। বিষ্ণু-পুরাণে বলা হয়েছে যে বৃষ্ণির জন্ম এই বংশে। যদু বংশে বৃষ্ণির নাম পাওয়া যায় ২১২৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে, অর্থাৎ প্রায় আট শো বৎসর পরে। ক্রোষ্টু থেকে এই যদু বংশেব আরম্ভ। জ্যামঘ বিদর্ভ প্রভৃতি এই বংশের রাজা। বৃষ্ণি বিদর্ভের প্রপৌত্র। বিষ্ণুপুরাণে স্ত্রৈণ জ্যামঘের কাহিনী আছে।

বলা বাহুল্য যে পুরাণে পরশুরাম একাধিক। জামদগ্ন্য পরশুরামের কথাই বলা হয়েছে। ত্রেতা ও দ্বাপরের সংযোগ কালে রাজা মূলকের সমসাময়িক আর একজন পরশুরাম ছিলেন। ইক্ষ্বাকু বংশে মূলক রামের দশ পুরুষ পূর্বে ছিলেন। যিনি পরশুরামের ভয়ে স্ত্রী বেশে লুকিয়েছিলেন, তিনি হৈহয় পরশুরাম। দাশরথী রাম যে পরশুরামের গর্ব খর্ব করেন, তিনি অন্য পরশুরাম। এই পরশুরামকে বিষ্ণুপুরাণ হৈহয় কুলকেতু বলেছেন।

সগর ও ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন

ত্রেতা যুগের শেষের দিকে সগর একজন বিখ্যাত রাজা। হরিশ্চন্দ্রের পর অষ্টম পুরুষে তাঁর জন্ম। তাঁর জন্মের কথা আছে বিষ্ণুপুরাণে। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব। এই বংশেরই রাজা বাহু হৈহয় তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দের নিকটে পরাজিত হয়ে রাণীকে নিয়ে বনে চলে যান। বনে রাণীর গর্ভ সঞ্চার হলে তাঁর সপত্নী তাঁকে বিষ প্রদান করেন। কিন্তু গর্ভস্থ শিশু সাত বৎসর গর্ভে থাকে।

এই সময়ে বৃদ্ধ রাজা বাহু ঔর্ব ঋষির আশ্রমের নিকটে মারা যান। রাণী মৃত রাজাকে চিতায় তুলে নিজে সহমরণে যাবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু অতীত অনাগত ও বর্তমান কালবেত্তা ঔর্ব তাঁর আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, তুমি এ কাজ কোরো না, তোমার গর্ভে আছে রাজ চক্রবর্তী বালক। এই কথায় রাণী সহমরণে নিবৃত্ত হলে ঔর্ব তাঁকে নিজের আশ্রমে নিয়ে গেলেন। দিন কয়েকের মধ্যেই বিষের সঙ্গে এক তেজস্বী বালকের জন্ম হয়। জাত কর্মাদি সম্পন্ন করে ঔর্ব তাঁব নাম রাখলেন সগর। উপনয়নের পর বেদ অখিল শাস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দিলেন।

বড় হয়ে বালক মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা কে এবং তিনি কোথায়? কেন আমরা এই তপোবনে আছি? এই প্রশ্ন শুনে মা তাঁকে অতীতের সব কথা বললেন। সগর ক্রুদ্ধ হয়ে হৈহয় তালজঙ্ঘাদি বধের জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন এবং হৈহয় রাজাদের বধ করলেন। কিন্তু শক যবন কাম্বোজ পারদ ও পহ্লবরা তাঁর কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণ নিল। বশিষ্ঠ তাদের জীবন্মৃত-প্রায় করে সগরকে বললেন, তোমার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য আমি এদের স্বধর্ম ও ব্রাহ্মণ সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়েছি, কাজেই এই জীবন্মৃতদের অনুসরণ করে ফল কী! গুরুর কথায় সম্মত হয়ে সগর তাদের ভিন্ন ভিন্ন বেশ দিলেন। যবনদের মাথা মুড়িয়ে দিলেন, শকদের অর্ধ মুণ্ডিত করলেন, পারদদের প্রলম্ব কেশযুক্ত ও পহ্লবদের শ্মশ্রুধারী করলেন এবং স্বাধ্যায় ও বষ্‌কারহীন করে দিলেন অন্যান্যদের। নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে তারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হল। আর নিজের অধিষ্ঠানে ফিরে এসে সগর সপ্তদ্বীপ শাসন করতে লাগলেন।

বিষ্ণুপুরাণের এই কাহিনীতে দুটি প্রশ্ন উঠে পড়ে। একটি প্রশ্নের উত্তর রহস্যে আবৃত। সেটি হল, বাহু রাজা বৃদ্ধ, তিনি রাজত্ব হারিয়ে রানীকে নিয়ে বনে এসেছেন। কোন সপত্নীর কথা নেই। অথচ রানীর গর্ভ সঞ্চার হতেই সপত্নী বিষ প্রয়োগ করলেন। তাতে রানীর

বা গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু বা কোন ক্ষতি হল না, সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে সাত বৎসর দেরি হল এবং এই সময়ে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হল। তারপর বিষের সঙ্গে সন্তান ভূমিষ্ঠ হল রাজার মৃত্যুর অল্প দিন পরে। রানীকে সহমরণে যেতে বাধা দিলেন ঔর্ব ঋষি। তিনিই রানীকে নিজের আশ্রমে রেখে রাজপুত্রকে পালন করলেন বলে মনে হয়। পুরাণকার এই কাহিনী রচনা করে যে কিছু গোপন করার চেষ্টা করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় প্রশ্ন ম্লেচ্ছদের সম্বন্ধে। বোঝা যাচ্ছে যে বাহু রাজার সময়ে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়েছিল। হৈহয় রাজ অর্জুনের পর কোন শক্তিশালী রাজা দেশে ছিলেন না। তাই ইক্ষ্বাকু বংশের বাহু রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন। কিন্তু হৈহয় বা তালজঙ্ঘরাও শক্তিশালী ছিল না। তখন শক যবন কাম্বোজ পারদ ও পহ্লবরাও অরাজকতার সুযোগ নিতে আরম্ভ করেছিল। এরা কখন এ দেশের সমাজে প্রবেশ করেছিল, তা জানা যায় না। কোথা থেকে কেমন করে তাদের উদ্ভব হল, সে কথাও পুরাণে নেই। তবে এইটুকু জানা যায় যে সগর বশিষ্ঠের সাহায্যে তাদের দমন করে ম্লেচ্ছ আখ্যা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সমাজে তারা স্থান পায় নি। ইক্ষ্বাকু বংশের অবিচ্ছিন্ন বংশলতা বিচার করে সগরের কাল কতকটা নির্ভুল ভাবে গণনা করা যায়। তিনি রাজত্ব করেছেন ২৮৩৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে। তাঁর পুত্র অসমঞ্জ এবং পৌত্র অংশুমান। অংশুমানের পুত্র দিলীপ ও পৌত্র ভগীরথ। ভগীরথের কাল ২৭৪২ থেকে ২৭১৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এই সময়েই মিথিলার রাজা ছিলেন জনক। বিদেহ রাজ জনকের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায় যে সগরের দুই পত্নী—একজন কশ্যপের কন্যা সুমতি ও অন্যজন বিদেহ রাজকন্যা কেশিনী। পুত্র লাভের জন্য এঁরা ঔর্ব ঋষির আরাধনা করলে তিনি বর দেন যে একজনের এক বংশধর পুত্র হবে এবং অন্যজনের হবে ষাট হাজার পুত্র। যাঁর যে বর ইচ্ছা, তিনি তাই নিতে পারেন। এই কথা শুনে সুমতি ষাট হাজার

পুত্র ও কেশিনী একটি পুত্র চাইলেন। কিছু দিনের মধ্যেই কেশিনীর অসমঞ্জ নামে একটি পুত্র হল এবং কালক্রমে সুমতিরও ষাট হাজার পুত্র জন্মাল। অসমঞ্জেরও এক পুত্র হল, তার নাম অংশুমান।

কোন নারীর ষাট হাজার পুত্র হতে পারে না। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কশ্যপের কন্যা সুমতি রাজ্যের ষাট হাজার প্রজাকেই নিজের পুত্র বলে ভাবতে আরম্ভ করেন। পুরাণে প্রজাদের পুত্র বলে উল্লেখ করা হত। অর্থাৎ বিদেহ রাজ কন্যা কেশিনীর অসমঞ্জ নামে একটি মাত্র পুত্র হয়েছিল এবং অসমঞ্জেরও একটি পুত্র জন্মেছিল, তার নাম অংশুমান।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে অসমঞ্জা বাল্যকাল থেকেই দুর্বৃত্ত ছিলেন। পিতা ভেবেছিলেন যে যৌবনে তিনি বুদ্ধিমান হবেন। কিন্তু তা হলেন না দেখে তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করলেন। এ দিকে রাজার অন্য ষাট হাজার পুত্রও অসমঞ্জার চরিত্রের অনুকরণ করল। এরা যজ্ঞাদি সন্মার্গ নষ্ট করছে দেখে দেবতারা কপিল ঋষিকে জিজ্ঞাসা করলেন, সগরের পুত্ররা থাকলে জগতের কী দশা হবে? কপিল বললেন, অল্প দিনেই তারা বিনষ্ট হবে।

এর পর সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সগরের পুত্ররা ছিলেন যজ্ঞের অশ্ব রক্ষক। কিন্তু কেউ সেই অশ্ব অপহরণ করে ভূবিবরে প্রবেশ করল। সগরের পুত্ররা অশ্বের খুরের চিহ্ন অনুসরণ করে পৃথিবী খুঁড়ে পাতালে প্রবেশ করলেন। সেখানে দেখলেন যে যজ্ঞের অশ্ব ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং শরতের নির্মল আকাশের সূর্যের মতো চারি দিক উদ্ভাসিত করে বসে আছেন কপিল ঋষি। অস্ত্র উদ্যত করে তাঁরা বললেন, যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাবার জন্য এই ব্যক্তিই অশ্ব চুরি করেছে, একে হত্যা কর। এই কথা বলে তাঁর দিকে ধাবিত হতেই কপিল তাদের দিকে তাকালেন এবং তাঁর শরীর থেকে সমুত্থিত আগুনে তাঁরা বিনষ্ট হলেন।

এই সংবাদ পেয়ে সগর তাঁর পৌত্র অংশুমানকে যজ্ঞের অশ্ব

আনবার জন্য পাঠালেন। অংশুমান একই পথে কপিলের নিকটে এসে ভক্তি নম্র হয়ে তাঁকে তুষ্ট করলেন। কপিল বললেন, এই অশ্ব নিয়ে তোমার পিতামহর নিকটে ফিরে যাও। আর বর নাও, তোমার পৌত্র স্বর্গ থেকে গঙ্গা আনবে। অংশুমান বললেন, আমার পিতৃব্যরা ব্রহ্মদণ্ড হত বলে স্বর্গের অযোগ্য। তাঁরা যাতে স্বর্গে যেতে পারেন, সেই বর দিন। কপিল বললেন, আমি তো বলেছি যে তোমার পৌত্র স্বর্গ থেকে গঙ্গা আনবে। বিষ্ণুর পাদাঙ্গুষ্ঠ থেকে নির্গত এই জলের স্পর্শে তারা স্বর্গারোহণ করবে।

কপিলকে প্রণাম করে অংশুমান অশ্ব নিয়ে ফিরে এলেন। সগর তাঁর যজ্ঞ সমাপন করলেন এবং আত্মজ-প্রীতিতে সাগরকে পুত্রত্বে কল্পনা করলেন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে আনয়ন করেন বলে গঙ্গার নাম হয় ভাগীরথী।

কপিলের শাপে বা কোপানলে সগরের ষাট হাজার পুত্র ভস্ম বা বিনষ্ট হল, এ কথা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। অন্তত এ যুগে এ কথা বিশ্বাস কবা সম্ভব নয়। তবে পুরাণকার মিথ্যা বলেছেন, এ কথাও ঠিক নয়। পুরাণে রূপক আছে, অত্যুক্তি আছে, সত্য ঘটনাকে নানা ধরনে বলার রীতি আছে বলে অনেক সময়েই কোন কোন ঘটনা মিথ্যা বলে মনে হয়। বিশেষ করে যেখানে দেবতা বা ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশ্য, সেখানে সদুদ্দেশ্যেই নানা রকম কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যত্র এ রকম দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। তাই বিশ্বাস করতে হয় যে সগর রাজার পুত্রতুল্য বহু প্রজা বা সেনা অথবা মজুর কোন কারণে নিহত হয়েছিল এবং তারা গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে একটা সুনির্দিষ্ট পথে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। এই অঞ্চল খুবই অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং কোন রোগে তাদের মৃত্যু হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। কপিলের কোপানল শব্দে পিঙ্গল বা অগ্নিবর্ণ এবং উত্তাপের সম্পর্ক দেখে মনে হয় যে এক রকম জ্বরে আক্রান্ত হয়েই এত লোকের মৃত্যু

হয়েছিল। অংশুমান এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে পিতামহ সগরকে জানিয়েছিলেন এবং সগর সমুদ্রকে পুত্ররূপে কল্পনা করেছিলেন। এর পর অংশুমানের পৌত্র ভগীরথ গঙ্গাকে সমুদ্র তীরে কপিল মুনির আশ্রমে আনলে সগরের পুত্ররা স্বর্গে যেতে পারেন। ভগীরথের নামেই গঙ্গার নাম হয়েছে ভাগীরথী। এই কাহিনী থেকেই মনে হয় যে ভগীরথ গঙ্গার একটি ধারাকে যে পথে প্রবাহিত করেছিলেন, তারই নাম হয়েছে ভাগীরথী। অর্থাৎ বর্তমানে গঙ্গার যে অংশ ভাগীরথী নামে পশ্চিম বঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে, তা ভগীরথই খনন করিয়েছিলেন। সগর এই কাজে ষাট হাজার প্রজা বা মজুর লাগিয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্র অসমঞ্জা খননের কাজ পরিদর্শন করে-ছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের এই অঞ্চলকে বাসোপযোগী করার উদ্দেশ্যেই যে সগর এই খনন কার্য আরম্ভ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি বুঝতে পারেন নি যে এই অস্বাস্থ্যকর স্থানে এত লোকের মৃত্যু হবে। এই কাজ সম্পূর্ণ হতে আরও বহু দিন লেগেছিল। অংশুমান ও তাঁর পুত্র দিলীপও কাজ শেষ করতে সক্ষম হন নি। ভগীরথের আমলেই গঙ্গাকে নূতন ধারায় সমুদ্রে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। সাধারণ ভাবে বিশ্বাস করা হয় যে ভগীরথ গঙ্গোত্রীতে তপস্যা করে স্বর্গ থেকে বিষ্ণুপদী গঙ্গাকে মর্ত্যে এনেছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক বিচারেই এ কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। পুরাণেই আছে যে জহ্নু একদিন নিজের যজ্ঞ বাটিকে গঙ্গাজলে প্লাবিত দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে পান করেছিলেন। দেবর্ষিরা তাঁকে প্রসন্ন করে গঙ্গাকে তাঁর দুহিতা রূপে স্বীকার করান। এতে জহ্নু তাঁকে পরিত্যাগ করেন এবং গঙ্গার নাম হয় জাহ্নবী। জহ্নু অমাবসুর চতুর্থ পুরুষ। তার কাল ৩২৭৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ, অর্থাৎ তিনি ভগীরথের পাঁচশো বৎসরেরও বেশি পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। গঙ্গা তখনও এ দেশে প্রবাহিত হত।

এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে যে সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিল বহু প্রাচীন কালের ঋষি। তাঁর আশ্রম কোথায় ছিল তা জানা যায় না।

গঙ্গাসাগর অঞ্চলে কপিল নামের অন্য কোন ঋষি ছিলেন কিনা তাও জানা সম্ভব নয়। তবে এই নামটি জ্বরের বর্ণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ব্যবহার করা হয়েছিল বলে মনে হয়। সগরের এক পত্নী বিদেহ রাজ-কন্যা ছিলেন। এই কথাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিদেহ রাজ্য মিথিলা গঙ্গার উত্তর তারে। এর পরে গঙ্গার তীরে আর কোন জনপদের নাম পাওয়া যায় না। সগর তাঁর বিবাহের পর অযোধ্যা থেকে পূর্ব দিকে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় যে গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে সেই অঞ্চল বাসোপযোগী করবার চেষ্টা করবেন, তা খুবই স্বাভাবিক। তাই এ কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে যে ভগীরথই পশ্চিম বঙ্গকে মনুষ্যবাসের উপযোগী করেছিলেন।

ঋতুপর্ণ ও নল

বিষ্ণুপুরাণে আছে যে ভগীরথের বংশেই ঋতুপর্ণ ছিলেন অক্ষ-হৃদয়জ্ঞ ও নলের সহায়। ঋতুপর্ণ ভগীরথের পাঁচ পুরুষ পরে। অর্থাৎ তাঁর কাল ২৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। তিনি নলের সহায় হয়েছিলেন। এই নল ছিলেন নিষধ রাজ্যের রাজা, তিনি বিবাহ করেছিলেন বিদর্ভ রাজা ভীমের কন্যা দময়ন্তীকে। নল অশ্বতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। মহাভারতে এই কাহিনী আছে। ইন্দ্র অগ্নি বরুণ ও যম দময়ন্তীর রূপের কথা শুনে নলের রূপ ধারণ করে স্বয়ম্বর সভায় এসেছিলেন। কিন্তু দময়ন্তীর প্রার্থনায় তাঁরা দৈবচিহ্ন ধারণ করলে দময়ন্তী তাঁদের চিনতে পেরে নলকে বরণ করেছিলেন। কিন্তু দ্বাপর ও কলি বিলম্বে আসার জন্য দেবতাদের মুখে এই সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ হলেন। কলি নিষধ রাজ্যে এসে ছিদ্র অন্বেষণ করতে লাগলেন এবং কলির অনুরোধে দ্বাপর অক্ষ বা পাশার মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর সুযোগ বুঝে কলি নলের দেহে প্রবেশ করলেন। তারপর নল তাঁর ভ্রাতা পুষ্করের নিকটে পাশা খেলায় হেরে সর্বস্ব হারালেন। তাঁদের দুঃখের আর সীমা রইল না। নলের সঙ্গে দময়ন্তীর বিচ্ছেদ হল। পরে পুনর্মিলনও হল। দময়ন্তী

চেদি রাজ্যে আশ্রয় পেয়েছিলেন এবং নল অযোধ্যায় ঋতুপর্ণের নিকটে। দময়ন্তীর মাতা ও চেদিরাজের রাজমাতা তুজনেই দশার্ণ রাজার কন্যা ছিলেন। ঋতুপর্ণ অক্ষ-হৃদয় জানতেন, নল জানতেন অশ্ব-হৃদয়। গুপ্ত বিদ্যাকেই হৃদয় বলা হত। ঋতুপর্ণ তাঁর বিদ্যা বলে গাছের পাতা ও ফলের সংখ্যা নির্ভুল ভাবে বলতেন। তাঁরা পরস্পর বিদ্যা বিনিময় করলেন। নল অক্ষ-হৃদয় শিখে তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে পুনরায় পাশা খেলে রাজ্য উদ্ধার করলেন।

এই কাহিনীর মধ্যে বহু অলৌকিক কথা আছে। সে সব বাদ দিয়ে যেটুকু বিশ্বাসযোগ্য কথা পাওয়া যায় তা হল সে সময়ে নিষধ বিদর্ভ চেদি দশার্ণ ও কোশল রাজ্যের বিদ্যমানতা এবং অশ্ব ও অক্ষ প্রভৃতি গোপন বিদ্যার জ্ঞান। নল যে আরও অনেক বিদ্যা জানতেন, তার উল্লেখ আছে মহাভারতে। নল ঋতুপর্ণকে বলেছিলেন, অশ্ব চালনায় আমার মতো নিপুণ লোক পৃথিবীতে নেই, সঙ্কট কালে বা কোন কাজে নৈপুণ্যের প্রয়োজন হলে আমি মন্ত্রণা দিতে পারব। আমি রন্ধন বিদ্যাও জানি। সব রকম শিল্প ও তুরূহ কাজ করতে পারব। এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে সে যুগের রাজারা সকল বিষয়ে কত দক্ষ হতেন।

কল্মাষপাদ

ঋতুপর্ণের প্রপৌত্র মিত্রসহ একদিন মৃগয়ায় গিয়ে তুটি ব্যাঘ্র দেখতে পান। এরা বনের সব মৃগ ভক্ষণ করেছিল বলে মিত্রসহ বাণ মেরে একটি ব্যাঘ্রকে বধ করেন। কিন্তু মৃত্যুকালে সে ভীষণাকার রাক্ষস রূপ ধারণ করে এবং অন্য ব্যাঘ্রটি এর প্রতিশোধ নেব বলে অন্তর্হিত হয়। তারপর রাজা এক যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞ শেষ করে বশিষ্ঠ নিষ্ক্রান্ত হবার পর তাঁরই রূপ ধারণ করে সেই রাক্ষস এসে বলল, যজ্ঞের অবসানে আমাকে সমাংস ভোজন করানো তোমার কর্তব্য। তুমি ব্যবস্থা কর, আমি আসছি। বলে বেরিয়ে গেল এবং পাচকের বেশ ধারণ করে

রাজার আজ্ঞা নিয়ে মানুষের মাংস রেঁধে রাজাকে দিল। রাজা সেই মাংস সোনার পাত্রে রেখে বশিষ্ঠের অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং তিনি এলে তাঁকে সেই খাদ্য নিবেদন করলেন। বশিষ্ঠ ভাবলেন, রাজার এ কী দুঃশীল আচরণ! আমাকে মাংস খেতে দিচ্ছে! পরে ধ্যানে জানতে পারলেন যে তা মানুষের মাংস। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি শাপ দিলেন, তুমি নরমাংস লোলুপ হবে। রাজা বললেন, আপনিই তো আমাকে এই আদেশ করেছিলেন! আমি বলেছি! বলে বশিষ্ঠ পুনরায় ধ্যানযোগে সব অবগত হলেন। তারপর রাজার প্রতি অনুগ্রহ করে বললেন, চিরদিন নয়, মাত্র বারো বছর তোমাকে নরমাংস ভোজন করতে হবে। কিন্তু রাজাও তখন অঞ্জলিতে জল নিয়ে বশিষ্ঠকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু রাণী মদয়ন্তী বলে উঠলেন, এ কী করছ! ইনি আমাদের গুরু! আচার্যকে কি এই ভাবে শাপ দেওয়া উচিত! রাজা তাঁর অঞ্জলির জল ভূমি বা আকাশে নিক্ষেপ করলে শস্য বা মেঘ নষ্ট হবে ভেবে নিজের দুই পায়ে সেচন করলেন। ক্রোধাগ্নিতে তপ্ত সেই জলের স্পর্শে রাজার পদদ্বয় কল্মাষ অর্থাৎ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেল এবং তাঁর নাম হল কল্মাষপাদ।

তৃতীয় দিনেই রাজা রাক্ষস রূপে বনে গিয়ে মানুষ খেতে লাগলেন। এক দিন এক মুনি দম্পতিকে সঙ্গত অবস্থায় দেখে ব্রাহ্মণকে ধরে ফেললেন এবং ব্রাহ্মণীব সমস্ত বিলাপ উপেক্ষা কবে তাঁকে ভক্ষণ করলেন। ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, স্ত্রী সম্ভোগে প্রবৃত্ত হলে তোমারও বিনাশ হবে। বলে তিনি আগুনে প্রবেশ করলেন।

বারো বৎসর অতীত হবার পর রাজা শাপমুক্ত হলেন। কিন্তু তাঁকে স্ত্রী সম্ভোগ পরিত্যাগ করতে হল। পরে অপুত্রক রাজার প্রার্থনায় বশিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভাধান করলেন। কিন্তু সাত বৎসর পরেও গর্ভের শিশু ভূমিষ্ঠ হল না দেখে মদয়ন্তী অশ্ম বা পাথর দিয়ে পেটে আঘাত করলেন। তাতেই জন্ম হল অশ্মকের। অশ্মকের পুত্রের নাম মূলক।

এই সময়ে পরশুরাম পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করতে প্রবৃত্ত হলে বিবস্ত্র স্ত্রীরা মূলককে পরিবেষ্টন করে রক্ষা করে। এই জন্য তাঁকে নারী কবচ বলা হত।

বিষ্ণুপুরাণের এই কাহিনী থেকে সেকালের সংস্কার ও সমাজ ব্যবস্থার কথা জানা যাবে। পুরাণে যক্ষ ও রাক্ষস নামে দুই জাতির উল্লেখ আছে। ব্রহ্মা তাঁদের সৃষ্টি করেছিলেন। এরা সমাজের শত্রু ছিল বলেই মনে হয়। তারা অরণ্যে বাস করে মানুষ মেরে ও লুটতরাজ করে জীবন নির্বাহ করত, যজ্ঞের জন্য দ্রব্য সামগ্রী সংগৃহীত হলে লুটপাট করতে আসত। তারা অভাবগ্রস্ত ও সর্বদা ক্ষুধার্ত থাকত বলেই এই রকম কাজ করত। সভ্য সমাজেরও কেউ কেউ এই রাক্ষস বৃত্তি অবলম্বন করতেন, কখনও প্রয়োজনে কখনও বা স্বভাবের দোষে। অনেক রাজাও পরের রাজ্যে গিয়ে রাক্ষসের মতো আচরণ করতেন। রাবণ এই রকম ছিলেন। নিজের রাজ্যে তিনি ধার্মিক ও সদাশয় রাজা ছিলেন এবং রাক্ষস বৃত্তি অনুসরণ করতেন পরের রাজ্যে। যে কোন কারণেই হোক রাজা মিত্রসহ বারো বৎসরের জন্য রাক্ষসবৃত্তি অবলম্বন করেন। পুবাণকার একে বললেন, বশিষ্ঠেব শাপে এই রকম হয়েছিল এবং এই কথা প্রমাণের জন্য একটি কাহিনী রচনা করলেন।

রাজা কল্মাষপাদ হয়েছিলেন। এটি ধবল জাতীয় কোন রোগ বলে মনে হয়। সেকালে হয়তো ধারণা ছিল যে এই রোগে আক্রান্ত হলে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না। তাই সাত বৎসর পর রাজা বশিষ্ঠকে ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম দেবার জন্য নিয়োগ করেন। এই রীতি সেকালে প্রচলিত ছিল এবং নিন্দনীয় ছিল না। তার কারণ, বংশ রক্ষা করা ধর্ম বলে বিবেচিত হত। এই জন্যই আর একটি কাহিনী রচনা করে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণীর অভিশাপে রাজা স্ত্রীসম্ভোগে অক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তী কালেও দেখা যায় যে পাণ্ডুর পাণ্ডুবর্ণ ছিল। এও ধবল বা অন্য কোন রোগ, তা জানা যায়

না। প্রায় একই রকম কাহিনী রচনা করে বলা হয়েছে যে পাণ্ডুও সন্তান উৎপাদনে অক্ষম ছিলেন এবং সন্তান লাভের জন্য তাঁর দুই পত্নী কুন্তী ও মাদ্রী দেবতাদের আহ্বান করেছিলেন। এ একটি সংস্কারের কথা। এই সংস্কার সে যুগে বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল। পুরাণে ক্ষেত্রজ পুত্র লাভের আরও অনেক ঘটনা আছে। কিন্তু পরবর্তী কালে এই প্রথা পরিত্যক্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। যত দূর জানা যায়, পাণ্ডুর পরে আর এই প্রথার কথা শোনা যায় না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাপর যুগ

(২৪৫৮ থেকে ১৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)

রাম, বেদ-উপনিষদ ও পুরাণ রচনার কাল

মূলকের কাল ত্রেতা-দ্বাপর সন্ধিতে অর্থাৎ একবিংশ যুগের শেষ ভাগে। কল্পের আরম্ভ থেকে তখন (২০০০ × ২১ =) ৪২০০০ মাস বা ৩৫০০ বৎসর অতীত হয়েছে। কাজেই মূলককেই ত্রেতার শেষ রাজা বা দ্বাপরের প্রথম রাজা বলা যেতে পারে। ইনি হৈহয় পরশুরামের সমসাময়িক ছিলেন। হৈহয় ক্ষত্রিয় রাজার বংশ এবং ব্রাহ্মণ ভৃগু বংশের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘ দিন বিবাদ চলেছিল। কিন্তু ইনিও ক্ষত্রিয় বিরোধী ছিলেন, এমন ঘটনা জানা যায় না। বোধহয় ভার্গব পরশুরামের সঙ্গে একে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে ভুল করে।

দাশরথি রামের জন্ম মূলকের দশ পুরুষ পরে। অর্থাৎ রাম দ্বাপরের মানুষ, ত্রেতার নন। এই সিদ্ধান্ত প্রশ্নাতীত। এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে যে এক সময়ে দ্বিতীয় যুগকে দ্বাপর ও তৃতীয় যুগকে ত্রেতা বলা হত। পরবর্তী কালে কোন সময়ে এই সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু শব্দ দুটি অপরিবর্তিত আছে। কেন এই পরিবর্তন, তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি।

একই ভাবে হিসাব করে প্রতিপন্ন হয়েছে যে কৃষ্ণ দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পুরাণ অনুসারে তার জন্ম অষ্টাবিংশতি যুগে অর্থাৎ কল্পারম্ভের (২০০০ × ২৭ =) ৫৪০০০ মাস বা ৪৫০০ বৎসর পরে, একালের হিসাবে ১৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। সুতরাং

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে মূলক থেকে কৃষ্ণের জন্ম পর্যন্ত দ্বাপর যুগ। রামায়ণের কাহিনী দ্বাপর যুগের ঘটনা এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছে কলি যুগে ১৪১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। এই বৎসরেই পরীক্ষিতের জন্ম। কৃষ্ণের জীবদ্দশায় কলি প্রবল হতে :পারে নি। তাই বলা হয় যে কৃষ্ণের মৃত্যুর পরেই কলির আবির্ভাব।

রাম

রামায়ণের কাহিনী বিষ্ণুপুরাণে আছে খুবই সংক্ষেপে। মূলকের পুত্র দশরথ, তাঁর পুত্র ইলিবিল। ইলিবিলের পুত্র বিশ্বসহ ও তাঁর পুত্র খট্বাঙ্গ দিলীপ। ইনি দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হয়ে অসুরদের বিনাশ করেন। তাতে স্বর্গস্থ দেবতারা তাঁকে প্রিয়কারী বলে বর দিতে চাইলে তিনি বললেন, যদি আমাকে নিতান্তই বর নিতে হয় তো আপনারা বলুন, আমি আর কত কাল বাঁচব। দেবতারা বললেন, আপনার আর এক মুহূর্ত আয়ু অবশিষ্ট আছে। দেবতারা এই কথা বলতেই খট্বাঙ্গ দিলীপ অস্খলিত গতি দেব রথে আরোহণ করে অতি শীঘ্র মর্ত্যে এসে বলতে লাগলেন, আমি আমার আত্মাও ব্রাহ্মণদের চেয়ে প্রিয়তর ভাবি নি, সধর্ম কখনও লঙ্ঘন করি নি, আমার দৃষ্টিতে দেব মানুষ পশু ও বৃক্ষাদিতেও অচ্যুত ভেদ উপলব্ধি করি নি। তাই আমি যেন আজ সজ্ঞানে সেই মুনিজন অনুস্মৃত বিষ্ণুকে লাভ করি। এই কথা বলতে বলতেই তিনি পরমাত্মায় আত্মার যোগ করে বাসুদেবেই বিলীন হয়ে গেলেন। তাই পুরাকালে সপ্তর্ষিরা শ্লোক গান করতেন, পৃথিবীতে খট্বাঙ্গের মতো আর কেউ জন্মাবে না। তিনি তাঁর আয়ু মুহূর্ত কাল জানতে পেরে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এসে সৎপাত্রে দান করে ত্রিলোক জয় করেছেন।

খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু, তাঁর পুত্র রঘু। রঘুর পুত্র অজ এবং অজের পুত্র দশরথ। ভগবান পদ্মনাভ নিজের অংশে রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চার অংশ দশরথের পুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন।

রাম বাল্যকালেই বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার জন্য যাবার সময় পথে তাড়কা নামে এক রাক্ষসীকে বধ করেন। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের সময়ে তিনি মারীচকে বাণের আঘাতে আহত করে দূরে নিক্ষেপ করেন। সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসদের বিনাশ করেন এবং অহল্যাকে দর্শন মাত্রেই অপাপা করেন। তারপর জনক রাজার গৃহে অনায়াসেই হরধনু ভঙ্গ করেন এবং তাঁর অযোনিজা কন্যা সীতাকে বীর্যের শুল্ক স্বরূপ বিবাহ করেন। তারপর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন কালে পথে ক্ষত্রিয় ক্ষয়কারী হৈহয় কুলকেতু পরশুরামের বীর্য ও বলের গর্ব খর্ব করেন। তিনি পিতৃবাক্যে রাজ্যাভিলাষ ত্যাগ করে ভ্রাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে বনে প্রবেশ করেন। সেই বনে বিরাধ খর দূষণাদি রাক্ষস কবন্ধ ও বালিকে বধ করেন। পরে সমুদ্র বন্ধন পূর্বক রাক্ষস কুলক্ষয় করে দশানন কর্তৃক অপহৃত কলঙ্কমুক্ত ও অগ্নি প্রবেশে শুদ্ধ সীতাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনেন।

ভরতও গন্ধর্ব রাজ্য লাভ করবার জন্য তিন কোটি গন্ধর্ব বিনাশ করেন। শত্রুঘ্নও অমিতবল রাক্ষসরাজ মধুপুত্র লবণকে বধ করে মথুরা পুরী স্থাপন করেন। এই রকম অতুলনীয় বল পরাক্রম ও বিক্রমে বহু দুরাত্মা বধ করে জগতের স্থিতি সম্পাদন করে রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন পুনরায় স্বর্গে গেলেন। সে সময়ে যে অযোধ্যাবাসীরা এঁদের অনুরাগী ছিলেন, তাঁরাও রামে মন অর্পণ করে সালোক্য প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও এই কাহিনী সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সুরচিত। হরি দেবতাদের প্রার্থনায় রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চার অংশে দশরথের পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন। রাম বিশ্বামিত্র ঋষির যজ্ঞ ক্ষেত্রে রাক্ষস বধ করেছিলেন। সীতার স্বয়ম্বরে হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে জয় করেছিলেন। ফেরার পথে দর্প চূর্ণ করেছিলেন পরশুরামের। তাঁর সত্যপাশে আবদ্ধ স্ত্রৈণ পিতার আদেশ মেনে নিয়ে বনে গিয়েছিলেন। সূর্পণখার রূপ বিকৃত করে খর দূষণ প্রভৃতি চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ

করেছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে রাবণ সীতা হরণ করেছিলেন। রাক্ষসের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধারের চেষ্টায় নিহত জটায়ু পক্ষীর দাহ করেছিলেন। তারপর বানরদের সঙ্গে মিত্রতা করে বালী বধের পরে লঙ্কায় সীতার অবস্থানের কথা জানতে পারেন। সমুদ্রে সেতু বন্ধনের পরে লঙ্কায় প্রবেশ করে তিনি রাবণকে বধ করেছিলেন। রামের কথায় বিভীষণ জ্ঞাতিদের পারলৌকিক ক্রিয়া করেন। তারপর তিনি অশোক বনে সীতাকে দেখতে পান। বিভীষণকে লঙ্কাপুরীর আধিপত্য দিয়ে সবাইকে নিয়ে তিনি পুষ্পক রথে অযোধ্যা যাত্রা করেন।

রাম জটাবল্কলধারী ভরতের কথা শুনে সন্তাপ বোধ করেছিলেন। রামের প্রত্যাবর্তনের কথা শুনে ভরত রামের পাদুকা মাথায় নিয়ে অগ্রসর হলেন। রাম তাঁকে পেয়ে আলিঙ্গন করলেন। অনেক দিন পর প্রজারা তাঁকে পেয়ে ফুলের মালা দিয়ে নৃত্য করেছিল। কুলগুরু বশিষ্ঠ তাঁর অভিষেক করলেন। তাঁর রাজত্ব কালে প্রজাদের রোগ জরা শোক ও ভয় ছিল না, অনিচ্ছায় মৃত্যুও হত না।

এক সময়ে তিনি তাঁর সম্বন্ধে প্রজাদের মনের ভাব জানবার জন্য রাত্রিকালে ভ্রমণ করতে করতে শুনতে পেলেন যে এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে বলছে, স্ত্রৈণ রাম পরগৃহীতা সীতাকে ভরণ পোষণ করতে পারেন, কিন্তু তোমার মতো পরগৃহগামী দুষ্ট অসতীকে আমি গ্রহণ করতে পারি না। এই কথা শোনবার পর রাম লোকভয়ে সীতাকে পরিত্যাগ করলেন এবং সীতা বাল্মীকি মুনির আশ্রমে আশ্রয় নিলেন। সে সময়ে তিনি গর্ভবতী ছিলেন এবং যথাসময়ে কুশ ও লব নামে যমজ পুত্র প্রসব করলেন। বাল্মীকি তাদের জাত কর্ম করলেন।

এই কাহিনী থেকে জানা যায় যে বাল্মীকি রামের সমসাময়িক ছিলেন এবং ইনিই আদি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। কাজেই রামায়ণ একখানি ঐতিহাসিক কাব্য এবং এই কাহিনীই পরবর্তী কালে রচিত নানা পুরাণে স্থান পেয়েছে। এই সময়েই রামের উপরে দেবত্ব আরোপ

করা হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই ভাবে অনেকের উপরেই সেকালে দেবত্ব আরোপ করা হত। কাউকে বড় বা মহৎ বলতে হলে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হত।

পুরাণে তিনজন দশরথের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন যযাতির পুত্র অনুর বংশে জাত চিত্ররথের পুত্র রোমপাদ দশরথ, এঁরই কন্যার নাম শান্তা। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে শান্তার বিবাহ হয়েছিল। এই দশরথের কাল ৩২৭৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। ইক্ষ্বাকু বংশে জাত অজের পুত্র দশরথের কাল ২১৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। প্রায় এই সময়ে যদুবংশেও একজন রোমপাদ ছিলেন। তাঁকেও দশরথ মনে করে শান্তাকে তাঁর পালিতা কন্যাও বলা হয়েছে। শান্তা রামের ভগিনী হতে পারেন না।

'জাভাযাত্রীর পত্রে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এখানকার রামায়ণে রাম সীতা ভাই-বোন; সেই ভাই-বোনে বিবাহ হয়েছিল। একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল; তাঁর মতে এই কাহিনীটাই প্রাচীন। পরবর্তীকাল এই কথাটাকে চাপা দিয়েছে। —ভাই-বোনে বিবাহ বৌদ্ধ ইতিহাসে কোন জায়গায় শোনা যায়; কিন্তু সে আমাদের সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ।" দশরথ জাতকেও নাকি এই রকমের কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, "রামায়ণের রূপকটি খুবই স্পষ্ট। কৃষির হলবিদারণ রেখাকে যদি কোন রূপ দিতেই হয় তবে তাকে পৃথিবীর কন্যা বলা যেতে পারে। শস্যকে যদি নবদূর্বাদল শ্যাম রাম বলে কল্পনা করা যায় তবে সেই শস্যই তো পৃথিবীর পুত্র। এই রূপক অনুসারে উভয়ে ভাই-বোন, আর পরস্পর পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ।" সীতাকে জনকের অযোনিজা কন্যা বলা হয়েছে বলেই সন্দেহ করা হয় যে তাঁর পিতৃপরিচয় পুরাণে গোপন করা হয়েছে।

বর্তমানে যে বাল্মীকি রচিত রামায়ণ আছে, তা অনেক পরবর্তী কালের রচনা। রামের মুখে বুদ্ধের নিন্দা এই সন্দেহকেই সমর্থন করে। অনেকের মতে গোটা উত্তর কাণ্ডটি পরে যুক্ত হয়েছে। এমন

কি এও বলা হয় যে সে যুগের পারিবারিক বিরোধও এই কাব্যে আদর্শ পরিবার বলে চিত্রিত হয়েছে। স্ত্রৈণ পিতার অন্যায় আদেশ পালনকে পুত্রের পিতৃভক্তি বলা হয়েছে এবং দোষগুণে মিশ্রিত একজন সাধারণ মানুষের চরিত্রে দেবত্ব আরোপ করে কাব্যকে ধর্ম গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সীতা হরণের ঘটনা সত্যই ঘটেছিল কিনা তাও সন্দেহ করা হয়। রাবণের যে বংশ পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে তিনি বিশ্রবা ঋষির পুত্র এবং তাঁর মা কৈকসী সুমালী রাক্ষসের কন্যা। বিশ্রবা ছিলেন পুলস্ত্যের পুত্র এবং কুবেরের পিতা। কুবের জন্মেছিলেন ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভে। অর্থাৎ এঁরা বৈবস্বত মন্বন্তরের গোড়ার দিকে বিদ্যমান ছিলেন। এই হিসাবে রাবণের কাল দাঁড়ায় ৩৮০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কিছু পরে। অথচ রামের কাল ২১২৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। তাই কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ রামের সমকালীন হতে পারেন না। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা অনরণ্যের সময়ে এক রাবণ ছিলেন। কুরু বংশের ভরতের পর যে ভরদ্বাজকে পাওয়া যায়, তিনি তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। অনরণ্য রামের চল্লিশ পুরুষের পূর্বে রাজত্ব করেছিলেন। সে রাবণও রামের সমসাময়িক হতে পারেন না এবং তাঁর পক্ষে কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হওয়াও সম্ভব নয়। কাজেই যদি কোন রাবণ সত্যই সীতা হরণ করে থাকেন তো তিনি পরবর্তী কালের রাবণ এবং এই কারণেই অনেকে মনে করেন যে রাবণও একটি সাধারণ নাম, লঙ্কার অধিপতিদের রাবণ বলা হত।

দশরথের আমলে পুরু বংশের রাজা ছিলেন চক্ষু এবং তাঁর পুত্র হর্যশ্ব ছিলেন রামের সমসাময়িক। চক্ষুর পাঁচ পুরুষ পূর্বে অজমীঢ় প্রায় তিরিশ পুরুষ ছেদের পর পুরু বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। অজমীঢ়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলের বংশে চক্ষু এবং কনিষ্ঠ পুত্র বৃহদিষুর বংশে বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিতের পুত্র সেনজিৎ ছিলেন রামের সমসাময়িক। যদুবংশে রোমপাদ ছিলেন দশরথের সমসাময়িক।

রোমপাদের পিতামহ জ্যামঘের কাহিনী বিষ্ণুপুরাণে আছে। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে জগতে যাঁরা স্ত্রীর বশীভূত ছিলেন বা জন্মাবেন, তাঁদের মধ্যে শৈব্যাপতি জ্যামঘই শ্রেষ্ঠ। শৈব্যার পুত্র ছিল না, অথচ পুত্রকাম হয়েও রাজা তাঁর ভয়ে অন্য পত্নী গ্রহণ করতে পাবেন নি। একবার এক প্রবল সংগ্রামে রাজা শত্রু সৈন্য পরাজিত করলেন। নগর ছেড়ে সবাই যখন পলায়ন করছিলেন, রাজা তখন এক বিলাপরত রাজকন্যাকে দেখতে পেলেন। ভয়ে সেই কন্যার নয়ন চঞ্চল হয়েছিল বলে তাঁকে আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছিল। অনুরাগে আকৃষ্ট হয়ে রাজা ভাবলেন, অপত্যের জন্যই বিধাতা বোধহয় আমাকে এই কন্যা দিলেন, আমি একে বিবাহ করব। এই ভেবে সেই বাজকন্যাকে রথে তুলে নিজের নগরে ফিরলেন।

বানী শৈব্যা অমাত্য পরিজন ও ভৃত্যদের নিয়ে বিজয়ী রাজাকে দেখবার জন্য নগর দ্বারে উপস্থিত ছিলেন। রাজার বাম পাশে এই কন্যাকে দেখে কোপে অধর স্ফুরিত করে তিনি প্রশ্ন করলেন, রথে কাকে তুলে এনেছ? ভয় পেয়ে রাজা বললেন, এই কন্যা তোমার পুত্রবধূ। শৈব্যা বললেন, আমার তো পুত্র নেই, তোমারও অন্য পত্নী নেই। তবে একে পুত্রবধূ বলছ কেমন করে? ভয়ে বিবেক নাশ হয়েছিল বলে অসম্বদ্ধ বাক্য পরিহারের জন্য রাজা বললেন, তোমার যে পুত্র হবে, ইনি তাঁরই স্ত্রী হবেন। শৈব্যা হেসে বললেন, বেশ তাই হোক। বলে রাজার সঙ্গে তিনি নগরে প্রবেশ করলেন।

রাজা রানীর এই আলাপ লগ্ন-হোরাংশক সময়ে হয়েছিল বলে সন্তান ধারণের বয়স অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও শৈব্যা অল্পকাল পরে গর্ভবতী হলেন এবং কালক্রমে এক পুত্র প্রসব করলেন। জ্যামঘ এই পুত্রের নাম রাখলেন বিদর্ভ এবং যথাসময়ে বিদর্ভের সঙ্গে সেই রাজকন্যার বিবাহ দিলেন। বিদর্ভ জ্যামঘের বেশি বয়সের সন্তান বলে তাঁর পুত্র রোমপাদ দশরথের সমসাময়িক হয়েছিলেন। রোম-

পাদের পুত্র কুন্তী এবং পৌত্র বৃষ্ণি এবং এঁরই নামে যাদবেরা বৃষ্ণি সংজ্ঞা পেয়েছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমির এক বংশধর জনক নামে মিথিলায় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন ২৭১৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। এই বংশের বিংশ পুরুষে সীরধ্বজ ছিলেন দশরথের সমসাময়িক। সীরধ্বজের পুত্র ভানুমান রামের সমসাময়িক। কিন্তু রামায়ণে এই সব রাজাদের কোন উল্লেখ নেই। রামের বিবাহ উপলক্ষে শুধু বিদেহ রাজ জনকের কথা আছে।

বনবাসী রাম ভারতের পশ্চিম প্রান্তে দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত পঞ্চবটি পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং সীতা হরণের পর তাঁর অন্বেষণে কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে জেনেছিলেন যে লঙ্কাধিপতি রাবণ সীতা হরণ করেছেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক কোন রাজা বা রাজপুত্রের সঙ্গে মিলিত হন নি বা সাহায্য প্রার্থনা করেন নি। শুধু বানর রাজ্যের সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করে তাঁর বড় ভাই বালীকে অন্যায় ভাবে হত্যা করে বানর সেনার সাহায্য নিয়েছিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও তাঁর সমসাময়িক কালের কোন রাজার সাহায্য পান নি। তাই রামায়ণে সেকালের মূল্যবান কোন ঐতিহাসিক তথ্য অনুপস্থিত। রামায়ণকে তাই ইতিহাস না বলে কাব্য বলা হয়েছে এবং কাব্যে কবির কল্পনার আশ্রয় নেবার স্বাধীনতা অপরিসীম। তাই একাধিক কবি বিভিন্ন সময়ে রামায়ণে নানা ঘটনা প্রক্ষেপ করেছেন বলে সন্দেহ করা হয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে, লক্ষ্মণের অঙ্গদ ও চিত্রকেতু নামে দুই পুত্র, ভরতের তক্ষ ও পুষ্কল নামে দুই পুত্র এবং শত্রুঘ্নের সুবাহু ও শ্রুতসেন নামে দুই পুত্র জন্মে। ভরত দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে অসংখ্য গন্ধর্ব বধ করে তাদের ধন এনে রামকে দিয়েছিলেন। শত্রুঘ্ন মধু দৈত্যের পুত্র লবন নামে রাক্ষসকে বধ করে মধুবনে মথুরাপুরী প্রতিষ্ঠা করেন। সীতা তাঁর দুই পুত্র বাল্মীকিকে সমর্পণ করে পাতালে প্রবেশ করেছিলেন।

এই সংবাদ পেয়ে রাম তেরো বৎসর অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের পর জ্যোতির্ময় ধামে যাত্রা করেছিলেন।

বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ রচনার কাল

বিষ্ণুপুরাণ থেকে জানা যায় যে কুশের পুত্র অতিথির বংশে হিরণ্যনাভ ছিলেন মহাযোগী জৈমিনির শিষ্য। হিরণ্যনাভের নিকটেই যাজ্ঞবল্ক্য যোগ শিক্ষা করেন। ইক্ষ্বাকুর বংশ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে কুশের পুত্র অতিথির যোড়শ পুরুষে ছিলেন হিরণ্যনাভ। তাঁর কাল ১৬৯৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। ইনি জৈমিনির শিষ্য ও যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু ছিলেন। জনকরাজ শ্রুত তাঁর সমসাময়িক। কিন্তু নীপ বংশেব রাজা কৃতকে হিরণ্যনাভের শিষ্য বলা হয়েছে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসেব শিষ্য জৈমিনি, জৈমিনির শিষ্য সুকর্মা এবং সুকর্মার শিষ্য হিরণ্যনাভ। কিন্তু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস ও কৃত সমসাময়িক ছিলেন বলে মনে হয় যে জনক বংশের শেষ রাজা কৃতিই সম্ভবত হিরণ্যনাভের শিষ্য। কৃতির কাল ১৩৭৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ বলে মনে হয় যে এই হিরণ্যনাভ ইক্ষ্বাকু বংশের হিরণ্যনাভ নন, ইনি অন্য ব্যক্তি। এর পূর্বেই জনক রাজার সভায় ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা হয়েছিল এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদেব বচনা কাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতক। জৈমিনির মীমাংসা দর্শন তার পূর্বে বচিত হয়েছে। বিচিত্রবীর্যের কাল ১৪৬৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ বলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে তাঁর সমকালীন বলা যেতে পাবে। সুতবাং অসংশয়ে বলা যায় যে বেদ সংহিতাকারে গ্রথিত হয়েছিল এই সময়ে। একখানি পুরাণ সংহিতাও সঙ্কলিত হয়েছিল। অর্থাৎ দ্বাপর ও কলি-যুগের সন্ধিতে পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বদরীনারায়ণ অঞ্চলে বসে প্রাচীন ঋষিদের রচিত বেদ মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করে সংহিতার আকারে সংকলন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পুরাণ ও ইতিহাস নামে যে সব খণ্ড কাহিনী মাগধ ও সূতেরা সংগ্রহ করে ঋষিদের যজ্ঞকালে শোনাতেন, তাও একত্র সংগ্রহ করে একখানি পুরাণ সংহিতাও রচনা

করেন। এই সব সংহিতা তিনি তাঁর শিষ্যদের অধ্যয়ন করান। বেদ রক্ষা করার জন্য তিনি একে বিভক্ত করে তাঁর শিষ্য সুমন্ত জৈমিনী পৈল বৈশম্পায়ন ও পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করান লোমহর্ষণ নামে সূত জাতীয় এক শিষ্যকে। ১৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তৃতীয় ধর্ম যুগের শেষ হয়ে চতুর্থ ধর্ম যুগ আরম্ভ হয়েছে। হয়তো এই সময়েও দ্বিতীয় যুগকে দ্বাপর ও তৃতীয় যুগকে ত্রেতা বলা হত এবং রামায়ণ তৃতীয় যুগের কাহিনী বলে স্বীকৃত ছিল। তারপর কলির আরম্ভেই যুগের ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায়। রামায়ণের কালকে বলা হল ত্রেতা যুগ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দ্বাপরের ঘটনা বলে মনে করা হল। অথচ এই যুদ্ধ হয়েছে কলি যুগে।

কলিযুগের স্থায়ীত্ব শুধু পাঁচশো বৎসর। অর্থাৎ ৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কলিযুগ শেষ হয়েছে। তারপর কল্কি অবতার জন্ম গ্রহণ করে কৃত বা সত্য যুগের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। পুরাণের হিসাবে নূতন সত্য যুগও শেষ হয়ে গেছে ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে এবং বর্তমানে দ্বিতীয় যুগ ত্রেতা চলেছে। কলিযুগের অবসান প্রসঙ্গে এই আলোচনা করা হবে।

এইখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। পণ্ডিতদের ধারণা যে বেদব্যাস একটি সাধারণ নাম। পুরাণে বলা হয়েছে যে প্রতি দ্বাপরে একজন করে ঋষি ব্যাস হয়েছেন এবং তাঁদের নাম বিষ্ণুপুরাণ বায়ুপুরাণ ও কুর্মপুরাণে পাওয়া যায়। ঋষিদের নামের তালিকায় অনেক পরিচিত নামও আছে। এর থেকে অনুমান করা করা যেতে পারে যে সেই সব ঋষি পুরাণকার ছিলেন, অর্থাৎ সূতের মুখে শুনে সেই বৃত্তান্ত পুরাণে ব্যবহার করেছিলেন। পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়নই এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইনিই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে ও পরে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যকে সংকলন ও সংরক্ষণের সুন্দর ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন বলেই আজও আমরা তার পরিচয় পাচ্ছি। এই সব

লিপিবদ্ধ হয়েছে আরও অনেক পরে। সে কাল নির্ণয় করাও অসম্ভব কাজ নয়।

ঐতিহাসিক যুক্তি দিয়ে বেদের সূক্ত রচনার কাল নির্ণয়েরও চেষ্টা করা যেতে পারে। ঋগ্বেদ সংহিতা দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। এর প্রথম ও দশম মণ্ডলে নানা ঋষির রচিত সূক্ত আছে। অবশিষ্ট আটটি মণ্ডলে যথাক্রমে গৃৎসমদ বিশ্বামিত্র বামদেব অত্রি ভরদ্বাজ বশিষ্ঠ কণ্ব ও অঙ্গিরা ঋষি ও তাঁদের বংশধরদেরই রচনা একত্র সংগৃহীত হয়েছে। সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে এই সব বংশের আদি পুরুষেরা বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রথম দিকে বিদ্যমান ছিলেন। এঁদের মধ্যে বশিষ্ঠ অত্রি বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ সপ্তর্ষির অন্তর্গত। অঙ্গিরাও প্রাচীন ঋষি। ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র কিছু পরবর্তী কালের। গৃৎসমদ বামদেব ও কণ্বও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এঁদের নামও পূর্বে পাওয়া গেছে। বৈবস্বত মন্বন্তরের আরম্ভ ৩৮১৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে। বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার শাপ মুক্তির চেষ্টায় বশিষ্ঠকে পাওয়া যায়। কণ্বকে পাওয়া যায় রাজা দুষ্মন্তের কালে অর্থাৎ ৩৩৮৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এবং বিশ্বামিত্রর কাল আনুমানিক ৩০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এই বিশ্বামিত্রের পুত্রের নাম মধুচ্ছন্দা। তিনি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম থেকে দশম সূক্তের রচয়িতা। একাদশ সূক্তের ঋষি মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতৃ ঋষি। চতুর্বিংশ থেকে ত্রিংশ সূক্তের রচয়িতা অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ। বিশ্বামিত্র এঁরই প্রাণ রক্ষা করে তাঁর পিতা হয়েছিলেন। এই ভাবেই কণ্বের পুত্র মেধাতিথি দ্বাদশ থেকে ত্রয়োবিংশ সূক্তের রচয়িতা। মেধাতিথি কুরুর পিতা সংবরণের সমসাময়িক এবং তাঁব কাল ১৮৪১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এই ভাবে ঋষিদের নাম দেখে তৎকালীন রাজার রাজত্ব কাল অনুসারে প্রায় প্রতি সূক্তের রচনা কাল নির্ণয় করা সম্ভব। স্থূল ভাবে বলা যেতে পারে যে বেদের রচনা আরম্ভ হয়েছিল ৩৮০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পর এবং এর একটা বৃহৎ অংশ রচিত হয়েছিল ৩০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ ও তার পরে। বেদের রচয়িতা ঋষিরা

দেবাসুরের সংগ্রাম দেখেন নি। তাই তাঁদের রচনায় ইন্দ্রাদি দেবতার নামের উল্লেখ থাকলেও তাঁদের কীর্তি-কলাপ তাঁরা শুনে লিখেছেন; তাঁদের রচনায়, ভারতের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছরের পূর্বেকার অবস্থা। বেদ এক দিনের রচনা নয়, দু একশো বছরেও বেদ রচনা শেষ হয় নি। ভারতের আদি গ্রন্থ বেদ রচিত হয়েছে প্রায় সহস্র বৎসর ধরে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ১৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এই বেদ সংগ্রহ সংকলন ও বিভাগ করে সংহিতার আকার দিয়েছিলেন।

কিন্তু আদিগ্রন্থ বেদ এ দেশের আদি রচনা নয়। আদি রচনা নিঃসন্দেহে পুরাণ। এ দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস রক্ষার জন্য মাগধ ও সূত নামের ঐতিহাসিক নিযুক্ত হয়েছিলেন পৃথু রাজার আমলে। তাঁর কাল ৪৮৯৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। সেই সময় থেকেই দেশের যাবতীয় ঘটনার কথা মুখে মুখে রক্ষিত হয়ে আসছিল। এই জন্যই বলা হয়েছে যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা প্রথমে পুরাণ ও পরে বেদ বলেছিলেন। ঋষিরা যখন বেদ রচনা করছেন, তখন দেশের প্রাচীন ইতিহাস পুরাণে বিধৃত ছিল এবং বেদের ঋষিরা তাঁদের রচনার নানা স্থানে পুরাণের ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যাঁরা মনে করেন যে বেদের কোন রূপক নিয়ে পুরাণে কাহিনী রচনা করা হয়েছে, তাঁরা ভুল করেন। ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। পুরাণের কাহিনীই বেদে রূপকের মতো করে ব্যবহার করা হয়েছে। বেদ রচনার কালে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের দিবি আরোহণ সম্পূর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁদের অনেকেই এ কালের দেবতায় পরিণত হয়েছেন এবং আকাশের জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে স্থান পেয়েছেন অনেকে। বেদের ঋষিরা তাঁদের নামে স্তব রচনা করেছেন ভয়ে ভক্তিতে ও বিস্ময়ে। দেবতা ও দৈত্যরাও যে মানুষ ছিলেন, সে কথা ভুলে গিয়ে দেবতাদের কীর্তি কলাপে অলৌকিক ক্ষমতার অভিব্যক্তি দেখিয়েছেন। এই বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অবকাশ আছে। তাতে আরও অনেক

ঐতিহাসিক সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে। আর্য জাতি বা দেবতাদের বংশ-ধররা কেন ইলাবৃত বর্ষ পরিত্যাগ করে ভারতে এসে বাস করতে আরম্ভ করেন এবং তাঁদের পূর্বপুরুষদের দিবি আরোহণের ব্যাপারে সচেষ্ট হন, তারও কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তাঁরাই দেবতাদেব স্বর্গে ও মনু বংশের মানবদের মর্ত্যে স্থাপন করে দেবতা-বিরোধী দৈত্য দানবদের পাতালবাসী করেছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাপর ও কলিযুগ সন্ধি

(খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চদশ শতক)

মহাভারত, কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালে ভারতের মানচিত্র

রামের পর ইক্ষ্বাকু বংশে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন রাজা অযোধ্যায় রাজত্ব করেন নি। মিথিলায় জনক বংশেও কোন শক্তিশালী রাজা ছিলেন না। পুরু বংশের রাজারাই হস্তিনাপুর অঞ্চলে রাজত্ব করছিলেন। পুরাণে পাওয়া যায় যে হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠাতা হস্তীর পর তিরিশ পুরুষের ছেদ আছে। তারপর অজমীঢ় রাজা হন। মনে হয় যে এর পরেও আবার ছেদ আছে। পুরাণের মতে অজমীঢ়ের পত্নী বহুকাল তপস্যা করে পুত্র লাভ করেন। কোনও পুরাণে এই কাল শত বৎসর, কোনও পুরাণে অযুত বৎসর। মহাভারতের মতে অজমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষ রাজ্যচ্যুত হন এবং এই বংশ সহস্র বৎসর রাজ্যচ্যুত অবস্থায় ছিলেন। ঋক্ষের পুত্র সংবরণ এই রাজ্য অধিকার করেন। বিষ্ণু পুরাণে ঋক্ষ অজমীঢ়ের পুত্র। অন্য মতে ঋক্ষের পিতার নাম সোমক এবং সংবরণ ঋক্ষের পুত্র। এই দেখে অনেকে মনে করেন যে সোমককেই অজমীঢ় বলা হয়েছে, কিংবা সোমকের অন্য নাম ছিল অজমীঢ়। অজমীঢ়ের অন্য এক পুত্রের বংশে নীপের জন্ম এবং তাঁর বংশের পরিচয়ও পুরাণে পাওয়া যায়। চন্দ্রবংশের আর একটি শাখা যদুবংশ। এই বংশের জ্যামঘ বিদর্ভ রোমপাদ কুন্তী ও বৃষ্ণির কথা বলা হয়েছে। এই বংশেই জন্মেছেন অন্ধকের পুত্র কুকুরের বংশে আহুকের পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের কন্যা দেবকী কৃষ্ণের জননী এবং উগ্রসেন মথুরার রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কংস তাঁকে কারারুদ্ধ করে নিজে রাজ্য

পরিচালনা করেছিলেন। অন্ধকের অন্য পুত্র ভজমানের বংশে শূরের জন্ম। তাঁর পুত্র বসুদেব কৃষ্ণের পিতা এবং কন্যা পৃথা যুধিষ্ঠিরের জননী। সংবরণের পুত্র কুরু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কুরুক্ষেত্র। কুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধন্বর বংশে জন্ম উপরিচর বসুর। তাঁর পুত্র বৃহদ্রথ এবং এই বংশেরই দ্বিতীয় বৃহদ্রথ জরাসন্ধ নামে মগধের রাজা হয়েছিলেন। যযাতির পুত্র অনুর বংশে জন্ম কর্ণের পালক পিতা অধিরথের এবং বৃষ্ণি বংশে জন্ম অক্রূরের। দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদও অজমীঢ়ের পুত্র নীলের বংশে জন্মেছেন।

রামায়ণের কাহিনী যেমন প্রায় সমস্ত পুরাণেই পাওয়া যায়, মহাভারতের বেলায় তা হয় নি। মহাভারতের সম্পূর্ণ কাহিনী শুধু মহাভারতেই আছে। অন্যান্য পুরাণে আছে কৃষ্ণের কথা এবং মহাভারতের কিছু খণ্ড চিত্র। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। পুরাণ সংহিতাকার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মহাভারতের কালে সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি সেই ঘটনার কথা তাঁর মহাকাব্যে শ্লোকবদ্ধ করবার পর তাকে সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর পুরাণ সংহিতার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাই পরবর্তী কালের মহাপুরাণ রচয়িতারা মহাভারতের সমগ্র কাহিনী তাঁদের পুরাণে স্থান দেন নি, প্রয়োজন বোধে কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন মাত্র। মহাভারতে কৃষ্ণের প্রথম দর্শন মেলে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়। তাঁর শৈশব ও যৌবনের কোন কথা মহাভারতে নেই বলে বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে তা বিশদ ভাবে বলা হয়েছে।

মহাভারত

মহাভারতের কাহিনী আরম্ভ হয়েছে উপরিচর বসু থেকে। এঁর জন্ম যযাতির পুত্র পুরুর বংশে কুরুক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাতা কুরুর চার পুরুষ পরে। ইনি ছিলেন চেদি দেশের রাজা। তাঁর বীর্যে জন্ম এক

পুত্র কন্যার। কন্যা সত্যবতী মৎস্যজীবীদের নিকটে পালিত বলে নাম হয়েছিল মৎস্যগন্ধা এবং পুত্রটি মৎস্য নামে ধার্মিক রাজা হয়েছিলেন। মহাভারত রচয়িতা দ্বৈপায়ন সত্যবতীর কন্যাবস্থার পুত্র। পরাশর তাঁর জনক। যমুনার দ্বীপে জন্ম বলে নাম হয়েছিল দ্বৈপায়ন। ব্যাস নাম হয় বেদ বিভাগ করে।

সত্যবতীকে বিবাহ করেন শান্তনু। হস্তীর চার পুরুষ পরে কুরু তপস্যা করেছিলেন কুরুক্ষেত্রে এবং তাঁরই নামে কুরুজাঙ্গল দেশ খ্যাত হয়। কুরুর অধস্তন সপ্তম পুরুষের নাম প্রতীপ, শান্তনু তাঁরই পুত্র। পূর্বে তিনি গঙ্গাকে বিবাহ করেছিলেন এবং ভীষ্ম নামে তাঁর একটি পুত্র হয়। সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্র রাজা হবেন এবং ভীষ্ম বিবাহ করবেন না, এই শর্তে শান্তনু তাঁকে বিবাহ করেন। সত্যবতীর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র হয়। শান্তনুর মৃত্যুর পর রাজা হলেন চিত্রাঙ্গদ, কিন্তু এক গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হল। তার পর বিচিত্রবীর্য রাজা হলেন। ভীষ্ম কাশীরাজের দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে হরণ করে এনে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। কিন্তু সাত বৎসর পরে যক্ষ্মা রোগে তাঁর মৃত্যু হল।

এর পর বংশ রক্ষার জন্য সত্যবতী তাঁর পুত্র দ্বৈপায়নকে নিয়োগ করলেন। এতে অম্বিকার এক অন্ধ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার এক পাণ্ডুবর্ণ পুত্র পাণ্ডুর জন্ম হল। অম্বিকাকে পুনরায় দ্বৈপায়নের নিকটে পাঠানো হলে তাঁর পরিবর্তে এক দাসী তাঁর নিকটে গেল এবং দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম হল। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ও বিদুর শূদ্রার গর্ভজাত, তাই পাণ্ডু রাজা হলেন। ভীষ্ম গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারার সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ দিলেন, গান্ধারী চোখে কাপড় বাঁধলেন। যদু বংশের শূরের কন্যা পৃথাকে বিবাহ করলেন পাণ্ডু, কুন্তীভোজ তাঁকে পালন করেছিলেন বলে তার কুন্তী নাম হয়। ইনি দুর্বাসার নিকটে মন্ত্র পেয়েছিলেন, তাতে দেবতাদের আহ্বান করতে পারতেন। এই ভাবে কুমারী অবস্থায় সূর্যের ঔরসে তাঁর কর্ণ নামে যে পুত্র হয়,

তাকে তিনি জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। সূত বংশের অধিরথ তাঁকে পালন করেন। ভীষ্ম পাণ্ডুর জন্য বাহ্লীক বংশীয় শল্যের ভগিনী মাদ্রীকে পণ দিয়ে আনলেন। বিদুরের বিবাহ দিলেন দেবক রাজার শূদ্রা পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত কন্যার সঙ্গে।

পাণ্ডু দুই পত্নীকে নিয়ে বনে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন। সেখানে মৃগরূপে মৈথুনরত এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করার জন্য পাণ্ডু শাপগ্রস্ত হলেন যে স্ত্রীসঙ্গম কালে তাঁর মৃত্যু হবে। এরপব তাঁরা হস্তিনাপুরে সংবাদ পাঠিয়ে তপস্বীর জীবন যাপন করতে লাগলেন। কুন্তী পাণ্ডুব অনুরোধে মন্ত্রবলে ধর্মকে আহ্বান করে যুধিষ্ঠিরের জন্ম দিলেন। গান্ধারী তখন গর্ভবতী ছিলেন এবং এই সংবাদ পেয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ে গর্ভপাত কবলেন। সেই লোহাব মতো কঠিন মাংসপিণ্ড শীতল জলে ভিজিয়ে রেখে একশো পুত্র লাভ করলেন। তাঁদেব মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুর্যোধন কুন্তীর দ্বিতীয় পুত্র ভীমেব সঙ্গে এক দিনেই জন্মালেন। ভীম বায়ুব পুত্র, অর্জুন ইন্দ্রেব। মন্ত্রবলে মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করে নকুল ও সহদেবের জন্ম দিলেন। তারপর পাণ্ডুব মৃত্যু হল এবং মাদ্রী সহমরণে প্রাণত্যাগ করলেন। ঋষিরা কুন্তী ও রাজপুত্রদের নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন। এই সময়ে যুধিষ্ঠিরের বয়স যোল, ভীমের পনর, অর্জুনের চোদ্দ এবং নকুল সহদেবের তের। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সঙ্গে তাঁরা এক সঙ্গে বড় হতে লাগলেন। ক্রমে এঁদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ চরম পর্যায়ে পৌঁছল এবং এরই পরিণাম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ হয়েছিল ১৪১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কুরুক্ষেত্রের ময়দানে।

উভয় পক্ষেরই জন্ম কুরুবংশে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা কৌরব ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্ররা পাণ্ডব নামে অভিহিত হয়েছে। কৌরব ও পাণ্ডবদের বিবাদের কারণ স্বচ্ছ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। সত্যবতীর জন্ম সম্বন্ধে একটি কাহিনী কল্পিত হয়েছে। রাজা উপরিচর বসু তাঁর পিতা এবং মাতা কোন ধীবর কন্যা। ভীষ্ম যখন যুবক, তখন তাঁর পিতা শান্তনু তাঁকে বিবাহ করেন। সত্যবতীর

পুত্ররা যৌবনে পদার্পণ করেই মারা যান। তাই তাঁদের ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের প্রয়োজন হয়েছিল সেকালের প্রচলিত নিয়মে। জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলেই রাজ্যের অধিকারী হন নি। রাজা হয়েছিলেন কনিষ্ঠ। দুর্ভাগ্যক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র পরে জন্মায়। পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম হয় এক বৎসর পূর্বে। গান্ধারা ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর পুত্রও রাজ্যের অধিকারী হবেন না সামাজিক নিয়মে। বয়োজ্যেষ্ঠ হলে দুর্যোধনই রাজা হতে পারতেন। পাণ্ডুর পুত্ররা দেবতার ঔরসে জন্মেছেন বলা হয়েছে, এটা সম্ভব নয়। পাণ্ডু যেখানে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করছিলেন, তার নিকটে ঋষিরা বাস করতেন। এই ঋষিরাই দেবতার বংশ জাত বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন বলে মনে হয়। ধর্মের বংশ জাত বলে ধর্ম বলা হয়েছে। পাণ্ডবদের বয়সের পার্থক্য দেখে মনে হয় যে কুন্তী স্বাভাবিক নিয়মে এই পুত্রদের জন্ম দিয়েছিলেন। তারপর মাদ্রী পাণ্ডুর অনুমতি পেয়ে যমজ পুত্রের জন্ম দেন। মনে হয়, কর্ণও এই ভাবে সূর্য বংশীয় কোন ব্যক্তির ঔরসে জন্মেছিলেন।

পাণ্ডু পাণ্ডুবর্ণ হয়ে জন্মেছিলেন। এটি কোন নৈসর্গিক রোগ বলে মনে হয়। এখানে পাণ্ডু অর্থ ফ্যাকাশে নয়, পাণ্ডু রোগ অর্থাৎ নেবা বা jaundice হতে পারে। কিংবা শ্বেতী জাতীয় কোন চর্মরোগ। মানুষের হয়তো সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে সেই রোগে পুরুষের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না। পাণ্ডু তা বিশ্বাস করেই কিংবা নিজে অক্ষম হয়েই পত্নীদের ক্ষেত্রজ পুত্র লাভের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পূর্বে তিনি তপস্বীর জীবন যাপন করবার সিদ্ধান্ত হস্তিনাপুরে জানিয়েছিলেন বলেই ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য শাসন করতে আরম্ভ করেন। পরে যুধিষ্ঠিরের জন্মের সংবাদ পেয়ে গান্ধারী ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। পাণ্ডবেরা যখন হস্তিনাপুরে আসেন, তখন দুর্যোধনের বয়স পনর বৎসর। তিনি বোধহয় ধরে নিয়েছিলেন যে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে তাঁরই অধিকার। তাই যুধিষ্ঠিররা এসে পড়াতে তিনি ঈর্ষান্বিত ও

বিষণ্ণ হয়ে যে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আরও একটি সামাজিক নিয়ম লক্ষণীয়। তা হল ঔরসজাত পুত্র ও ক্ষেত্রজ পুত্রের সমান অধিকার। অর্থাৎ রাজ্যের অধিকার লাভের জন্য রাজার পুত্র না হয়ে রানীর পুত্র হলেও চলবে, রাজাকে জনক না হয়ে রানী জননী হলেও আপত্তি নেই। বিদুর শূদ্রার গর্ভজাত বলে বঞ্চিত হয়েছিলেন। ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত হলে কী হত বলা যায় না। বিদুরের পত্নীর পরিচয়ও অস্বাভাবিক—ক্ষত্রিয় রাজার শূদ্রা রানীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত কন্যা। এর মধ্যে নিন্দনীয় কিছু ছিল না বলেই এ পরিচয় গোপন করার কোন প্রয়োজন হয় নি।

সমাজের নিয়মে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং পাণ্ডবদের খ্যাতি শুনে ধৃতরাষ্ট্রের মন দূষিত হল। দুর্যোধনের পরামর্শে তিনি পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠালেন এবং তাঁদের জতুগৃহে আগুনে দগ্ধ করে হত্যার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বিদুরের চেষ্টায় তাঁরা রক্ষা পেলেন, পালিয়ে গিয়ে অজ্ঞাত ভাবে বাস করতে লাগলেন। এই সময়ে ভীম হিড়িম্বা নামে এক রাক্ষসীকে বিবাহ করলেন এবং ঘটোৎকচ নামে তাঁর এক পুত্র হল। তাঁরা শুনলেন যে পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হচ্ছে। এই কথা শুনে তাঁরা পাঞ্চাল দেশে গিয়ে ব্রাহ্মণের বেশে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হলেন। লক্ষ্যভেদ করে অর্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করলেন এবং মায়ের আদেশে পাঁচ ভাই এক সঙ্গে দ্রৌপদীকে বিবাহ করলেন। এই বিবাহের সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ উপহার পাঠালেন। কুন্তী ছিলেন কৃষ্ণের আপন পিসি। ধৃতরাষ্ট্র খবর পেয়ে ভীষ্ম দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনলেন।

এর পর নিয়ম ভঙ্গের জন্য অর্জুনের বনবাসে যেতে হল। এই সময়ে তিনি উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করলেন। উলূপীর পুত্রের নাম ইরাবান ও বভ্রুবাহন চিত্রাঙ্গদার পুত্র। তিনি কৃষ্ণেরই পরামর্শে তাঁর ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করলেন। সুভদ্রার পুত্রের নাম

অভিমন্যু। দ্রৌপদীরও পাঁচটি পুত্র হল। কৃষ্ণ ও অর্জুন খাণ্ডব বন দাহ করলেন এবং ময় দানব পাণ্ডবদের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে সভা নির্মাণ করলেন। সেই সভার সৌন্দর্য দেখে দুর্যোধন ঈর্ষান্বিত হলেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করলেন। তার পূর্বে কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনকে নিয়ে মগধ রাজ্যে গেলেন এবং ভীমকে দিয়ে জরাসন্ধকে বধ করালেন। তারপর দিগ্বিজয় করে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। সভায় কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করা হলে চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণের নিন্দা করেন এবং এই বিবাদের জন্য কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করেন।

কৌরবদের গাত্রদাহ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তারা পাশা খেলার আয়োজন করে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে পাণ্ডবদের ডেকে আনলেন। যুধিষ্ঠির এই পাশা খেলায় সর্বস্ব হেরে গেলেন এবং দ্রৌপদীও রাজসভায় নিগৃহীত হলেন। দ্বিতীয়বার খেলা হল এবং পরাজিত হয়ে পাণ্ডবদের বারো বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের জন্য বনে যেতে হল। নানা দুঃখ দুর্দশার মধ্যে তাঁরা বারো বৎসর বনবাসের পর বিরাট রাজ্যে এলেন অজ্ঞাতবাসের জন্য। বিভিন্ন নাম নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হয়ে এক বৎসর কাটিয়ে দিলেন। বিরাট রাজার কন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হল।

অজ্ঞাতবাস শেষ করে পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে পাঁচখানি গ্রাম চাইলেন পাঁচ ভাইএর জন্য। কিন্তু বিনা যুদ্ধে তাঁরা কিছুই দিতে রাজী হলেন না। যুদ্ধ আসন্ন দেখে কৃষ্ণ কৌরবদের বোঝাতে গেলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। শেষ পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের ময়দানে দুই পক্ষ যুদ্ধের জন্য মিলিত হলেন। কিন্তু অর্জুন আত্মীয় বধে বিমুখ হলে সারথি কৃষ্ণ তাঁকে গীতার উপদেশ দিলেন। এই যুদ্ধে ভীষ্মই প্রথমে সেনাপতি হয়েছিলেন কৌরব পক্ষে, তাঁর পতনের পর একে একে দ্রোণ কর্ণ ও শল্য সেনাপতি হয়েছিলেন। ভারতের প্রায় সমস্ত রাজা এসেছিলেন এই যুদ্ধে কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করতে। প্রায় সকলেই নিহত হলেন। ইক্ষ্বাকু বংশের বৃহদ্বল এই

যুদ্ধে নিহত হন, কিরাত রাজ ভগদত্তও নিহত হন। ভীমের সঙ্গে গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ হয় এবং তার পর তাঁর মৃত্যু হয়। এই যুদ্ধে ঘটোৎকচ ইরাবান অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রও নিহত হন।

যুদ্ধের পর কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলেন। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতেরও জন্ম হল। ব্যাসের উপদেশে যুধিষ্ঠির পুনরায় অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। অর্জুন যজ্ঞের অশ্বের সঙ্গে যাত্রা করে নানা দেশে যুদ্ধ করলেন। নিজের পুত্র বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃতপ্রায় হয়েছিলেন। উলূপী তাঁকে রক্ষা করেন। তার পর অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়।

এর পর ধৃতরাষ্ট্র সস্ত্রীক বনে গেলেন। বিদুরের তিরোধান হল। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীরও মৃত্যু হল। দ্বারকায় যাদবরা গৃহবিবাদে বিনষ্ট হলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ দেহত্যাগ করলেন। অর্জুন দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণের পরিবার নিয়ে ফিরলেন। পঞ্চনদে যাদব নারীরা আভীর দস্যুদের হাতে লুণ্ঠিত হল। যুধিষ্ঠিরাদি এর পর মহা প্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন। পথে মৃত্যু হল দ্রৌপদী সহদেব নকুল অর্জুন ও ভীমের। শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির একা স্বর্গ যাত্রা করলেন। নরক দর্শনের পর তিনি স্বর্গে পৌঁছলেন।

মহাভারতের কাহিনীর শেষ এইখানে।

রামায়ণ ও মহাভারত দুখানিই কাব্য এবং ধর্মগ্রন্থের মতো সমাদৃত। এদের মধ্যে প্রভেদ এই যে রামায়ণ কাব্য-ধর্মী এবং মহাভারত ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ। মহাপুরাণের সঙ্গে মহাভারতের প্রধান পার্থক্য শুধু একটি। সেটি হল, মহাভারতে একটি পরিবারের সুদীর্ঘ কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কল্কি পুরাণ নামের একখানি ক্ষুদ্র উপপুরাণ ছাড়া অন্য কোন পুরাণে এই রকম ধারাবাহিক কাহিনী পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরাণের ছয়টি অংশের মধ্যে শেষ দুটি অংশে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ জীবন পাওয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আরও বিশদ ভাবে কৃষ্ণের জীবন ও দর্শন নিয়ে

আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাতে অন্যান্য পুরাণের মতো পঞ্চলক্ষণের বিবিধ বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কালের বিচারও করা যেতে পারে। শান্তনুর কাল ১৪৮৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। তাঁর পৌত্র পাণ্ডুর কাল ১৪৪০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। কলি যুগের আরম্ভ ১৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এবং তাঁর পূর্ববর্তী ৮৪ বৎসর দ্বাপরের সন্ধ্যাংশ। কলির সন্ধ্যা ছিল ৪২ বৎসর, অর্থাৎ ১৪১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত। এই বৎসরেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং কলির সন্ধ্যা শেষ হয়ে কলি কালের আরম্ভ হয়। তবে কৃষ্ণের মৃত্যুর পরেই কলি প্রবল হয়েছে বলে সর্ব সাধারণের বিশ্বাস। বলা বাহুল্য যে কলি একটি ধর্মযুগের কল্পিত নাম। ইতিহাসের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, কৃষ্ণের কাল নির্ণয়ের সঙ্গেও তা যুক্ত নয়।

কৃষ্ণ

মহাভারতে কৃষ্ণকে আমরা প্রথম দেখি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়। তাঁর জন্ম ও শৈশবের কথা মহাভারতে নেই, আছে বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে। এমন বিরাট ব্যক্তিত্ব সে যুগে আর ছিল না। তাই কৃষ্ণ চরিত্র আলোচনা না করলে এই যুগের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পুরাণে কৃষ্ণের উপরে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। আরও অনেকের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে যে বিষ্ণুর অংশে জন্ম। পুরাকালে বিষ্ণুর মতো শক্তিশালী ও অদ্বিতীয় রাজা আর কেউ ছিলেন না বলেই এই রকম উক্তি করা হত। কৃষ্ণ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামকেও বিষ্ণুর অংশে জন্ম বলে গৌরবান্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণ স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তাঁকে বিষ্ণুর অংশে জন্ম না বললেও চলত। নিজের কীর্তির জন্যই তিনি দেবত্ব লাভ করতেন। কৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ ভেবে তাঁকে নানা অলৌকিক ঘটনার আবরণ থেকে মুক্ত করতে হবে।

বিষ্ণুপুরাণে মৈত্রেয়র প্রশ্নের উত্তরে পরাশর বলেছিলেন, পুরাকালে

বসুদেব দেবকের কন্যা দেবকীকে বিবাহ করেছিলেন। এই বিবাহে ভোজবংশের কংস সারথি হয়ে দম্পতির রথ চালনা করছিলেন। সেই সময়ে দৈববাণী হয়েছিল, পতির সঙ্গে যাকে তুমি রথে নিয়ে যাচ্ছ, তার অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার প্রাণ হরণ করবে। কংস এই কথা শুনেই খড়্গ নিয়ে দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তখন বসুদেব বললেন, দেবকীকে আপনি বধ করবেন না। এর গর্ভে উৎপন্ন সব সন্তানকে আমি আপনার হাতে সমর্পণ করব। বেশ, তাই হবে। বলে কংস দেবকীকে হত্যা করলেন না।

কৃষ্ণের উপরে দেবত্ব আরোপ করার জন্য বলা হল যে পৃথিবী নানা ভাবে পীড়িত হয়ে দেবতাদের নিকটে তাঁর দুঃখের কথা বললেন, দৈত্যরা মর্ত্যে প্রজাদের অহর্নিশি ক্লেশ দিচ্ছে। কালনেমিকে বিষ্ণু বধ করেছিলেন। সে এখন উগ্রসেনের পুত্র কংস রূপে জন্মেছে। তার সঙ্গে আরও অনেক দুরাত্মা রাজগৃহে জন্মেছে। তাদের ভারে আমি যেন রসাতলে না যাই। দেবতারা গিয়ে বিষ্ণুকে এই কথা বললে; তিনি নিজের সাদা ও কালো দুই গাছি কেশ নিয়ে বললেন, আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর দুঃখ দূর করবে। তোমরাও পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

কিন্তু ঐতিহাসিকেরা ভাববেন, কংসকে কেন অসুর বলা হল, কেন তাঁকে বধ করবার প্রয়োজন বোধ হয়েছিল? এ কথা বুঝতে হলে প্রথমেই জানা দরকার যে কংস কে? আর কংসই বা কেন বসুদেব ও দেবকীর পুত্র নিজের হত্যাকারা হবেন ভেবেছিলেন? এর উত্তর আছে যদুবংশের বংশলতায়। আহুকের দুই পুত্র, দেবক জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উগ্রসেন। উগ্রসেন মথুরায় রাজা হয়েছিলেন, কিন্তু দেবকের কথা নেই। দেবকের চার পুত্রের কথাও জানা যায় না। তাঁর সাতটি কন্যার মধ্যে বড় দেবকী, রোহিণী প্রভৃতি অন্য কন্যারাও বসুদেবের পত্নী ছিলেন। কংস তাঁর পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে নিজে রাজা হয়ে বসেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে বা শ্রীমদ্‌ভাগবতে কৃষ্ণের জন্মের

এই সব কথা আলোচিত হয় নি। মনে করলে অন্যায় হবে না যে কংস তাঁর পথের কাঁটা সবাইকে সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং নিজের কিছু বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে রাজ্য শাসন করছিলেন। কংস হয়তো ভেবে-ছিলেন যে দেবকীর পুত্ররা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন। কিন্তু শান্ত প্রকৃতির ধর্মনিষ্ঠ বসুদেবকে তিনি অবিশ্বাস করেন নি। এ ছাড়াও একটি সম্ভাবনার কথা সন্দেহ করা অসঙ্গত হবে না। সেটা হল, কোন জ্যোতিষী হয়তো গণনা করে বলেছিলেন যে ভাগিনেয়দের হাতে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। এই ভয়েই কংস সতর্ক হয়েছিলেন এবং পুরাণে জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীকে দৈববাণী বলা হয়েছে। দৈববাণী কখনও সত্য হতে পারে না। আত্মগোপন করে আড়াল থেকে কিছু বলা সম্ভব হতে পারে, কিংবা কেউ কানে কানেও এই কথা বলে থাকতে পারেন। যাই হয়ে থাক, কংস এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে দেবকী ও বসুদেবকে গুপ্ত ভাবে গৃহে আবদ্ধ করে রাখলেন। বসুদেবও তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে পুত্রের জন্ম হলেই কংসের হাতে সমর্পণ করতে লাগলেন।

কৃষ্ণের জন্ম নিয়ে আরও অনেক অলৌকিক কথা আছে। যা ঐতিহাসিক সত্য, তা হল ১৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে এক দুর্যোগের রাত্রে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। মধ্য রাতেই বসুদেব কৌশলে কারাগার থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণকে যমুনার তটে নন্দ গোপের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন। বলা হয়েছে যে বসুদেব নন্দের সদ্যোজাত কন্যাকে এনে কংসের হাতে দিয়েছিলেন এবং কংস যখন সেই কন্যাকে শিলা পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেন, তখন সে আকাশেই অন্তর্হিত হয়। তারপর কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারামুক্ত করে বললেন, বৃথাই আমি আপনার সন্তানদের বিনষ্ট করেছি, এর জন্য অনুতাপ করবেন না। কংস জানতে বা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর হত্যাকারী বাহিরে আছে। তাই তাঁর অসুরদের আদেশ দিয়েছিলেন যে বলবান বালক দেখলেই তাকে বধ করতে হবে। বসুদেব এই

কথা শুনেছিলেন বলে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই নন্দের নিকটে গিয়ে বললেন, আপনারা শীঘ্র গোকূলে যান। রোহিণীর গর্ভজাত আমার পুত্র বলরামকেও আপনি নিজের পুত্রের মতো রক্ষা করবেন। বসুদেবের কথায় তাঁরা গোকুলে ফিরে গেলেন।

তাঁরা যখন গোকুলে বাস করছিলেন, তখন এক রাতে বালক-ঘাতিনী পূতনা নিদ্রিত কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে স্তন্য দান করছিল। রাতে পুতনা কাউকে স্তন্য দিলে অল্প ক্ষণের মধ্যেই তার সকল অঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কৃষ্ণের স্তন্য পানে পূতনা ম্রিয়মান হয়ে ভূমিতে পড়ল। এই পূতনা বধ একটি রূপক বলে মনে হয়। কৃষ্ণ পেঁচোয় পাওয়া জাতীয় কোন বাল্য রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর রোগ সেরে গিয়েছিল। এই ঘটনাই রূপকে বলা হয়েছে। কৃষ্ণেব শকট ভঞ্জন বা যমালার্জুন ভঙ্গও রূপক বলে মনে হয়। এব জ্যোতিষিক ব্যাখ্যাও হতে পারে। অসুর বধ বা কালীয় দমন কোন বাল্য ক্রীড়া বলে মনে করা যেতে পারে।

কৃষ্ণের গোবর্ধন পর্বত ধারণ কোন আশ্চর্য ঘটনা নয়। বিষ্ণু-পুরাণে আছে, বর্ষা অতীত হয়ে শরৎকাল উপস্থিত হলে কৃষ্ণ ব্রজে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে ব্রজবাসীরা ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ করতে উদ্যত হয়েছেন। বৃদ্ধ গোপদের দেখে কৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, এ কোন্ ইন্দ্র-যজ্ঞের জন্য আপনারা হর্ষ প্রকাশ করছেন? তাঁর প্রশ্ন শুনে নন্দ গোপ বললেন, বর্ষা কালে দেবরাজ ইন্দ্র বারি বর্ষণ করেন। তাতে আমাদের গাভীরা বৃষ্টির জন্য বর্ধিত শস্যে হৃষ্ট ও পুষ্ট হয়ে দুগ্ধ ধারণ করে। তাই আমরা ইন্দ্র যজ্ঞ করি। এই কথা শুনে কৃষ্ণ বললেন, ত্রয়ী তর্কশাস্ত্র দণ্ডনীতি ও বার্তা এই চার প্রকার বিদ্যার মধ্যে কৃষি বাণিজ্য ও পশুপালন বার্তার অন্তর্গত। আমরা কৃষি বা বাণিজ্যজীবী নই। আমরা বনচর এবং গাভীই আমাদের দেবতা। বনের সীমারূপে পর্বতের অবস্থান। কাজেই পর্বতই আমাদের শ্রেষ্ঠ গতি, গাভী ও গিরি আমাদের দেবতা। তাই আজ থেকে ইন্দ্র যজ্ঞের পরিবর্তে গিরি যজ্ঞের

প্রবর্তন করুন। আমরা গোবর্ধন গিরির পূজা করব। নন্দ বললেন, খুবই যুক্তিযুক্ত কথা। এখন থেকে গিরি যজ্ঞ প্রবর্তিত হোক।

ব্রজবাসীরা তখন গিরি যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। কিন্তু নিজের যজ্ঞ প্রতিহত হবার জন্য ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে গোধন বিনাশের জন্য ভয়ঙ্কর বায়ু ও বারিবর্ষণ শুরু করলেন। ক্ষণকালের মধ্যে সেই ধারা বর্ষণে পৃথিবী আকাশ ও চারিদিক একাকার হয়ে গেল। কৃষ্ণ গরু ও গোপদের দুর্দশা দেখে গোবর্ধন পর্বতকে উৎপাটন করে এক হাতে অবলীলাক্রমে ছত্রের মতো ধারণ করে বললেন, তোমরা নির্ভয়ে গিরিমূল গর্তে প্রবেশ কর। কৃষ্ণের কথায় সকলে পর্বতের নিচে আশ্রয় নিলেন। ইন্দ্রের মেঘরা সাত রাত্রি বর্ষণ করল এবং কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে গোকুল রক্ষা করলেন। তারপর আকাশ মেঘ শূন্য হলে গোকুলবাসী স্বস্থানে ফিরে এলেন এবং কৃষ্ণ পর্বতকে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

এই কাহিনী থেকেই জানা যায় যে গোপ জাতি আর্যদের মতো ইন্দ্র যজ্ঞ করত। কৃষ্ণের পরামর্শেই তারা ইন্দ্রের পূজা পরিত্যাগ করে গিরি ও গরুর পূজা আরম্ভ করে। তারা যাযাবরের জীবন যাপন করত। তাদের গৃহ ছিল না, পাহাড়ের নিচে বা অরণ্যের প্রান্তে সারিবদ্ধ শকটের মধ্যেই তারা বাস করত। ইন্দ্র যজ্ঞ বন্ধ হবার পর একদিন মূষল ধারে বৃষ্টি নামে। সেই প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত হয়ে তারা ভাবল যে ইন্দ্রের যজ্ঞ বন্ধ হবার জন্য ক্রুদ্ধ দেবতা তাদের শাস্তি দিচ্ছেন। তাদের এই দুর্দশার সময়ে কৃষ্ণ নিজের বুদ্ধিতে তাদের রক্ষা করেছিলেন। গোবর্ধন পর্বত উৎপাটন করে হাতের উপরে ধারণ করে সাত রাত্রি যাপন সম্ভব নয়। তাই মনে হয়, কৃষ্ণ পর্বত কেটে জল বার করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, অথবা পাথর গেঁথে বা সাজিয়ে জল নিকাশের পথ করেছিলেন। গোপরা গিরি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং প্লাবনে ভেসে যাবার সম্ভাবনা দূর হয়েছিল বলেই বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন।

কৃষ্ণের রাসলীলার বিবরণ আপাত দৃষ্টিতে অশ্লীল মনে হয়।

যাযাবর গোপ জাতি স্ত্রীপুরুষে মিলিত হয়ে যে নাচগান করত, তার নাম রাস। তাদের সমাজে পুরুষের একাধিক নারীতে আসক্তি যেমন দোষের ছিল না, স্ত্রীদেরও তেমনি সতীত্বের আদর্শে কোন গোঁড়ামি ছিল না। যদুবংশে জাত ক্ষত্রিয় কৃষ্ণ এই গোপদের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছিলেন বলে তিনিও রাসলালা করেছিলেন। এ কালের মানদণ্ডে কিছু অশ্লীলতার আভাস পাওয়া যায় বলে এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে যে কৃষ্ণের বয়স তখন ছয় বা সাত বৎসর। এও আছে যে কিশোর বয়সেই তিনি কংস বধ করেছিলেন এবং তারপর মথুরা থেকে গোকুলে বা বৃন্দাবনে আর ফিরে যান নি। তার পরিবর্তে কৃষ্ণ ও বলরাম অবন্তী দেশে সান্দীপনি মুনির নিকটে অধ্যয়ন করতে গিয়েছিলেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে রাসলীলার সময়ে কৃষ্ণের বয়স ছয় বা সাত না হলেও তিনি কিশোর বয়সী ছিলেন এবং গুরু গৃহে যাবার বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি। শৈশবে বা কৈশোরে গোপ যুবক যুবতীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যদি নৃত্য গীতাদিতে যোগ দিয়ে থাকেন তো তাতে কোন অন্যায় হয় নি এবং তাঁর চরিত্রে নিন্দনীয় কিছু ঘটেছে বলে তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যারও কোন প্রয়োজন নেই। কংস বধের ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে দেখলে এই উক্তি আরও স্পষ্ট হবে।

বিষ্ণুপুরাণে আছে, নারদ কংসের নিকটে কৃষ্ণের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। কংস কুপিত হয়ে যাদবদের সভায় বসুদেবকে তিরস্কার করে কী কর্তব্য তাই চিন্তা করতে লাগলেন। বুঝতে পারলেন যে বালক অবস্থাতেই বলরাম ও কৃষ্ণকে বধ করা উচিত, কারণ দৃঢ় যৌবনে তাদের বধ করা অসাধ্য হবে। স্থির করলেন যে চানূর ও মুষ্টিক নামে তাঁর দুই পরাক্রান্ত অনুচরের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধে তাদের বধ করাবেন। ধনুর্যজ্ঞ নামে এক মহাযজ্ঞের ছলে তাঁদের ব্রজ থেকে আনাবার জন্য তিনি শ্বফল্কের পুত্র অক্রূরকে গোকুলে পাঠালেন। অক্রূরও বৃষ্ণি বংশের যাদব ও কংস ও কৃষ্ণ উভয়ের সঙ্গেই আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ।

কুব্জাকে সরলদেহী করা কোন অলৌকিক কাজ নয়। কৃষ্ণ উল্লাপন বিধান অর্থাৎ বাঁকা জিনিস সরল করতে জানতেন। তিনি নিজের হাতের মধ্যমা ও তর্জনী দিয়ে কুব্জার চিবুক ধরে উঁচু করলেন এবং নিজের পা দিয়ে তাঁর পা চেপে ধরে উপরে টানলেন। এই ভাবেই কুব্জার দেহ সোজা করে দিয়েছিলেন।

কংস তাঁর হাতীর মাহুতকে সমাজ দ্বারে রাখতে বলেছিলেন। যুদ্ধের জন্য বালক দুটি রঙ্গদ্বারে এলে হাতী দিয়ে তাদের বিনাশ করবার কথা ছিল। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরাম সেই হাতী কুবলয়াপীড়কে বধ করে তার দুই দন্ত হাতে নিয়ে মদ ও রক্তে অনুলিপ্ত অঙ্গে রঙ্গ-ভূমিতে প্রবেশ করলেন। সব মঞ্চ থেকেই একটা হাহাকার ধ্বনি উঠল। ইনি কৃষ্ণ! আর ইনি বলরাম! কেউ বলে উঠল, এখানে কি উচিত কাজ করবার মতো কোন বৃদ্ধ নেই! এই সুকুমার কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে কি দারুণ মল্লরা যুদ্ধ করবে! যুদ্ধের বিচারকরা এই বালক ও বলবানের যুদ্ধ কেমন করে উপেক্ষা করছেন!

বিষ্ণু পুরাণের এই সব উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে কৃষ্ণ বলরাম তখনও বালক ছিলেন এবং রাসলীলায় যোগ দিয়েছিলেন সেই অপরিণত বালক বয়সেই। হাতীকে বধ করা সম্ভব ছিল কিনা, তার বিচার হবে বিশ্বাসে। তবে মল্লযুদ্ধে তাঁরা জয় লাভ করেছিলেন ও কংসকে বধ করেছিলেন বলে মনে হয় যে তাঁরা শক্তিতে ন্যূন ছিলেন না। বালক না বলে তাদের কিশোর বলা উচিত হবে এবং যৌবনে পদার্পণ করতে হয়তো বেশি বিলম্ব ছিল না।

কংস মগধরাজ জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং কৃষ্ণ কংসকে হত্যা করে তাঁর চিরশত্রু হয়েছিলেন। কৃষ্ণ কংসের পিতা উগ্রসেনের বন্ধন মোচন করে তাঁকেই তাঁর নিজ রাজ্যে পুনর্বার অভিষিক্ত করেছিলেন। তার পর তাঁরা দুই ভাই নিয়ম অনুসারে গুরুর নিকটে অস্ত্র শিক্ষার জন্য অবন্তীপুরে গেলেন। সেখানে কাশীতে উৎপন্ন সান্দীপনি মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে চৌষট্টি দিনের

মধ্যেই সরহস্য ও সসংগ্রহ ধনুর্বেদে অর্থাৎ অস্ত্রমন্ত্রোপনিষৎ ও অস্ত্র প্রয়োগে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। গুরু দক্ষিণা দিতে তাঁরা তাঁর মৃত পুত্রকে যমপুরা থেকে জীবিত অবস্থায় এনে দিয়েছিলেন। এর অর্থ গুরুর নিরুদ্দিষ্ট পুত্রকে খুঁজে এনে দিয়েছিলেন। তারপর তাঁরা মথুবায় ফিরে এসেছিলেন।

কিন্তু মথুরায় বাস করতে পারেন নি। জামাতার মৃত্যুর প্রতি-শোধ নিতে জরাসন্ধ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বার বার মথুরা আক্রমণ করছিলেন দেখে কৃষ্ণের পরামর্শে যাদবরা মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় গিয়ে তাঁদের নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। কালযবনকে হত্যার কথা পুর্বেই বলা হয়েছে।

কৃষ্ণ বিদর্ভ রাজকন্যা রুক্মিণীকে হরণ করে বিবাহ করেছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই কাহিনীর বিশদ বর্ণনা আছে। রুক্মিণীর বয়স তখন মাত্র তেরো বৎসর এবং কৃষ্ণ নবীন যুবক। বলরাম বিবাহ করেছিলেন রেবতীকে। সে কথা আগে বলা হয়েছে। এর পর তিনি জাম্ববতী, সত্যভামা, কালিন্দী, অবন্তী রাজকন্যা মিত্রবিন্দা, কোশল রাজকন্যা নাগ্নজিতী, কেকয় কন্যা ভদ্রা ও মদ্র রাজকন্যা লক্ষণাকেও বিবাহ করেন। কী ভাবে কৃষ্ণ এই আটটি বিবাহ করেন, তার বর্ণনাও পাওয়া যায়। ভল্লুকরাজ জাম্ববান যুদ্ধে কৃষ্ণকে পরাজিত করতে না পেরে স্যমন্তক মণি ফিরিয়ে দেবার সময় নিজের কন্যা জাম্ববতীকেও সম্প্রদান করেন। সত্রাজিৎ কৃষ্ণের নামে এই স্যমন্তক মণি চুরির অপবাদ দিয়েছিলেন। পরে সত্য ঘটনা জানতে পেরে স্যমন্তক মণির সঙ্গে নিজের কন্যা সত্যভামাকেও কৃষ্ণের হাতে অর্পণ করেন। কৃষ্ণ সত্যভামার পাণিগ্রহণ করলেন, কিন্তু স্যমন্তক মণি নিলেন না। সত্রাজিৎ এই মণি সূর্যের নিকটে পেয়েছিলেন। সূর্যের নিকটে মণি পাওয়া অবাস্তব ব্যাপার। তাই মনে হয় সূর্যের মতো প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি সত্রাজিৎকে এই মণি বন্ধু ভাবে দিয়ে-ছিলেন। কৃষ্ণ কালিন্দীকে পেয়েছিলেন যমুনার তীরে। তিনি

সূর্যের কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে কৃষ্ণকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণ তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। কালিন্দীর জন্ম সূর্য বংশে বলে তাঁকে সূর্যের কন্যা বলা হয়েছে বলে মনে হয়। স্যমন্তক মণিও সূর্য বংশের রাজাদের রত্ন হতে পারে। যিনি দিয়েছিলেন, তাঁর এই বংশেরই কোন সমৃদ্ধ ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়। অবন্তীর রাজকন্যা মিত্রবিন্দা কৃষ্ণের এক পিসির কন্যা। স্বয়ম্বরে তিনি কৃষ্ণকে বরণ করবার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের পরামর্শে তাঁর ভ্রাতারা বাধা দিয়েছিলেন বলে কৃষ্ণ রাজাদের সামনেই সবলে মিত্রবিন্দাকে হরণ করেন। কোশল রাজ নগ্নজিতের কন্যা সত্যাকে নাগ্নজিতী বলা হত। সাতটি গোবৃষকে পরাজিত করে কোন রাজপুত্র তাঁকে বিবাহ করতে পারছিলেন না। কৃষ্ণ এক সঙ্গে সাতটি বৃষকে আক্রমণ করে ক্ষণকালের মধ্যে তাদের বেঁধে আনেন। রাজা তাই দেখে কৃষ্ণের হাতে কন্যা সমর্পণ করেন। কৃষ্ণ তাঁর আর এক পিসির কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেছিলেন কন্যার ভাই প্রভৃতির অনুরোধে এবং মদ্র রাজকন্যা লক্ষণাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে একাকী হরণ করেছিলেন।

কৃষ্ণ বহু বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর ষোল হাজার পত্নী ছিল বলা হয়। কৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে নরকাসুরকে বধ করেন। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে নরক বধের পর তাঁর অন্তঃপুরে কৃষ্ণ ষোল হাজার একশো কন্যা দেখেছিলেন, নরকাসুরের কিঙ্করদের সঙ্গে তিনি সেই সব কন্যা হাতী ঘোড়া দ্বারকায় পাঠালেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে যে নরকাসুর যে সব রাজকন্যাকে এনে নিজের গৃহে অবরুদ্ধ রেখেছিলেন, সেই ষোল হাজার একশো রাজকন্যা কারাগৃহে কৃষ্ণকে দেখে তাঁকেই মনে মনে পতিরূপে বরণ করলেন। কৃষ্ণ তাঁদের দ্বারাবতীতে পাঠালেন। তার পর দ্বারকায় ফিরেই তিনি তাদের পাণিগ্রহণের জন্য সকলের গৃহে উপস্থিত হয়ে যথা বিধানে বিবাহ করেন। স্যমন্তক মণির প্রসঙ্গে কৃষ্ণ অক্রূরকে বলেছিলেন, আমার ষোল হাজার স্ত্রী, তাই এটি ধারণ করতে অসমর্থ। কৃষ্ণের এই ষোল হাজার স্ত্রীর কথা

নানা ভাবে পুরাণে এসেছে এবং এই কথা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। কিন্তু এ কথাও সত্য যে কোন একজনের ষোল হাজার স্ত্রী থাকা বা তাদের ভরণ পোষণ করা সম্ভব নয়। কৃষ্ণ কোন সময়েই রাজা ছিলেন না। তিনি উগ্রসেনের অধীনে একজন যদু প্রধান ছিলেন। তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি বল বিক্রম চাতুর্য কৌশল ন্যায় ও সত্যানুরাগের জন্য তিনি রাজার চেয়েও বেশি সম্মানিত ছিলেন। উগ্রসেন নামেই রাজা ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে রাজ্য পরিচালনা করতেন কৃষ্ণ। কিন্তু তিনি সবাইকেই তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দিতেই অভ্যস্ত ছিলেন।

কৃষ্ণের ষোল হাজার নারী ছিল, এই ব্যাপারটি সঠিক ভাবে বুঝতে হলে মৎস্য পুরাণের একটি উক্তি বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। সপ্ততিতম অধ্যায়ে ব্রহ্মা বলছেন, আমি পণ্য স্ত্রী অর্থাৎ বেশ্যাদের সদাচারের কথা শুনতে চাই। এর উত্তরে ঈশ্বর বললেন, বাসুদেবের ষোল হাজার নারী হবে। এক দিন তারা পানাসক্ত হয়ে শাম্বের প্রতি অভিলাষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে কৃষ্ণ অভিশাপ দেন যে তারা দস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হবে এবং দাল্‌ভ্য ঋষির উপদেশে এক ব্রত আচরণ করে দাসত্ব থেকে উদ্ধার পাবে। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তারা এই ঋষির দেখা পেয়ে কেঁদে প্রশ্ন করল, দস্যুরা বলপূর্বক উপভোগ করায় আমরা স্বধর্মচ্যুত হয়েছি, কী করে আমরা উদ্ধার পাব? আর বেশ্যাদের ধর্মই বা কী? দাল্‌ভ্য বললেন, তোমরা অপ্সরা অর্থাৎ স্বর্গের বেশ্যা ছিলে। পুরাকালে দেবাসুরের যুদ্ধে দৈত্য দানব ও রাক্ষসরা নিহত হলে তাদের পত্নী ও সবলে উপভুক্ত অন্যান্য নারীদের ইন্দ্র বলেছিলেন, তোমরা রাজধানী দেবপুরী প্রভৃতি স্থানে বেশ্যা হয়ে থাক। শুল্ক নিয়ে তোমরা যে কোন ব্যক্তিকে ভজনা করবে, কিন্তু দাম্ভিক বা শঠের অর্থাৎ যারা শুল্ক দেবে না, তাদের কারও সেবা করবে না। তোমরা অনঙ্গ ব্রত আচরণ করবে। ব্রতের মন্ত্র, হে কেশব, কমলা যেমন তোমার দেহ ছেড়ে কোথাও যায় না, তেমনি

তুমিও আমার দেহ ছেড়ে কোথাও যেও না। এই ব্রত আচরণ করেই বেশ্যা অধর্ম মুক্ত হবে ও তার বাস হবে কেশব লোকে।

এই কাহিনী থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কৃষ্ণের ষোল হাজার নারীর অর্থ দ্বারকার ষোল হাজাব পণ্য স্ত্রী বা বেশ্যা। তারা ব্রজের গোপ জাতি থেকে এসেছিল, না নরকাসুরের অন্তঃপুর থেকে, তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তবে এ কথা ঠিকই যে নরকাসুরের মৃত্যুর পর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বেশ্যারা সেখান থেকে চলে আসতে চেয়েছিল এবং কৃষ্ণ তাদের দ্বারকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণের উপরেই যে এই বেশ্যাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। একজনের উপরে এ ভার থাকবেই। সেকালের নিয়মে রাজারাই এ ভার নিতেন। দ্বারকায় উগ্রসেন তাঁর বার্ধক্যের জন্যই হোক বা কৃষ্ণের ক্ষমতার জন্যই হোক, এ ভার কৃষ্ণের উপরেই দিয়েছিলেন এবং এই জন্যই পুরাণে বলা হয়েছে যে তারা কৃষ্ণের পত্নী। দ্বারকার যাদব কুমাররা এই বেশ্যাদের নিকটে যাতায়াত করত বলে মনে হয়। যখন তারা দাল্‌ভ্য ঋষির দর্শন পেয়েছিল, তখন দ্বারকার বিবিধ ভোগ বিলাস ও দ্বারকাবাসী দেবতুল্য সুন্দর কুমারদের কথা স্মরণ করে যে তারা কেঁদেছিল, এ কথা মৎস্য পুরাণেই আছে। শাম্বও এই ভাবে তাদের সামনে গিয়েছিলেন এবং তারা তাঁকে চেয়েছিল বলেই কৃষ্ণ তাদের শাপ দিয়েছিলেন এবং শাম্বকেও। এই কাহিনী থেকে ব্রহ্মা ও ঈশ্বরের কথোপকথন বাদ দিতে হবে এবং দ্বারকার পণ্য স্ত্রীদের পূর্ব জন্মের কথাও। দ্বারকায় বেশ্যাদের অবস্থান একটি সাধারণ সত্য। বেশ্যাপল্লীর দায়িত্ব ছিল কৃষ্ণের উপরে এবং এই কাজ রাজাদের কাজের মতো সম্মানের ছিল বলেই মনে হয়। কৃষ্ণের শাপের কথাও সত্য নয়। শাম্বর কুষ্ঠ হয়েছিল নৈসর্গিক কারণে, কিংবা বেশ্যা সংসর্গেও হয়ে থাকতে পারে। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর দিল্লী যাবার পথে পঞ্চনদের দস্যুরা এই সুন্দরী

বেশ্যাদের অনেককে অপহরণ করেছিল। অনেকে স্বেচ্ছায় অর্জুনকে ত্যাগ করে দস্যুদের সঙ্গে গিয়েছিল বলেও মনে করা হয়।

পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতার কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে। সান্দীপনি মুনির নিকটে অধ্যায়নাদি শেষ করে ফিরে এসে কৃষ্ণ অক্রূরকে হস্তিনাপুরে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাত, আপনি আমাদের পিতৃব্য ও পরম বন্ধু। পাণ্ডবদের মঙ্গল কামনায় আপনি একবার হস্তিনাপুরে গিয়ে তাঁদের কথা জেনে আসুন। তাঁরা জননী কুন্তীর সঙ্গে অতি কষ্টে কালাতিপাত করছেন বলে শুনতে পেয়েছি। পাণ্ডবরা কী ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন জেনে আসুন। তাঁদের মঙ্গলের জন্য আমরা যত্ন করব। অক্রূর কৃষ্ণের কথাতেই হস্তিনাপুরে গিয়ে সব জেনে শুনে মথুরায় ফিরে কৃষ্ণকে সব কথা জানিয়েছিলেন।

দ্বারকায় নূতন রাজধানী স্থাপন করেও কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কথা ভুলে যান নি। তাঁরা জতুগৃহে দগ্ধ হয়ে মারা যান নি এবং দ্রুপদ রাজার গৃহে বাস করছেন জেনে দেখা করতে এসেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ও ভীমকে প্রণাম ও সমবয়সী অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন এবং কনিষ্ঠ নকুল সহদেব তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। কৃষ্ণ তাঁর পিসি কুন্তীকে প্রণাম করলে তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। নববধূ সুন্দরী দ্রৌপদীও লজ্জাবনত মুখে তাঁকে অভিবাদন করলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁদের সম্পর্ক বন্ধুর মতো পবিত্র হয়েছিল। পুরুষ ও নারীর এ রকম মধুর সম্পর্ক আর দেখা যায় নি।

কৃষ্ণের দৈনন্দিন জীবন যাপনের কথাও শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে। তিনি ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে অবগাহন স্নান করতেন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই আহ্নিক কৃত্যাদি শেষ করে তাঁর সুধর্মা নামের সভায় আসতেন। যদুগণে পরিবৃত হয়ে সভার শ্রেষ্ঠ আসনে তিনি উপবেশন করলে উপমন্ত্রীরা হাস্যরস ইন্দ্রজাল প্রদর্শন ও গীত বাদ্য করে, নর্তকীরা নৃত্য করে এবং সূত মাগধ ও বন্দীরা স্তব করে তাঁর

আনন্দ বর্ধন করতেন। ব্রাহ্মণেরা বেদ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর দরিদ্র ব্রাহ্মণ সখা সুদামার সঙ্গে তিনি যে ব্যবহার করেছেন, তা তাঁর মহত্বেরই পরিচায়ক। তিনি জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দী রাজাদের দুঃখের কথা শুনে ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগ দিতে এসেছিলেন। তিনি জানতেন যে জরাসন্ধকে বধ না করলে যুধিষ্ঠির এই যজ্ঞ করতে পারবেন না। তাই সকলের আগে ভীম ও অর্জুনকে নিয়ে জরাসন্ধ বধের জন্য গিরিব্রজে গিয়েছিলেন। তারপর পাণ্ডবরা দিগ্বিজয় করেছিলেন। এর পর কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তাঁর ভূমিকা প্রথমে একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের, পরে দার্শনিকের এবং যুদ্ধের সময়ে একজন যুদ্ধ নিপুণ কুশলী সারথির। যুদ্ধ শেষে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং পরবর্তী জীবন কাটিয়েছিলেন বৈরাগীর মতো নির্লিপ্ত ভাবে। কুরুক্ষেত্রে তিনি ভগবদ্ গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁর অধ্যাত্ম চিন্তার ফসল দিয়েছেন উদ্ধব গীতায়। পরিপূর্ণ বয়সে তিনি সাধারণ মানুষের মতো একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছিলেন। যদু বংশ ধ্বংস হয়েছে গৃহবিবাদে। কিন্তু পুরাণে বলা হয়েছে যে ঋষির শাপেই এই রকম হয়েছে। কৃষ্ণ দেবতা হলে এই শাপ খণ্ডন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। শাপ সত্য নয়, সত্য হল গৃহ বিবাদ। উগ্রসেন বৃদ্ধ, তিনি বেঁচে ছিলেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে। কৃষ্ণ বলরাম ও তাঁর সঙ্গীরাও বৃদ্ধ। তাঁদের উত্তরাধিকারীরা উচ্ছৃঙ্খল। মদ্য পানে মত্ত হয়ে তারা পরস্পরকে আক্রমণ করে হত্যা করেছে। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, কৃষ্ণের বয়স একশোরও বেশি হয়েছিল, শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হয়েছে একশো পঁচিশ। তাঁর পিতা মাতা তখনও জীবিত ছিলেন এ কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু দুটো উক্তিই সত্য হতে পারে না। কৃষ্ণ দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন, এ কথাই সত্য। প্রদ্যুম্ন তাঁর অল্প বয়সের পুত্র, প্রদ্যুম্নের পৌত্র বজ্র তখন শিশু। অর্জুন এঁকে

দ্বারকা থেকে নিয়ে এলে যুধিষ্ঠির বজ্রকে একটি রাজ্যে অভিষিক্ত করে হিমালয় যাত্রা করেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালে ভারতের মানচিত্র

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজাই যোগ দিয়েছিলেন। তাই এই সমস্ত রাজ্যের অবস্থান জানা থাকলে কতগুলি দুরূহ ব্যাপারও বোঝা সম্ভব হবে। যেমন মদ্ররাজ শাল্ব ছিলেন নকুল ও সহদেবের মাতুল অর্থাৎ মাদ্রীর ভ্রাতা। কিন্তু তিনি যুদ্ধ করেছিলেন কৌরবের পক্ষে এবং ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণের পর সেনাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি কেন পাণ্ডব পক্ষে যোগ দেন নি, তার কারণ এইটেই যে দুর্যোধন তাঁকে আগে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কী করে তা সম্ভব হল তা জানতে হলে মদ্র রাজ্যের অবস্থান জানতে হবে। এই মদ্র দেশের সঙ্গে বর্তমান মাদ্রাজের কোন সম্পর্ক নেই। এই মদ্র ছিল পাঞ্জাবের উত্তরে জম্মু প্রদেশে ইরাবতী ও বিতস্তা অর্থাৎ রাবি ও ঝিলম নদীর মধ্যে অবস্থিত এক রাজ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে উত্তর মদ্র নামে এক জনপদের উল্লেখ আছে। প্রাচীন মিডিয়া রাজ্যকেই উত্তর মদ্র বলা হত বলে মনে করা হয়। এই ভাবে ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যে কাপিস্থল এবং শতদ্রু নদীর উত্তর তীরে কেকয়। কুরু রাজ্য কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে ও পাঞ্চালের পূর্বে হস্তিনাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হরিদ্বার ও গোমতীর মাঝখানে ছিল কুরুজাঙ্গল দেশ। কুরুবর্ষ ভারতবর্ষের বাহিরে। উত্তর কুরু বলতে বোঝায় বর্তমান রুশ তাতার তুর্কিস্থান ও তিব্বতের উত্তর পশ্চিমাংশ। অনেকে মনে করেন যে তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র বা সাংপো নদের উভয় তীরে ছিল উত্তর কুরু। বিবস্বান অন্তরীক্ষে বা হিমালয় অঞ্চলের রাজা ছিলেন। তাঁর পত্নী পালিয়ে উত্তর কুরুতে গিয়েছিলেন তপস্যা করতে। কাজেই এই দেশ তিব্বতের কোন

স্থানে হওয়া অসম্ভব নয়। আবার ভৌগোলিক পণ্ডিতের কেউ কেউ একে একটি কল্পিত স্বর্গ বলে মনে করেন।

যাই হোক, ভারতবর্ষ ও প্রতিবেশী দেশের কিছু জনপদের নাম ও তাদের অবস্থান জানা থাকলে পুরাণ ও প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত স্থানগুলি কল্পনা করতে সুবিধা হবে। এব জন্য প্রধান প্রধান স্থানগুলিরই পরিচয় নিচে দেওয়া হল।

ত্রিগর্ত বর্তমান জলন্ধর অঞ্চলের নাম। সৈরিন্ধ্র পাতিয়ালার অন্তর্গত সিরহিন্দ অঞ্চল। কঙ্ক নেপালে এবং কিরাত হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে। ব্রজ বৃন্দাবন অঞ্চল, শূরসেন মথুরার দক্ষিণে যমুনার অববাহিকা অঞ্চল। হিমালয়ের নিচে থেকে চম্বল নদী পর্যন্ত দেশের নাম ছিল পাঞ্চাল। উত্তর পাঞ্চালের প্রধান শহর অহিক্ষেত্র ও দক্ষিণ পাঞ্চালের প্রধান শহর কাম্পিল্য। পৌরব নাম গোয়ালিয়র অঞ্চলের। অযোধ্যা ও ঘর্ঘরা নদীর উত্তরে উত্তর কোশল এবং উত্তর কোশলেরই কিয়দংশের নাম গৌড় দেশ, তার প্রধান শহর শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম সাহেত মাহেত। মৎস্য জয়পুর আলোয়ার অঞ্চলে, বিরাট তার রাজধানী। বৎস রাজ্য এলাহাবাদের দক্ষিণে, তার রাজধানী কৌশাম্বি, বর্তমান নাম কোসাম। কুরুক্ষেত্র থেকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত মধ্যদেশ, বিন্ধ্যের দক্ষিণে বিদর্ভ। প্রতিষ্ঠান নগর বর্তমান ঔরঙ্গাবাদ জেলায়। এখন এর নাম হয়েছে পৈথান। কাশী রাজ্য ছিল বেনারস অঞ্চলে। মিথিলা চম্পারণ ও দ্বারভাঙ্গার অধিকাংশ, বিহারের উত্তরাংশে কীকট। প্রাগজ্যোতিষপুর কুচবিহার কামরূপ ও আসামের কিয়দংশ, অঙ্গ ভাগলপুর অঞ্চল, বঙ্গ বাঙলা, পৌণ্ড্র বাংলার উত্তরাঞ্চল, সমতট যশোহর অঞ্চল এবং সুহ্ম উড়িষ্যার উত্তর পূর্বে। মগধ রাজ্য দক্ষিণ বিহারে, মহাকোশল ছত্রিশ গড় ও ছোট-নাগপুর অঞ্চল। বুন্দেলখণ্ড ও তার দক্ষিণে চেদি রাজ্য। ধসান নদীর অববাহিকায় দশার্ণ, কচ্ছের রণের উত্তর পূর্বে পুলিন্দ। অপরান্ত ভৃগুকচ্ছ বা ভরোচ ও গুজরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল, সুরাষ্ট্র গুজরাতের

নাম এবং আনর্ত কাথিয়াবাড়। আরাবল্লীর পশ্চিমে আভীর, সিন্ধু নদের ধারে বর্বর দেশ, হূণ দেশ হিমালয়ের উত্তরে। অনেকে পাঞ্জাবেও বলেন। খশ দর্দিস্তানের উত্তরে পামির অবধি বিস্তৃত। অনেকে নেপাল ও কুমায়ুনের অংশও বলেন। কাম্বোজ ছিল বদক্সানের পূর্বে ও কুশ পর্বতের নিকটে। গান্ধার সিন্ধু নদীর পশ্চিমে আফগানিস্তানের নাম। বাহ্লীক বা আরট্ট পাঞ্জাবেরই কোন অঞ্চলের নাম।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পশ্চিম থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় সমস্ত রাজ্যের রাজারা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। মণিপুর থেকে অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহন আসেন নি, কিন্তু ঐ অঞ্চলেরই নাগরাজ্য থেকে অর্জুনের অপর পুত্র ইরাবান এসেছিলেন। উত্তর থেকে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত আর্যাবর্তের সমস্ত রাজারা একত্র হয়েছিলেন। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে বিদর্ভ এবং আরও দক্ষিণে প্রতিষ্ঠান বা পৈথান। এর দক্ষিণে বিশাল ভূখণ্ড তো এককালে পাতাল নামে পরিচিত ছিল—সপ্ত পাতাল। এই পাতালের বিস্তার ছিল বাঙলা ব্রহ্মদেশ হয়ে বর্তমান ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত। কিন্তু এই বিরাট অঞ্চলের কোন রাজা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগ দিতে আসেন নি দেখে আশ্চর্য হতে হয়। রামায়ণের কালে কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কার নাম শোনা গেছে, পরবর্তীকালে সিংহলের কথাও পাওয়া যায়। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দক্ষিণ ভারতীয় রাজারা বর্জন করেছিলেন কেন, তা জানা যায় না। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ কি তখনও সুগম হয় নি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কলি যুগের অবসান

(১৪১৬ থেকে ৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)

পরীক্ষিৎ

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরের অবস্থা পাওয়া যায় শ্রীমদ্‌ভাগবতে। অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ পৃথিবী পালন করতে লাগলেন। তিনি উত্তরেব কন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করেন। উত্তর হলেন পরীক্ষিতের মামা, বিরাট রাজ্যের রাজা। জনমেজয় প্রভৃতি নামে পরীক্ষিতের চারটি পুত্র হয়। কৃপাচার্যকে গুরু করে তিনি গঙ্গার তীরে তিনটি যজ্ঞ করেন। তারপর দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে তিনি দেখেন যে শূদ্র মূর্তি কলি রাজবেশে একটি বৃষ ও একটি গাভীকে পদাঘাত করছে। রাজা তাঁকে শাসন করলেন।

শৌনক সূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, কলিকে হত্যা না করে রাজা তাঁকে শাসন করে ছেড়ে দিলেন কেন? সূত বললেন, পরীক্ষিৎ যখন কুরুজাঙ্গল প্রদেশে বাস করছিলেন, তখন কলি তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করেছেন শুনেই দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন। এই সময়ে এক দিন তাঁর সামনে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ধর্ম বৃষ রূপ ধারণ করে এক পায়ে চলতে চলতে গাভী রূপিণী পৃথিবীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ দুঃখে তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে? পৃথিবী বললেন, তুমি তো সবই জানো। কৃষ্ণ সকলকে পরিত্যাগ করেছেন ও তাদের উপর পাপ কলির দৃষ্টি পড়ছে বলেই আমি সবার জন্য শোক করছি। ধর্ম ও পৃথিবী যখন এই কথোপকথন করছিলেন, তখনই পরীক্ষিৎ কুরুক্ষেত্রে তাঁদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন যে রাজবেশধারী একজন শূদ্র দণ্ড হাতে সেই গাভী ও বৃষকে প্রহার

করছে। রাজা বললেন, নটের মতো রাজা সেজে কে তুমি শূদ্রের মতো আমার আশ্রিতকে প্রহার করছ? আর তোমরাই বা কে? আমি থাকতে তোমাদের কোন ভয় নেই।

ধর্ম বললেন, কৃষ্ণ যাঁদের দূতের কাজ করেছেন, তাঁদের বংশধরের এই অভয় দান উপযুক্ত। পণ্ডিতদের কথায় মুগ্ধ হয়ে পরমেশ্বরকে আমরা জানতে পারি না। যোগীরা বলেন, আত্মাই আত্মার সুখ দুঃখের হেতু। দৈবজ্ঞরা বলেন, হেতু গ্রহাদি দেবতা। কিন্তু কর্মীরা বলে যে কর্মই সুখ দুঃখ দেয় এবং নাস্তিকরা নিজের স্বভাবকেই সমস্ত সুখ দুঃখের হেতু বলে। আবার ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা বলেন, মন ও বাক্যের অগোচর পরমেশ্বরই সুখ দুঃখ দেন। মহারাজ, নিজের বুদ্ধি দিয়ে আপনি এর বিচার করে নিন।

পরীক্ষিৎ একাগ্রচিত্তে ভেবে ধর্মকে বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি ধর্ম। তপস্যা পবিত্রতা দয়া ও সত্য এই চার পায়ের তিনটি গর্ব বিষয়াসক্তি ও মদ্যপান জনিত মত্ততায় নষ্ট হয়েছে এবং কলি মিথ্যা দিয়ে আপনার শেষ পাদ সত্যকেও গ্রহণ করতে চায়। আর ইনি পৃথিবী। ব্রাহ্মণ ভক্তিহীন শূদ্ররা রাজার ছলে এঁকে ভোগ করবেন বলে ইনি কাঁদছেন। এই বলে পরীক্ষিৎ কলিকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। কলি ভয়ে রাজবেশ ত্যাগ করে রাজার পদানত হল। রাজা বললেন, তুমি অধর্মের বন্ধু, তুমি এই রাজ্যে থাকতে পারবে না। কলি বলল, তাহলে আমি কোথায় থাকব বলুন। কলির এই প্রার্থনা শুনে রাজা বললেন, যেখানে জুয়া মদ্যপান পরস্ত্রীসঙ্গ ও প্রাণী হিংসা হয়, সেখানে তুমি থাকতে পার। কলির প্রার্থনায় তিনি তাঁকে সোনা রূপা প্রভৃতিও তার বাসস্থান রূপে দান করলেন। কলি এই পাঁচটি স্থানে বাস করতে লাগলেন। পরীক্ষিৎ ধর্মের তপস্যা পবিত্রতা ও দয়া এই তিন পাদ সংযুক্ত করে দিলেন এবং পৃথিবীকে সান্ত্বনা দিয়ে গৌরবান্বিত করলেন। তিনি ভ্রমরের মতো সারগ্রাহী ছিলেন বলেই কলিকে বধ করেন নি। কারণ কলিতে

পুণ্য কর্মের সংকল্প করলেই ফল লাভ হয়, কিন্তু পাপ কাজ করলে তার ফল পেতে হয়। বিবেকী লোককে কলি ভয় পায়। সে বীরত্ব প্রকাশ করে অবিবেকী লোকের উপরে।

বলা বাহুল্য যে এই কাহিনীটি সম্পূর্ণ কল্পিত। এক পায়ের বৃষ হতে পারে না, বৃষ ও গাভীর কথোপকথনও অসম্ভব ব্যাপার। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর কলি প্রবল হয়ে উঠছে, এই কথা বলবার জন্যই এই কাহিনী রচিত হয়েছে। সমাজের অবস্থা তখন এমন স্তরে নেমেছে যে পুণ্য কর্মের সংকল্প করলেই পুণ্য হয় এবং পাপ না করা পর্যন্ত দোষ হয় না। এর পর পরীক্ষিতের মৃত্যুর কথা। নিজের বাসস্থানে সাপের কামড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তা বলবার জন্যেও একটি কাহিনী তৈরি করা হয়েছে। পরীক্ষিৎ এক দিন মৃগয়া করতে গিয়ে মৃগের পেছনে ছুটে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে এক আশ্রমে প্রবেশ করলেন। দেখলেন যে সমীক মুনি চোখ বুঁজে শান্ত ভাবে বসে আছেন। ঋষির কাছে তিনি জল চাইলেন, কিন্তু সমাধিস্থ ঋষির কাছে কিছু না পেয়ে নিজেকে অবজ্ঞাত ভেবে ক্রুদ্ধ হলেন এবং ধনুকের প্রান্ত দিয়ে একটি মৃত সর্প তুলে ঋষির কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন। শৃঙ্গী নামে ঋষির এক পুত্র বালকদের সঙ্গে খেলতে খেলতে পিতার অপমানের কথা শুনে শাপ দিল, যে কুলাঙ্গার আমার পিতাকে অপমান করেছে, আজ থেকে সপ্তম দিনে তক্ষক তাকে দংশন করবে। পরীক্ষিৎ এই শাপের কথা শুনে সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবু তক্ষক এক ব্রাহ্মণের বেশে এসে একটি ফলের মধ্যে কীট হয়ে ঢুকে রাজাকে দংশন করে।

এ রকমের অলৌকিক ঘটনা সম্ভব নয়। আর এই তক্ষক কদ্রুর পুত্র হতে পারে না। কালের ব্যবধানে তা সম্ভব নয়। এক বিষধর জাতির সর্পকেই তক্ষক বলা হয়েছে। সেই সর্পের দংশনে মৃত্যুকেই সাজিয়ে কাহিনী রচনা পুরাণকারের কীর্তি। পরীক্ষিৎ হয়তো এক সময়ে একটি মৃত সর্প ঋষির গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্র

তাই জেনে শাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই শাপের ফলেই তক্ষক এসে রাজাকে দংশন করে, এ সাজানো গল্প।

পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞও এই রকমেব একটি সাজানো গল্প। সাপের কামড়ে পিতাব মৃত্যু হবার পর জনমেজয় রাজা হয়ে নিশ্চয়ই সাপ মারবার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন এবং প্রচুর সাপ হয়তো নানা ভাবে মারা হয়েছিল। এরই নাম সর্প যজ্ঞ। এতে তক্ষক জাতিয় সাপ মারা পড়ে নি বলেই কল্পিত হয়েছে যে তক্ষক ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আস্তিক নামের কোন ঋষি এসে বুঝিয়েছিলেন যে এই ভাবে সাপ মারা অন্যায় হচ্ছে। সাপও প্রাণী, তাদের একজনের দোষে সকলেব প্রাণ বধ অন্যায় কাজ।

ভাবী রাজবংশ

মহাভারতে আছে যে ষাট বৎসব বয়সে পবীক্ষিতেব মৃত্যু হয়েছিল। এই হিসাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ১৩৫৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে।

এর পর বিষ্ণুপুরাণে ভাবী রাজাদের বিবরণ আছে। বলা হয়েছে যে পরীক্ষিতের চার পুত্র হবে। তাদের নাম জনমেজয় শ্রুতসেন উগ্রসেন ও ভীমসেন। জনমেজয়ের পুত্র শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে বেদাধ্যয়ন করে ও কৃপের নিকটে শস্ত্রবিদ্যা লাভ কবে পরে বিষয়ে বিরক্ত চিত্ত হবেন এবং শৌনকের উপদেশে আত্মবিজ্ঞানপ্রবণ হয়ে নির্বাণ মুক্তি লাভ করবেন। শতানীকেব অশ্বমেধ দত্ত নামে এক পুত্র হবে, তাঁর পুত্র অধিসীমকৃষ্ণ। অধিসীমকৃষ্ণের পুত্র নিচক্ষু হস্তিনাপুরে গঙ্গা কর্তৃক অপহৃত হলে কৌশাম্বীতে এসে বাস করবেন।

এই উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মনে হয় যে নিচক্ষুর রাজত্ব কালেই হস্তিনাপুর গঙ্গায় প্লাবিত হয়েছিল এবং তাঁকে এলাহাবাদের নিকটে কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করতে হয়। নিচক্ষুর কাল আরম্ভ ১২৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। কাজেই এর পরেই কোন এক সময়ে হস্তিনাপুর পরিত্যক্ত হয়। নিচক্ষুর পর তেইশ পুরুষে ক্ষেমক

এবং বিষ্ণুপুরাণের মতে পুরু বংশ ক্ষেমক রাজার পরেই শেষ হয়ে যায়। ক্ষেমকের কাল ৬১২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

বিষ্ণুপুরাণে ইক্ষ্বাকু বংশ শেষ হবার কথাও আছে। এই বংশের বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর পর উনত্রিশ পুরুষে সুমিত্র এই বংশের শেষ রাজা। তাঁর কাল ৬৩৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

নীপ বংশের শেষ রাজা বহুরথের কাল ছিল ১৩৫৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। যদুবংশে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র ছিলেন পরীক্ষিতের সমসাময়িক। তাঁর পুত্র প্রতিবাহু ও পৌত্র সুচারু। এর পর আর কোন নাম পাওয়া যায় না। জনক বংশের শেষ রাজা কৃতিও পরীক্ষিতের সমসাময়িক।

বৃহদ্রথ বংশের রাজাদের কথা বিষ্ণুপুরাণে আছে। তাঁরা মগধে এক হাজার বছর রাজত্ব করবেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের পুত্রের নাম সোমাপি। এঁর পর একুশ পুরুষে রিপুঞ্জয় এই বংশের শেষ রাজা। আনুমানিক ৯০৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তাঁর রাজ্যকাল শেষ হবে।

এইখানে পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে যে কল্পের আরম্ভ ৫৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বলে পাঁচ হাজার বছরের ধর্ম যুগের শেষ ৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। এর পর যদি ধর্মযুগের পুনরাবর্তন মানা হয় তো এর পরেই আবার কৃত বা সত্য যুগের প্রবর্তন হয়েছে। ইক্ষ্বাকু বংশে কৃতঞ্জয় নামে এক রাজার রাজত্ব কাল আরম্ভ ৯৩৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে এবং বৃহদ্রথ বংশের রাজা সত্যজিৎ ৯৬০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে রাজত্ব করেন। কৃত বা সত্য যুগের আরম্ভে এই দুই রাজার নাম একটা বিশেষ ইঙ্গিত বহন করে।

কল্কি অবতার

এই প্রসঙ্গে কল্কি অবতারের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিষ্ণুপুরাণে আছে যে কলিযুগ অন্তিম দশায় উপনীত হলে সম্ভল গ্রামের ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার গৃহে অবতীর্ণ হবেন কল্কি অবতার। তিনিই

সব ম্লেচ্ছ দস্যু ও দুরাত্মাদের ক্ষয় করে পুনরায় ধর্ম স্থাপন করবেন। কল্কি পুরাণে পাওয়া যায় যে সে সময়ে রাজা ছিলেন বিশাখযূপ। ভবিষ্য রাজ বংশের বর্ণনায় মগধের প্রদ্যোৎ বংশে বিশাখযূপ নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণেই আছে যে বৃহদ্রথ অর্থাৎ জরাসন্ধের বংশের শেষ রাজা রিপুঞ্জয়ের এক অমাত্য সুনিক দেশের রাজাকে হত্যা করে নিজের পুত্র প্রদ্যোৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করবে। এই প্রদ্যোতের পুত্র পালক ও পৌত্র বিশাখযূপ। তাঁর কাল ৮৩৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। ইনিই কল্কি পুরাণের বিশাখযূপ কি না তা বলা যায় না। তবে কল্কি পুরাণের ঘটনা যে পরবর্তী কালের, তার প্রমাণ কল্কি পুরাণেই আছে। কল্কি বৌদ্ধ নিগ্রহের জন্য কীকটপুরে এসেছিলেন বিশাখযূপের সঙ্গে। কীকট বিহারের প্রাচীন নাম। সেখানে বৌদ্ধ যুদ্ধের বিবরণ আছে। তার পর ম্লেচ্ছ বিনাশ। এই কাজে কল্কি ও বিশাখযূপকে সাহায্য করেছিলেন সূর্যবংশের মরু ও চন্দ্র বংশের দেবাপি। মরু কল্কিকে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, কেউ আমাকে বুধ, কেউ বা সুমিত্র নামে ডাকে। এত দিন আমি কলাপ গ্রামে থেকে তপস্যা করছিলাম। ব্যাসের নিকটে আপনার অবতার হবার বৃত্তান্ত শুনে কলির লক্ষ বৎসর তপস্যার পর আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি। দেবাপিও নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, আমি বৃহদ্রথ বংশে সোমাপির পুত্র শ্রুতশ্রবার এক পুত্র সুরথের বংশে জাত প্রতীপকের পুত্র দেবাপি। আমি শান্তনুকে নিজের রাজ্য প্রদান করে কলাপ গ্রামে তপস্যা করছিলাম। এখন আপনার দর্শনের জন্য উপস্থিত হয়েছি।

মরু ও দেবাপির উক্তি থেকে নির্ভুল ভাবে অনুমান করা যায় যে ইক্ষ্বাকু বংশ ও বৃহদ্রথ বংশের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবার পর এই দুই বংশেরই দুজন কল্কির সঙ্গে যোগ দিতে এসেছিলেন। অনুসন্ধান করলে কলাপ গ্রামের অবস্থানও হয়তো জানা সম্ভব।

বিশাখযূপ গৌতম বুদ্ধের আগে বিদ্যমান ছিলেন বলে মনে হয়

যে এঁর পরেও কোন বিশাখযূপ ছিলেন, কিংবা কল্কি পুরাণের সমস্ত নামগুলিই কল্পিত। দেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব, ম্লেচ্ছ প্রতিপত্তি ও শূদ্র রাজার প্রাধান্য দেখে কোন ব্রাহ্মণ এই ক্ষুদ্র উপপুরাণখানি রচনা করেছিলেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্র বংশের শেষ রাজাদের কথা জানতেন, বিশাখযূপ নাম শুনেছিলেন, কিংবা তাঁরই রাজত্ব কালে এই পুরাণ রচনা করেছিলেন। তাঁর কালে সিংহলের কথা দেশে প্রচলিত ছিল বলে সিংহলের রাজকন্যার সঙ্গে কল্কির বিবাহ দিয়েছেন। কলি যুগে সমাজের যে অবস্থা হবে বলে লিখেছেন, তা হয়তো সেকালেরই সমাজের কথা। আজও এই দেশের সমাজে একই অবস্থা চলছে।

এর পর পুরাণে আর কল্পিত কাহিনী নেই, যা আছে তা ইতিহাসের বিশ্বস্ত উপাদান। ভারতের লিখিত ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই তার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পুরাণ ও ইতিহাস

(৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)

অনেক পুরাণেই ভবিষ্য রাজাদের বিবরণ পাওয়া যায়। যে রাজারা ;ভবিষ্যতে রাজত্ব করবেন তাঁদের কথা ও তাঁদের বংশধররা কত কাল রাজত্ব করবেন তার হিসাব আছে। বোঝা যায় যে এই সব কথা তাঁরা কল্পনা করে লেখেন নি, লিখেছেন বিশেষ ভাবে জেনে শুনে। অর্থাৎ অতীতের ঘটনাই লিখেছেন ভবিষ্যতে ঘটবে বলে। এর একটা কারণ আছে। সেটাও সহজে বোঝা যায়। সমস্ত পুরাণেরই বক্তা সূত নামে এক জাতির পিতা পুত্র লোমহর্ষণ ও উগ্রশ্রবা। নৈমিষারণ্যে শৌনকের যজ্ঞকালে প্রথমে লোমহর্ষণ ও তাঁর মৃত্যুর পরে উগ্রশ্রবা এই পুরাণগুলি পাঠ করেন। বেদব্যাস এগুলি তাঁর শিষ্য লোমহর্ষণকে অধ্যয়ন করিয়েছিলেন। পুরাণের কাহিনীগুলির বক্তা বিভিন্ন ঋষি এবং শ্রোতা অন্য ঋষি বা রাজা। কাজেই এই সব পুরাণ রচিত হবার একটা কাল স্থির করা আছে। তাই পরবর্তী কালে নূতন ঘটনা সংযোজন করবার সময়ে পরবর্তীকালের পুরাণকার তা ভবিষ্য কাহিনী বলতে বাধ্য হয়েছেন ; অর্থাৎ বলেছেন যে এই রকমের ঘটনা ঘটবে। একালের মতো নূতন রচয়িতার নাম যোগ করার রীতি সেকালে ছিল না। তাই পুরাণে বর্ণিত ভবিষ্য রাজাদের বিবরণকেও অন্যান্য ঘটনার মতো অতীত ঘটনা বলেই মেনে নিতে হবে।

প্রসঙ্গত বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের চতুর্বিংশ অধ্যায়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। পরাশর বললেন, বৃহদ্রথ বংশে রিপুঞ্জয় নামে যে শেষ রাজা, তাঁর মুনিক নামে এক অমাত্য হবেন। তিনি তাঁর প্রভু রিপুঞ্জয়কে হত্যা করে নিজের পুত্র প্রদ্যোৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত

করবেন। প্রদ্যোতের পুত্র পালক, তাঁর পুত্র বিশাখযূপ। বিশাখযূপের পুত্র জনক ও তাঁর পুত্র নন্দিবর্ধন। প্রদ্যোৎ বংশীয় এই পাঁচজন রাজা একশো আটত্রিশ বৎসর পৃথিবী ভোগ করবেন। নন্দিবর্ধনের পুত্র শিশুনাগ, তাঁর পুত্র কাকবর্ণ। কাকবর্ণের পুত্র ক্ষেমধর্মা, তাঁর পুত্র ক্ষত্রৌজা। ক্ষত্রৌজার পুত্র বিদ্মসার, তাঁর পুত্র অজাতশত্রু, তাঁর পুত্র দর্ভক, দর্ভকের পুত্র উদয়াশ্ব, তাঁর পুত্র নন্দিবর্ধন এবং নন্দীবর্ধনের পুত্র মহানন্দী। শিশুনাগ বংশীয় এই দশজন রাজা তিনশো বাষট্টি বৎসর বর্তমান থাকবেন।

মহানন্দীর এক শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত মহাপদ্ম নন্দ নামে এক অতি লোভী পুত্র হবে। এই ব্যক্তি দ্বিতীয় পরশুরামের মতো অখিল ক্ষত্রিয় কুলের বিনাশ করবে। সেই সময় থেকে শূদ্ররা রাজা হবে। মহাপদ্ম শাস্ত্র নির্দিষ্ট রাজধর্ম উল্লঙ্ঘন করে সমগ্র পৃথিবী ভোগ করবেন। মহাপদ্মের সুমালী প্রভৃতি আটজন পুত্র হবে এবং তাঁরা তাঁর মৃত্যুর পরে পৃথিবী ভোগ করবেন। মহাপদ্ম ও তাঁর পুত্রদের রাজ্যভোগের কাল একশো বৎসর। কৌটিল্য নামে এক ব্রাহ্মণ এই নয়জন নন্দ বংশীয়কেই উচ্ছেদ করবেন। তাঁদের উচ্ছেদের পর মৌর্য শূদ্র রাজারা পৃথিবী ভোগ করবেন। কৌটিল্যই মৌর্য বংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। তাঁর বিন্দুসার নামে এক পুত্র হবে, তাঁর পুত্র অশোকবর্ধন, ইত্যাদি।

এই বারে তুলনার জন্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের লিখিত 'ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' থেকে এই প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হচ্ছে। 'খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রায় ৬০০ অব্দে মগধে শিশুনাগ এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশের পঞ্চম রাজা বিম্বিসার। বিম্বিসার বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি কোশলের রাজা প্রসেনজিতের ভগিনী কোশল দেবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অন্য এক রাণীর গর্ভে বিম্বিসারের অজাতশত্রু নামে এক পুত্র জন্মে।...অজাতশত্রুর পরে শিশুনাগ বংশের চারিজন রাজা পর পর রাজত্ব লাভ করেন।

তাঁহাদের দ্বিতীয় রাজা উদয় রাজগৃহ হইতে গঙ্গাতীরে পাটলীপুত্রে (বর্তমান পাটনায়) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। শেষ দুইজন রাজা নন্দীবর্ধন এবং মহানন্দী নানা দেশ জয় করিয়া মগধ সাম্রাজ্যের আয়তন আরও বাড়াইয়া তোলেন। শিশুনাগ বংশের দশজন রাজা রাজত্ব করিলে পর, মহাপদ্ম নন্দ নামক একজন শূদ্র মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। শূদ্র ভূপতি মহাপদ্ম নন্দ একজন অসাধারণ বীর ছিলেন। আর্যাবর্তে তখন যে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, মহাপদ্ম উহার অধিকাংশ জয় করেন। তিনি এই রূপে যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের একচ্ছত্র সম্রাট হন। ঐতিহাসিক যুগে ইহাই আর্যাবর্তের প্রথম সাম্রাজ্য। মহাপদ্ম নন্দের পরে তাঁহার আটজন পুত্র রাজত্ব লাভ করেন। তাঁহারা হয় এক যোগে রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছিলেন, নচেৎ খুব অল্প সময়ের মধ্যে পর পর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসন কালের শেষ ভাগে গ্রীকরাজা আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।……গ্রীকগণের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর অভিযানের যিনি নায়ক ছিলেন, তাঁহার নাম চন্দ্রগুপ্ত। কথিত আছে যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশেই জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু নন্দ-রাজের বিরাগভাজন হওয়ায় মগধ পরিত্যাগ করিয়া পাঞ্জাবে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু সংবাদ ভারতে পৌঁছিবামাত্র তিনি গ্রীকদিগকে বিতাড়িত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করেন (আঃ ৩২১ খ্রীঃ পূঃ)। ক্রমে তিনি মগধেশ্বর নন্দরাজকে পরাভূত করিয়া সমস্ত আর্যাবর্তের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া পড়েন। এই সাম্রাজ্য লাভে কৌটিল্য বা চাণক্য নামক এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন।…চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই সঠিক জানা যায় না।…বিন্দুসারের পরে ২৭৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তাঁহার পুত্র অশোকবর্ধন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এই তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যাবে যে পুরাণের সঙ্গে ইতিহাসের কোন বিরোধ বা অসঙ্গতি নেই। রাজার সংখ্যা সমান,

নামেও কোন প্রভেদ নেই। উপরন্তু রাজাদের সমষ্টি রাজ্যকাল পুরাণেই পাওয়া যায় এবং ব্যষ্টি রাজ্যকাল নির্ণয় করাও সম্ভব।

মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক কাল পূর্বেই নির্ণয় করা হয়েছে। ঐতিহাসিকের মতে তিনিই আর্যাবর্তের প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং তিনি যে একটা অব্দের প্রচলন করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি শূদ্র ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় রাজাদের জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন বলে তাঁকে কলিকাংশজ বলা হয়েছে এবং তাঁর প্রচলিত অব্দ কালসম্বৃত অর্থাৎ কল্যব্দে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীকালের আর্যভট এই অব্দের সঙ্গে এক নক্ষত্র মহাযুগের ২৭০০ বৎসর যোগ করে কলির আরম্ভের বৎসর স্থির করেন। এই কল্যব্দই এখনও চলে আসছে এবং পঞ্জিকাতে উল্লিখিত হচ্ছে। এই সংখ্যা থেকে বর্তমান খ্রীষ্টাব্দ ও ২৭০০ বৎসর বাদ দিলেই পাওয়া যাবে ৪০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এইটিই মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেকের বৎসর। অন্যান্য পুরাণ থেকে দেখা যায় যে নন্দ প্রথম দুই বৎসর মহানন্দীর নামে রাজ্য চালিয়েছিলেন। ৪০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তাঁর রাজ্যাভিষেক। নন্দবংশীয়রা ৮৬ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। এর সঙ্গে নন্দের ২ বৎসর যোগ করলে দাঁড়ায় ৮৮ বৎসর। মৎস্য পুরাণে এই সংখ্যাই আছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ১০০ বৎসর দেখে বোঝা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মগধের সিংহাসন অধিকার করলেও সমস্ত নন্দ রাজাদের উচ্ছেদ করতে তাঁর আরও ১২ বৎসর সময় লাগে। পুরাণের বিবরণ দেখে মনে হয় যে তাঁরা এক সঙ্গে এক যোগে রাজত্ব করেন নি, পর পরও না। তাঁরা মহাপদ্ম নন্দের বিশাল রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করছিলেন বলেই চন্দ্রগুপ্তের বারো বৎসর সময় লেগেছিল সবাইকে উচ্ছেদ করতে।

মৎস্য ও বায়ু পুরাণের আলোচনায় আরও জানা যায় যে প্রদ্যোতের পিতা মুনিক যখন রিপুঞ্জয়কে বধ করে রাজ্য অধিকার করেন, তখন প্রদ্যোতের বালক বয়স। তিনি নিজে রাজা না হয়ে রাজার প্রতিভূ

রূপে দশ বৎসর রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। এই ঘটনা থেকেই মনে হয় যে মুনিক ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং গোপনে বা কৌশলে রাজাকে হত্যা করেন এবং নিজে রাজা না হয়ে এই হত্যাকারীর পরিচয় গোপনের চেষ্টা করেছিলেন। তাই পুরাণকার এই ঘটনা প্রকাশ করলেও ইতিহাসে তা ধরা পড়ে নি। মুনিক রাজ্য অধিকার করেছিলেন ৮৮১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এবং তাঁর বংশের পাঁচজন রাজা ১৩৮ বৎসর অর্থাৎ ৭৩৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তারপর শিশুনাগ বংশ ৩৬২ বৎসর রাজত্ব করেন এবং এর মধ্যে প্রথম ৩০ বৎসর তাঁরা বারাণসীতে রাজত্ব করবার পর মগধ অধিকার করেন। মনে হয় বারাণসীতে দুজন এবং বাকি দশজন মগধে রাজত্ব করেন। তাই মৎস্য পুরাণের মতে শিশুনাগ বংশের রাজা বারোজন। পুরাণে বিন্ধসার বা বিন্ধিসার অজাতশত্রুর পিতা। ইতিহাসে তিনি বিম্বিসার এবং বুদ্ধের সমসাময়িক। পুরাণের মতে তাঁর রাজ্যকাল ৬৩৭ থেকে ৬১২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ এবং অজাতশত্রু রাজা ছিলেন ৬১২ থেকে ৫৭২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

এইখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। আমরা এখন যে ইতিহাস পড়ি তা গ্রীক বিবরণ ও শিলালিপি থেকে নির্ণয় করা হয়েছে। গ্রীসের রাজা আলেকজাণ্ডার ৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ৩২৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। এই সংবাদ ভারতে পৌঁছবার পর চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব অধিকার করেন আনুমানিক ৩২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলিউকাস ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হবার পর গ্রীক রাজ মেগাস্থিনিস নামে একজন দূতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় পাঠিয়েছিলেন। এঁর বিবরণ থেকেই আমাদের ইতিহাসের সন তারিখ অনুমান করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল ৪১৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। প্রায় একশো বৎসর পূর্বের এই তারিখটি নিশ্চয়ই অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু পুরাণের

ভিত্তিতে এই তারিখ ৪০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ এবং এটি যে নির্ভুল তাতে কোন সংশয় থাকতে পারে না। এই ভাবেই চন্দ্রগুপ্তের মগধ অধিকারের তারিখ ৩১৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। মগধ জয়ের পুর্বে তিনি পাঁচ বৎসর অর্থাৎ ৩২০ থেকে ৩১৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পাঞ্জাবে রাজত্ব করেন। এই তারিখও ভুল হবাব কোন সম্ভাবনা নেই। মৌর্যদের সম্পূর্ণ রাজত্ব কাল ১৪২ বৎসব হলেও মগধে ১৩৭ বৎসর এই জন্যই বলা হয়েছে। কাজেই এই গ্রন্থে যে সন তারিখ দেখানো হল, তা মেনে নেবার বিপক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

পুবাণে ভবিষ্য রাজাদের কথা এইখানেই শেষ হয় নি। বিষ্ণুপুবাণে অশোকের রাজত্বকাল পাওয়া না গেলেও মৎস্য পুবাণে আছে যে অশোক ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। বায়ু পুরাণের কোন পুঁথিতে ৩৬ ও কোন পুঁথিতে ২৬ বৎসর আছে। কিন্তু মৌর্য বংশের সমষ্টি রাজ্যকাল ১৩৭ বৎসর। তাঁরা ৩১৫ থেকে ১৭৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তারপর শুঙ্গ বংশীয় রাজারা পৃথিবা ভোগ করবেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে যে শুঙ্গ সেনাপতি পুষ্পমিত্র প্রভুকে হত্যা করে রাজা হবেন। এই শুঙ্গবংশীয়রা দশজন ১১২ বৎসর রাজ্য ভোগ করবেন। তারপর পৃথিবী কণ্ব বংশীয় রাজাদের আশ্রয় করবে। দেবভূতি নামে কণ্ব বংশীয় এক ব্যক্তি শুঙ্গবংশীয় রাজাকে হত্যা করে নিজেই পৃথিবী ভোগ করবে। তাঁরা চারজন রাজা ৪৫ বৎসর রাজত্ব করবেন। তারপর অন্ধ্র জাতীয় শিপ্রক নামে একজন ভৃত্য কণ্ব বংশীয় সুশর্মাকে বধ করে রাজা হবে। এই অন্ধ্র জাতের ভৃত্য বংশীয় ত্রিশজন রাজা ৪৫৬ বৎসর পৃথিবী ভোগ করবে।

অন্যান্য পুরাণ থেকে দেখা যায় যে শুঙ্গ বংশের পুষ্পমিত্র নিজের প্রভুকে হত্যা করে পুত্র অগ্নিমিত্রের নামে রাজত্ব করেন। এই বংশের দশজন রাজার রাজত্বকাল ১৭৮ থেকে ৬৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত। রাজাদের নামও পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। শেষ রাজা দেবভূতিকে হত্যা করেন কণ্ব বংশের বসুদেব এবং এই বংশের চারজন ৬৬ থেকে

২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর অন্ধ্র বংশের শিপ্রক ২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কণ্ব বংশের শেষ রাজা সুশর্মাকে হত্যা করে অন্ধ্র বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অন্ধ্র ও অন্ধ্র ভৃত্য বংশের তিরিশজন রাজা ৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সব রাজাদের নাম ও রাজত্ব কালও পুরাণে আছে।

পুরাণে এর পরেও ভবিষ্য রাজাদের বিবরণ আছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে অন্ধ্র বংশের পর সাতজন আভীর ও দশজন গর্দভিল রাজা হবেন। তারপর ষোলজন শক বংশীয় রাজা ও আটজন যবন রাজা। তারপর চোদ্দজন তুখার, তেরোজন মুণ্ড ও এগারজন মৌন যথাক্রমে ১৩৯৯ বৎসর রাজত্ব করবেন। তারপর পোর বংশীয় এগারজন রাজা ৩০০ বৎসর রাজত্ব করার পর কৈলকিল নামে যবনরা রাজা হবে। তাদের রাজত্বকাল ১০৬ বৎসর। তারপর এদের তেরজন বংশধর, বহ্লীক বংশীয় তিনজন, তারপর পুষ্পমিত্র প্রভৃতি তেরজন মেকল দেশজাত সাতজন ও কোশল পুরীতে নয়জন এবং নিষধ দেশীয় নয়জন রাজা হবেন।

তারপর মগধপুরীতে বিশ্বস্ফটিক নামে একজন রাজা ক্ষত্রজাতির উচ্ছেদ করে ব্রহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী কৈবর্ত কটু ও পুলিন্দদের রাজ্যে স্থাপিত করবে। পদ্মাবতী পুরীতে নাগ বংশীয় নয়জন এবং গঙ্গা ও প্রয়াগের নিকটস্থিত কান্তিপুরী ও মথুরায় মাগধগণ ও গুপ্তগণ রাজা হয়ে পৃথিবী ভোগ করবেন। দেবরক্ষিত নামে এক ব্যক্তি কোশল ওড্র ও তাম্রলিপ্ত ও সমুদ্রতটস্থ পুরীগুলি রক্ষা করবে। কলিঙ্গ মাহিষিক মাহেন্দ্র ও ভীমগণ গুহাপুরীকে রক্ষা করবে। মণিধার বংশীয়রা নৈষাদ সৈনিষিক ও কালতোয় প্রভৃতি জনপদ ভোগ করবে। কনক বংশীয়রা স্ত্রীরাজ্য ও মূষিক নামের জনপদগুলি ভোগ করবে। পতিত ব্রাহ্মণাদি আভীর ও শূদ্রাদি জাতি তখন সৌরাষ্ট্র অবন্তি শূদ্র অর্বুদ ও মরুভূমি প্রভৃতি বিষয় ভোগ করবে। সিন্ধুতট দার্বীকোর্বী চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ ম্লেচ্ছ ও ব্রাত্য শূদ্ররা ভোগ করবে।

এই সময়ে সমাজের যে দুর্দশা উপস্থিত হবে তার ভয়ঙ্কর বিবরণ দেবার পর পুরাণকার বলছেন যে এর পরই কল্কি অবতার রূপে জন্মাবেন।

উপরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় না, এক সঙ্গে কোন রাজারা ভারতের কোন অংশে রাজত্ব করেছেন। তবে গুপ্ত রাজাদের উল্লেখ দেখে মনে হয় যে এই সব রাজাদেরও খুঁজে বার করা সম্ভব হবে। কিন্তু ইতিহাস রচনার জন্য তার প্রয়োজন আর নেই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

মহাপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ এবং উপপুরাণও অষ্টাদশের কম নয়। এই গ্রন্থগুলিকে ধর্মগ্রন্থ বললে বোধ হয় কারও আপত্তি হবে না, কিন্তু ইতিহাস বললে সবাই বিস্মিত হবেন এবং এ কথার প্রতিবাদ করবেন অনেকেই। ইতিহাস রচনার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। কোন পুরাণে সেই পদ্ধতি মানা হয় নি। তা ছাড়াও পুরাণে এমন সব অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনীর সমাবেশ যে তাকে সত্য ঘটনা কিছুতেই বলা যায় না। দেবতা ও তাঁদের মাহাত্ম্য, পূজা পদ্ধতি ব্রত কথা প্রভৃতি ইতিহাসের বিষয়বস্তু হতেই পারে না।

এ অভিযোগ মিথ্যা নয়। আবার পুরোপুরি সত্যও নয়। পুরাণ রচনা ও পুরাণ পাঠের নিয়ম আমরা ভুলে গেছি বলেই একটা ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে।

পুরাতন কাহিনী অর্থেই পুরাণ শব্দটির উৎপত্তি। ইতিহাস শব্দটিও সে কালে প্রচলিত ছিল। তখন জগতের আদিম অবস্থা থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টির বিবরণের নাম ছিল পুরাণ এবং দেবাসুরের যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার নাম ইতিহাস। এর অর্থ এই যে যা প্রত্যক্ষ করা গেছে তার নাম ইতিহাস এবং যা কল্পনা বা অনুমান করে লেখা হয়েছে তা পুরাণ। পরবর্তী কালে এ সমস্তই একই সঙ্গে সঙ্কলিত হয়ে পুরাণ সংহিতা নামে প্রচারিত হয়েছিল।

পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ হল সর্গ বা সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রতিসর্গ বা প্রলয় ও পুনঃসৃষ্টি, দেবতা রাজা ও পিতৃগণের বংশাবলী, মন্বন্তর বা কাল বিভাগ ও বংশানুচরিত বা ব্যক্তিবিশেষের কীর্তির কথা। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় যে জগতের সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে কালে কালে

দেবতা ঋষি ও রাজাদের বংশাবলী ও তাঁদের কীর্তির বর্ণনা করে সৃষ্টির শেষে প্রলয় পর্যন্ত বর্ণনা ও পুনরায় জগৎ সৃষ্টির কথা যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, তারই নাম পুরাণ। অর্থাৎ পুরাণে শুধু মানুষের কথা নয়, প্রাকৃতিক ঘটনা ও দুর্ঘটনার কথাও থাকবে। এই পঞ্চলক্ষণ না থাকলে তাকে পুরাণ বলা হবে না।

কিন্তু এর মধ্যে অলৌকিক কথা ও ধর্মের কথা কী ভাবে ঢুকে পড়ল? পুরাণ রচয়িতারা তাঁদের দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ধরনের গ্রন্থকে দীর্ঘ জীবন বা স্থায়িত্ব দিতে হলে শুধু শুষ্ক ইতিহাস রচনা করলে চলবে না। মানুষের ধর্ম জীবনের সঙ্গে তাকে সুকৌশলে জড়িয়ে দিতে হবে। তার প্রথম ধাপ হিসাবে মানুষকে দেবতায় পরিণত করা হল, আকাশের জ্যোতিষ্ক লোকে স্থান দেওয়া হল অনেককে। তাঁদের কীর্তিকলাপেও অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া হল। তাঁদের ক্রোধ হল শাপ এবং আশীর্বাদকে বর বলা হল। ধীরে ধীরে এই ধারণা এমন মূল বিস্তার করল যে সেই দেবতাদের পূজা পদ্ধতিও রচিত হয়ে গেল, মাহাত্ম্য প্রচার হল এবং এই পুরাণ পাঠ যে পুণ্যফলদায়ী তাও ঘোষণা করা হল। ধীরে ধীরে এই পুরাণ ইতিহাস সংজ্ঞা হারিয়ে ধর্ম গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

পুরাণে এখন এই ধর্মের জট এমন পাকিয়ে গেছে যে একে আর ইতিহাস ভাবার উপায় নেই। কেউ বলবেন কল্পিত কাহিনীর সমাবেশ, কেউ বলবেন আজগবী গল্প বা কিংবদন্তী, অথবা বিজ্ঞের মতো ইংরেজী কথায় mythology। পুরাণকে ইতিহাস অর্থাৎ history বললে চারিধার থেকে মহা আপত্তি উঠবে।

এই গ্রন্থে অবান্তর কথার কাহিনীর জট ছাড়িয়ে পুরাণকে ইতিহাসের মর্যাদা দেবার একটা চেষ্টা করা হয়েছে। তার জন্য পুরাণ থেকেই কতগুলি সূত্র সংগ্রহ করে অবান্তর অলৌকিক ও অতিরঞ্জিত অংশকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং পুরাণের সূত্র দিয়েই ঘটনার কাল নির্ণয় করা হয়েছে। যেখানে তা পুরোপুরি সম্ভব হয়

নি, সেখানে বাস্তবানুগ অনুমান দিয়ে পাদপূরণ করা হয়েছে ; কোথাও বা অনুমানের ভার পাঠককেই দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থে যা আলোচিত হয়েছে তা সংক্ষেপে এই রকম।—

ভারতে সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নিযুক্ত হয়েছেন বেণের উত্তরাধিকারী পৃথুর রাজসভায়। পৃথুর কাল আনুমানিক ৪৯০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। পুরাণের সূত্র ধরেই এই কাল নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। পুরাণের মন্বন্তর প্রসঙ্গে কাল নির্ণয়ের সূত্র আছে। ৫ বৎসরে এক যুগ, গড়ে ১০০ বৎসরে নক্ষত্র যুগ ও সাতাশ নক্ষত্রের এক মহাযুগ ২৭০০ বৎসরে। এক কল্পের পরিমাণ ৫০০০ বৎসর, তা ৪ ধর্ম যুগে বিভক্ত। কৃত বা সত্যযুগ ২০০০ বৎসর, ত্রেতা ১৫০০, দ্বাপর ১০০০ ও কলি ৫০০ বৎসরে। প্রথমে এই কল্প কাল চোদ্দটি মন্বন্তরে ভাগ করা হয়েছিল এবং সপ্তম মন্বন্তরের পর এই মনু গণনা পরিত্যক্ত হয়েছে। কিছু দিন পিতৃমানে পিতৃ যুগে গণনা চলেছিল। ২০০০ মাসে এক পিতৃ যুগ। এই হিসাবে কৃষ্ণের জন্ম অষ্টাবিংশ যুগে, অর্থাৎ কল্পারম্ভ থেকে ৪৫০০ বৎসর অতীত হবার পরে। এই দিনই কলি যুগের আরম্ভ। বর্তমানে পঞ্জিকায় যে কল্যব্দ পাওয়া যায়, তাতে ভ্রম আছে। মহাপদ্ম নন্দ যে অব্দ প্রচার করেছিলেন, তিনি শূদ্র ছিলেন বলে তাকেই পরবর্তী কালে কল্যব্দ বলা হয়। কিন্তু এ কালের জ্যোতির্বিদ আর্যভট এই কল্যব্দের সঙ্গে এক নক্ষত্র যুগের ২৭০০ বৎসর যোগ করে কলির আরম্ভ গণনা করেছিলেন। এর থেকেই নন্দের রাজ্যাভিষেক কাল পাওয়া যাবে ৪০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। পরীক্ষিৎ এর ১০১৫ বৎসর পূর্বে জন্মেছিলেন এবং এই বৎসরই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বয়স ৪২ বৎসর ছিল বলে তাঁর জন্মকাল ১৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এই হিসাবেই কল্পের আরম্ভ ৫৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ এবং মন্বন্তরের কাল, ধর্মযুগ, পিতৃযুগ প্রভৃতি নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করা হয়েছে। গ্রন্থের উপক্রমণিকা

অংশে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌছনো গেছে। পুরাণে বর্ণিত পৃথিবীর ভৌগোলিক বিবরণও এই অংশে আলোচিত হয়েছে। স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালের অবস্থান সহজেই অনুমান করা যাবে।

সন্ধি সহ এক মন্বন্তর কাল ৩৫৭ বৎসর। এই ভাবে সাতটি মন্বন্তরের ঘটনা প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদে কালানুক্রমে সাজানো হয়েছে। এর থেকেই দেখা যাবে যে দক্ষ দুজন ছিলেন। একজন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এবং দ্বিতীয় দক্ষ চাক্ষুষ মন্বন্তরে। দ্বিতীয় দক্ষের পূর্বে এক মহাপ্লাবনে চরাচর ডুবে গিয়েছিল। এই অন্ধকার যুগের পরিমাণ ৯৮৭ বৎসর, আনুমানিক ৪৮৫০ থেকে ৩৯০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। তখন অরণ্যে দেশ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং এই প্লাবনের কথা অন্যান্য দেশের কথায় ও কাহিনীতেও পাওয়া যায়। এই প্লাবনেই সিন্ধু সভ্যতা নষ্ট হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। দক্ষের পর থেকেই নূতন সৃষ্টির আরম্ভ এবং তাঁরই দৌহিত্ররা দেবতা দৈত্য দানব গন্ধর্ব অপ্সরা প্রভৃতি নানা জাতিতে বিভক্ত। অষ্টম পরিচ্ছেদে দেবাসুরের প্রায় শতবর্ষব্যাপী দ্বন্দ্বের কথা সবিস্তারে বলা হয়েছে। দেবতা ও দৈত্যরা যে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন, এ কথা আমরা এখন ভুলে গিয়েছি। দেবতাকে এখন আমরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী দৈব শক্তির প্রতীক ভাবি এবং দৈত্য ও দানবদের মনে করি দুষ্ট শক্তির আধার। কিন্তু এ আমাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। দেবতাদের উপরে দেবত্ব আরোপের ফলেই আমাদের এই ধারণা হয়েছে। তা থেকে মুক্ত হলেই বোঝা যাবে যে একই পিতার সন্তানরা ক্ষমতার লড়াই-এ প্রবৃত্ত হয়ে পুরাণ রচয়িতাদের সমর্থন পুষ্ট দেবতা জাতির মানুষেরাই দেবতায় পরিণত হয়েছেন। ইন্দ্র পদের অধিকারী শক্র নামে এক ব্যক্তি দেবরাজ হয়েছেন, বিষ্ণু পদবীধারী এক শক্তিশালী রাজা পুরুষানুক্রমে নারায়ণে পরিণত হয়েছেন, কৈলাসপতি রুদ্র হয়েছেন শিব এবং লঙ্কাধিপতি রাবণরা রাক্ষস নাম পেয়েছেন।

নবম পরিচ্ছেদ থেকে ভারতের রাজাদের কথা একে একে বলা

হয়েছে। দৈত্যদের ভয়ে এক ইন্দ্র আত্মগোপন করলে দেবতারা ইন্দ্র পদের জন্য মর্ত্যের তথা ভারতের রাজা নহুষকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পর থেকে মান্ধাতা পর্যন্ত তিনশো বছরের কথা এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। যযাতি ও দেবযানির বিবাহ হয়েছে এই সময়ে।

দশম পরিচ্ছেদে ত্রেতা যুগের শেষ সহস্র বৎসরের কথা বলা হয়েছে। হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্র কার্তবীর্য অর্জুন পরশুরাম সগর ও ভগীরথ এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। বেদ ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ এই সময়েই রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

দ্বাপর যুগের কথা বিবৃত হয়েছে একাদশ পরিচ্ছেদে। রামকে ত্রেতার মানুষ বলে বিশ্বাস করলেও ঐতিহাসিক প্রমাণে তাঁকে দ্বাপর যুগেই পাওয়া যায়। দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধি অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক মহাভারতের কাল। এই কালের কথা দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত সেকালের রাজ্য-গুলির বর্তমান অবস্থান নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে এই পরিচ্ছেদের শেষে। কলিযুগের অবসান ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে এবং চতুর্দশ পরিচ্ছেদে একালে রচিত ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণে বিবৃত ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখানো সম্ভব হয়েছে যে পুরাণ যে ইতিহাস তাতে কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। বর্তমান কালের ইতিহাস রচিত হয়েছে গ্রীক বিবরণ ও শিলালিপি থেকে। তদপেক্ষা অনেক মূল্যবান ও নির্ভুল তথ্য আছে পুরাণে। পুরাণ অবলম্বন করে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনা করলে তা আরও তথ্যসমৃদ্ধ ও সত্যনির্ভর হবে।

বলা বাহুল্য যে খ্রীষ্টের জন্মের তিনশো বৎসরের কিঞ্চিদধিক পূর্বে গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস এসে তাঁর পূর্বেকার ঘটনা লোকমুখে শুনেই লিখেছিলেন। তাঁর সন তারিখ নির্ভুল হবার কোন যুক্তি নেই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নন্দের রাজ্যাভিষেকের কাল অনুমান করলেন

৪১৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ এবং আমরা তাই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিলাম। কিন্তু আমাদের পঞ্জিকা ও পুরাণ মিলিয়ে সেই কাল পাওয়া যাচ্ছে ৭০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এই তারিখটিই নির্ভুল বলে আমরা কেন মেনে নেব না।

তারপর খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক হাজার বছর পূর্বের ঘটনা! খ্রীষ্টের জন্মের তারিখ দিয়ে কী করে তার পরিমাপ করা সম্ভব? কালের মাপকাঠিকে টেনে কি অত লম্বা করা যায়? আমাদের কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে খ্রীষ্টের জন্মেরও প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। তাঁর জন্মের কাল থেকে কল্পের আরম্ভ অঙ্কের মতো বিশ্বস্ত পদ্ধতিতে হিসাব করলে কি বেশি নির্ভুল হবে না? স্বায়ম্ভুব মনু থেকেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে। মনুর বংশধর বলেই মানব বা মানুষ। মানুষ তখন শুধু ভারতবাসী ছিল না, ছিল গোটা জম্বু দ্বীপ অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশে ছড়িয়ে। এই এশিয়া মহাদেশের কোন্ অংশের নাম ভারতবর্ষ আর ইলাবৃত প্রভৃতি বর্ষ ছিল, তার পরিচয় আছে পুরাণেই। পুরাণকে ইতিহাস বলে মানলে আমরা কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী মিদিয়াকে বিষ্ণুর রাজ্য বৈকুণ্ঠ বলতে পারব। বর্তমান কালের ভূগোলে পামির নট বলে পরিচিত পাহাড়ের একটি শিখরকে মেরু পর্বত এবং ইন্দ্রের স্বর্গ রাজ্যের রাজধানী অমরাবতী ভাবতে পারা যাবে। তিব্বতের অধিপতি শিবের রাজধানী কৈলাস নিয়ে কোন সংশয় নেই। পুরাণের বর্ণনা থেকেই আমরা মহাপ্লাবনের ভয়াবহতা জানতে পারি। দক্ষিণ ভারতের রাজা সত্যব্রতকে বলে নৌকায় সৃষ্টি রক্ষা করলেন মৎস্য অবতার। বাইবেলে এই কাহিনীর নাম নোয়ার নৌকা এবং এই নৌকার গল্প প্রায় সব দেশেই আছে বলে শোনা যায়। পৃথিবীর তিনটি স্থানে তখন সভ্যতার উৎকর্ষ হয়েছিল। তার মধ্যে ভারতের সিন্ধু নদের উপত্যকা ভূমিও আছে। এই সভ্যতা মহেঞ্জোদরো থেকে হরাপ্পা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। মহাপ্লাবনে হয়তো এই সভ্যতাও চাপা পড়ে

গিয়েছিল শেষবারের মতো। আমরা এখন মাটি খুঁড়ে এই সভ্যতার পরিচয় পাচ্ছি। যে ভরত রাজার নামে ভারতবর্ষ নাম, তাঁর পিতা ঋষভ যে ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন, পরবর্তী কালে তারই নাম হয়েছে জৈনধর্ম এবং তিনিই আদিনাথ নামে অভিহিত হয়েছেন। মহেঞ্জো-দরোর মাটির নীচে আমরা ঋষভদেবকেও পেয়েছি। তাঁর কাল ৫৮৬২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ এবং এক হাজার বৎসর পরে এই স্থান মহাপ্লাবনের জলে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। এখানে আমরা লিঙ্গ পূজারও পরিচয় পেয়েছি। লিঙ্গ প্রকৃতি ও পুরুষের প্রতীক। প্রকৃতি পুরুষের প্রবক্তা কপিল এবং লিঙ্গ যাঁর প্রতীক সেই মহাদেব শিব স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের মানুষ। সিন্ধুর সভ্য মানুষ এই দর্শন গ্রহণ করেছিল, কিন্তু অস্বীকার করেছিল চাক্ষুষ মন্বন্তরের দক্ষ প্রজাপতি।

গ্রন্থ শেষ করার পূর্বে বলতে হয় যে প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে সাময়িক ভাবে ভুলে না গেলে পাঠকের মন পদে পদে হোঁচট খেতে পারে। বিশ্বাস মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি, তার উপরে কারও অধিকার খাটে না। পাঠকের বিশ্বাস ভঙ্গ করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নয়। পাঠক কী বিশ্বাস করবেন, আর কী করবেন না, এ তাঁর নিজের অভিরুচি। পুরাণ ভাল করে না পড়ে যাঁরা একটা ধারণার বশে কিছু বিশ্বাস করে বসে আছেন, এই গ্রন্থ তাঁদের জন্যই। সংক্ষেপে যতটুকু বলা সম্ভব, ততটুকুই বলা হল এবং পুরাণের শ্লোকাদি বা পণ্ডিতদের মত উদ্ধৃত করে কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হল না।

পুরাণে ভূগোল ও ইতিহাসের সমস্ত উপাদান আছে। সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে সেকালের ধারণার কথা আছে, আছে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয়। একটা বিরাট দেশ ও জাতির সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুরাণগুলিতেই বিধৃত আছে এবং এই পুরাণ অবলম্বন করেই যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনা সম্ভব,

তা এই গ্রন্থে যুক্তি দিয়ে বলার চেষ্টা করা হল। এই সূত্র কারও কাজে লাগলে বা এই গ্রন্থ পড়ে কেউ উপকৃত হলে বা আনন্দ পেলে এই গ্রন্থ রচনা সার্থক হবে।

অলমতি বিস্তারেণ

গ্রন্থপঞ্জী

১। দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম চার খণ্ড।

২। নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত বিশ্বকোষ ২২ খণ্ড।

৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ভারত কোষ ৫ খণ্ড।

৪। সাক্ষরতা প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বকোষ।

৫। সুবোধকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক সঙ্কলিত বিষ্ণু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত, দেবীভাগবত ও কল্কি পুরাণ।

৬। বঙ্গবাসী সংস্করণ মৎস্য পুরাণ ও বায়ু পুরাণ।

৭। গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত পুরাণ প্রবেশ।

৮। হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত ঋগ্বেদ।

৯। রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১০। Glimpses of Ancient India by Radha Kumnd Mukherjee.

১১। Early History of India by V. Smith

১২। A Short History of the World by H. G. Wells.

১৩। Ancient Indian Historical Tradition by F. E. Pargiter.

১৪। The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India by Nundo Lal De.